গল্পসমগ্র

২

প্রকাশভবন

১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর
শ্রীসুবীর কুমার সিকদার
সিকদার প্রিণ্টার্স
১৫এ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লিকাকে

এই লেখিকার অন্যান্য বই

আলো আমার আলো

অন্তোনিনা

অপেক্ষাগৃহ

পদ্মাসনা ভারতী

ঈশ্বরের প্রবেশ

সকালের সুর সায়াহ্নে

সমুদ্র পেরিয়ে

সমুদ্র হৃদয়

সোনালি বিকেল

অতলান্ত

সমাগত বসন্ত

হৃদয়ের বাগান

দ্বিতীয় নক্ষত্র

অগ্নি তুষার

রাঙা ভাঙা চাঁদ

গল্পসমগ্র (১)

সূচিপত্র

সকাল বেলা

বেশ বেলায় ঘুম ভাঙলো পূর্ণেন্দুর। যদিও রোববার, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ইচ্ছে করলে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে, তবু এই বেলার জন্য সে বিরক্তি বোধ করলো। আধশোয়া হয়ে মাথার কাছের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিতে গিয়ে ধাক্কা লেগে জল ঢাকা থালাটা যখন শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল, তখন সে আরো বিরক্ত হলো। এবং ভৃত্যকে ডেকে অকারণেই রাগারাগি করতে লাগলো, এতোক্ষণেও চা দেয়নি বলে। তারপর বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে ফিরে এসে আর এক প্রস্থ রাগারাগি করলো চা খারাপ হয়েছে বলে।

তখন ঘোমটা টেনে বয়স্ক পরিচারিকা নির্মলা এসে দাঁড়ালো দরজায়, বললো, 'সকালে চা দিয়েছিলাম, আপনার ঘুম ভাঙেনি, ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। এটা ফেলে দিন, আমি আবার করে দিচ্ছি। এই সঙ্গে কি খাবারটাও দিয়ে দেব ? বেলা তো হয়েছে অনেক।'

পূর্ণেন্দু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতে আসতে বললো, 'তাই দিয়ে দাও।'

শ্রাবণ মাসের শেষ। কয়েকদিন বৃষ্টিতে অনেক জ্বালিয়ে সুন্দর রোদ উঠেছে। নরম নরম রোদ, অল্প শীতে বালাপোশের মতো আরামদায়ক। বারান্দায় এসে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাগানে সুন্দর সব বর্ষার ফুল ফুটেছিলো, বারান্দার টবগুলো জলে নেয়ে ধুয়ে ঝক্ ঝক্ করছিলো, অদূরে গেটের কাছে কদম গাছে অজস্র কদমফুল জায়গাটা আলো করে রেখেছিলো, কোন কিছুর দিকেই তার মন গেলো না। সহসা আবার ভৃত্যকে ডেকে ঘর থেকে তার দপ্তর নিয়ে আসতে বললো। একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। তার বয়ানটা এই রকম : অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওটা বন্ধ করে দাও। বাকি কথা চিঠিতে বলবো।

কিছু বেশি কথা লেখা হলো, তাই কিছু বেশি টাকা দিয়ে অনুগত ভৃত্য মদনকে তখুনি পাঠিয়ে দিল পোস্টপিসে।

বউদির উপর রাগ হচ্ছিলো। এরকম একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে জবরদস্তি করা তাঁর উচিত হয়নি। মনে মনে হিসেব করে দেখলো আর মাত্র সাত দিন বাকি। হঠাৎ উদ্বেগে অধীর হয়ে গেল। এতকাল বাদে এই বয়সে এই সব ঝামেলার মধ্যে যাবার কি কোনো মানে হয়। যত্তো সব—না-না কক্ষনো না। কক্ষনো এই দায় দায়িত্বের মধ্যে আমি নেই।

পূর্ণেন্দুর বয়েস আটতিরিশ বছর ন' মাস সতেরো দিন। বলা যায় একজন প্রায়-চল্লিশ বয়স্ক ভদ্রলোক। হঠাৎ কেন এই দুর্মতি হলো ? কেন হঠাৎ বউদির চিঠির জবাবে, 'যা খুশি করো' বলে সম্মতিটা দিয়ে দিল ? বোকামি। রীতিমতো বোকামি। আর সঙ্গে সঙ্গেই বউদি ঠিক করে ফেললেন সব ? তারপর থেকেই অশান্তির শুরু। গোড়াতেই যার

এই সূচনা তার পরিণতি যে কী তা আর কে না বোঝে। ঠিকও করলেন যেন ভোজবাজি। বলা যায় মাত্র পনেরো দিনের মধ্যেই দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির। আশ্চর্য কম নয়।

এই শহরে সে নতুন এসেছে। ছ' মাস হলো। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছে, আর কাছে বলেই বউদির সঙ্গে এতো ঘন ঘন দেখা হয়েছে, কাণ্ডটাও তাই জন্যেই হতে পারলো। কিন্তু না, এটাকে বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতেই হবে।

নির্মলা চা নিয়ে এলো। সুন্দর অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেলিং ঘেরা বারান্দা ; বারান্দা থেকে পাঁচটি সিঁড়ি নামলে বাগান, বাগানের বুক চিরে রাস্তা সোজা চলে গেছে ফটক পর্যন্ত। কোনো সাহেব আমলের উঁচু ভিতের বাংলো বাড়ি। পূর্ণেন্দু এসে বাগান লন ইত্যাদি করে তাকে ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। এই শহরের ফার্স্ট মুন্সেফ সে, অতি সুপুরুষ, এই বয়সেও একটি চুলও যেমন সাদা হয়নি, মসৃণ চামড়াও তেমনি এক বিন্দু কুঁচকোয়নি। বউদি বলেন, 'আরে বাপু, এখনো তো সত্যি চল্লিশ হয়নি তাই, হলে দেখতে রাতারাতি ঝুলপি সাদা নাকের দু' পাশের দুটি রেখা দিব্যি গভীর। কচি কার্তিক তখন বুড়ো শিবে পরিণত হবে।'

পূর্ণেন্দু হাসে।

বউদি আসল কথায় অবতীর্ণ হন, 'শোনো, আমি বলছি এখনো সময় আছে, একবার শুধু মাথাটি নেড়ে দাও—'

কোনো দুর্বল মুহূর্তে সেই মাথাটিই একবার সে নেড়ে ফেলেছিলো, ব্যস, অমনিই সর্বনাশ।

আসলে বাচ্চাদের নিয়ে বউদি বেড়াতে এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্য। সেই সময়েই একদিন সে পড়ে যায় বাথরুমে। তারপরেই বউদি প্রায় রণংদেহি মূর্তিতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন 'আর এভাবে একা নয়, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।'

পূর্ণেন্দু বলেছিলো, 'কেন, স্ত্রী কি ডাক্তার না সেবাদাসী ?'

'ডাক্তার না হোক, ডাক্তার ডাকতে তো পারবে ? আর সেবাদাসীই বা কেন হতে হবে ? দরকার মতো আমিও তো তোমার সেবা করি, আমি সেবাদাসী নাকি ? তুমি তার দেখাশুনো করবে, সে তোমার দেখাশুনো করবে। একটা সঙ্গী হবে, বন্ধু হবে, দেখতে কতো ভালো লাগে। সবই হবে পারস্পরিক।'

'তাই নাকি ?' পূর্ণেন্দু হেসে কোর্টে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে গেল।

বউদি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই। দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'সিনেমায় যাবে নাকি ?'

'না। ডাক্তার আসবেন পাঁচটার সময়ে।'

'ডাক্তার কেন ?'

'মাথা ঘুরে পড়ে যাবার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, সেটা খোঁজাতে হবে তো ?'

'কী আশ্চর্য।' মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে পূর্ণেন্দু ঘুরে দাঁড়ালো, 'বলছি যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি, সে জন্য তুমি ডাক্তার ডেকেছ ?'

বউদি বললেন, 'তা নিয়ে তোমাকে কৈফিয়ত দেবো না।'

বউদির এই কর্তৃত্ব মন্দ লাগে না পূর্ণেন্দুর। এই উদ্বেগও উপভোগ্য মনে হয়। কবে মা মারা গেছেন, বাবাও তো নেই, বউদিই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে একটা সোজাসুজি সম্পর্ক আছে, একটা সস্নেহ কৌতুকপূর্ণ ভালোবাসা আছে। দাদা তার থেকে অনেক বড়ো, বউদি একান্তই সমবয়সী। সুতরাং বন্ধুত্বও অটুট। তা ছাড়া মহিলাটিকে ভারি ভালো লাগে তার।

দাদা বড়ো চাকরি করেন না, চলে কায়ক্লেশে, তার উপর তিনটি ছেলেমেয়ে। তা নিয়ে বউদির কিন্তু নালিশ নেই। সবকাজ একা হাতে করেও খুব ফূর্তি। কিন্তু এতোদিন দূরে দূরে থাকায় সম্পর্কটা তেমন ঘন ছিলো না। এই কাছে এসে দানা বেঁধেছে আবার।

ডাক্তার এলেন। দেখলেন ভাল করে। বললেন, অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক আছে। তবু একথা বলতেও ছাড়লেন না যে, সাবধানে থাকবেন। ঐ সাবধানে থাকবেন কথাটাতেই কেমন ভয় পেয়ে গেল পূর্ণেন্দু। ভাবলো কে জানে এই তাহলে মৃত্যুর পদক্ষেপ কি না। এর নামই স্ট্রোক কি না। আর সেই সুযোগেই বউদি রাজি করিয়ে চলে গেলেন। গিয়েই চিঠি লিখলেন, যেমন চাও ঠিক তেমনটি পেয়েছি। মেয়েটিকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। বলেছিলে, সমবয়সী ছাড়া কোনো খুকিকে অসম্ভব, বয়েস অন্তত পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ না হলে তুমি রাজি নও। তোমার বুড়ো বয়সে ভাগ্যি ভালো ডিভোর্সি নয়, বিধবা নয়, একেবারে একটি আনকোরা পঁযত্রিশ বছর বয়সের কুমারী। বিমাতার সংসারে দুঃখে আছে, শুধু শাঁখা বুলি ছাড়া আব কিছুই দিতে পারবে না। তুমি তো সেটাও বলে দিয়েছ যে কিছুই চাও না। আমি একরকম কথা দিয়েই দিয়েছি। একবার তুমি এসে মেয়ে দেখে গেলেই পাকা দেখার বন্দোবস্ত করবো। আর ওঁরা তোমাকে বিয়ের দিনই দেখবেন বলছেন। বোধহয় খুব বিশ্বাস-প্রবণ মানুষ তাই ছেলের বিষয়ে তেমন খোঁজখবর নেওযার কথা ভাবছেন না। বলছেন, শুনেছিই তো সব, আর আপনাদেরই তো দেখছি, তার উপরে আবাব কথা কী ?'

এই চিঠির উত্তরে পূর্ণেন্দু লিখেছিলো, 'যা খুশি করো, আমার কোনো মেয়ে দেখার বাসনা নেই। এই বয়সে ওরকম গিয়ে এক পেট খেয়ে পাত্রী পছন্দ করার মতো অশ্লীল ব্যাপার আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।'

সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছবি চলো এলো আর খবর এলো, 'এটা শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, তারপরে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক তিন মাস বিয়ের দিন নেই, করতে হলে সেই অঘ্রাণে। আমি অত দূরে যেতে রাজি নই। শুভস্য শীঘ্রম। শেযে তোমার মতি ঘুরতে কতোক্ষণ ? দিন ফেলেছি আটাশে শ্রাবণ। আসবে, বিয়ে করবে, বউ নিয়ে চলে যাবে, ব্যস। আমি সব ঠিক করে রাখবো।'

এই চিঠি পেয়ে থেকেই মনে মনে গুমরোচ্ছিলো, আর দিন যতোই ঘনিয়ে আসছিলো ততোই অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিলো। এখন টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে একটু হালকা লাগছে। চা পড়ে রইলো, প্যাড টেনে চিঠি লিখতে বসলো। 'বউদি তুমি অপ্রস্তুত হবে এমন কিছু কবতে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু নিরুপায়। বিয়ে আমি করতে পারবো না। ও আমার ধাতে নেই। মাত্রই তো ছ' দিন আগে কথা দিয়েছ, আর বাকিও আছে সাত দিন। তুমি ওদের না করে পাঠাও। যদি এমন হয় যে ওঁরা বলেন, ইতিমধ্যেই অনেক খরচপাতি করে ফেলেছেন তা হলে বোলো ক্ষতিপূরণ আমরা দেব। তাছাড়া আমার চেনা অন্য একটি পাত্রও আছে, আমারই বয়সী, তবে বিপত্নীক। কিন্তু ছেলেপুলের ঝামেলা নেই। সেও এই রকমই একটি বয়স্ক মেয়ে চায়। যা মনে হচ্ছে বিমাতার সংসারে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েটি অবাঞ্ছিত। শুধু বিনা পয়সার বর পায়নি বলেই বিয়ে দেয়নি, পেলে যে কোনো লোকেব গলাতেই গেঁথে দিতে গররাজি হবে না।'

এই পর্যন্ত লিখতেই ঠুং করে আওয়াজ হলো গেট খোলার। একটি ছিপছিপে মেয়ে ঢুকলো ভিতরে। পরনে একখানা সাদামাঠা টিয়া রং শাড়ি, লাল ব্লাউস, মাথায় লম্বা বেণী, ভঙ্গি উদভ্রান্ত। বর্ষার ধোয়ামোছা টাটকা সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েটিকে ভারি মানিয়ে গেছে।

এগিয়ে আসতে স্পষ্ট হলো চেহারাটা। গাত্রবর্ণ ধবধবে না হোক ময়লা নয়, উপরন্তু সজল, মুখশ্রী বিষণ্ণ, কিন্তু লালিত্যের অভাব নেই। বেশ লম্বা, বেশ সুগঠিত। দ্রুত পায়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আসতে আসতে বারান্দার তলায় এসে থামলো। পূর্ণেন্দুকে দেখে একটু থমকালো ; ঢোঁক গিলে বললো, 'এটা কি পূর্ণেন্দু তালুকদারের বাড়ি ?'

পূর্ণেন্দু এগিয়ে এসে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকে চাই ?'

'আমি তাঁকেই চাই তিনি কি আছেন ?'

'আমার নামই পূর্ণেন্দু, আসুন।'

মেয়েটি কুণ্ঠিত পায়ে উঠে এলো, কোণে টেবিলের উপর তাকিয়ে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা দেখে লালচে হলো একটু, থতমত খেয়ে বললো, 'ও আপনি চা খাচ্ছিলেন, তা হলে আমি বরং একটু ঘুরে আসি।'

'না না আপনি বসুন না, বলুন কী দরকার।'

'আমার একটু সময় লাগবে।'

'কদ্দুর থেকে এসেছেন ?'

'কলকাতা।'

'কলকাতা থেকে ? এখানে কোন্ পাড়ায় থাকেন ? কার বাড়ি ?'

'আমি কলকাতাতেই থাকি।'

'তা হলে কি কেবল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অদ্দুর থেকে এসেছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে আর কোথায় ঘুরতে যাবেন ? বরং আপনিও এক কাপ চা খান না। নিশ্চয়ই অনেক সকালে বেরুতে হয়েছে। ক'টার ট্রেনে এলেন ?'

'ট্রেন ক'টায় ছেড়েছে জানি না, বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ভোর পাঁচটায়।'

'ও বাবা, সে যে প্রায় শেষ রাত্রি। তা হলে তো অবশ্যই আপনার চায়ের দরকার। নির্মলা, নির্মলা—'

ঘোমটা টেনে নির্মলা এসে দরজায় দাঁড়ালো।

'এটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, পটে আর দু'কাপ করে এনে দাও।'

ঠাণ্ডা চায়ের বাসন নিয়ে চলে গেল নির্মলা।

পূর্ণেন্দু চেয়ার টেনে বসে বললো, 'এবার বলুন।'

মেয়েটি চারিদিক তাকিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সব দেখছিলো, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিলো কপালে, ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুছলো। আস্তে বললো, 'ভারি সুন্দর বাড়ি। একাই থাকেন ?'

'হ্যাঁ ? এ আমার একেবারে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।'

'কী সুন্দর ফুল ফুটেছে বাগানে। বাগান কে করে ?'

'করে মালি, নাম হয় আমার।'

বিষণ্ণ মুখে মিষ্টি করে এবার একটু হাসলো মেয়েটি, বললো, 'দেহের শ্রম মালির, বুদ্ধিটা নিশ্চয়ই তার মালিকের।'

পূর্ণেন্দুও হাসলো। 'খুব ভালো বলেছেন, একেবারে মনোমতো। এই যে চা এসে গেছে, আসুন আগে চা'টা খেয়ে নেওয়া যাক, আমি যাকে বলা যায় তৃষিত হয়ে আছি আর আপনিও নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। সুতরাং তৃষ্ণা আমার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।'

চা'টা নির্মলাই ঢেলে দিয়ে গেল। খাবারটা পূর্ণেন্দু ভাগ করছিলো, মেয়েটি একেবারে সনির্বন্ধ হয়ে বলে উঠলো, 'না না—'

'তা কখনো হয়' প্লেটটা এগিয়ে দিল সে।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে মেয়েটি বললো, 'অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'অসময় কী ? একা একা চা খাওয়ার চেয়ে সঙ্গী পাওয়া তো অনেক ভালো। আজ তো আমার সুপ্রভাত।'

'সুপ্রভাত ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই এসেছি।'

'সে তো বুঝতেই পারছি, নৈলে কলকাতা থেকে এতো সকালে এতো কষ্ট করে কেউ আসে ? কী, চাকরি ?'

'চাকরি।' এক কথায় প্রথমে একটু অবাক হলো, তারপরেই যেন খেই পেয়ে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'দুঃখিত। আমি ঐ নামকোয়াস্তেই এই শহরের বালিকা বিদ্যাপিঠের প্রেসিডেন্ট, আমার কোনো ক্ষমতা নেই।'

মেয়েটি চুপ করে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে বললো, 'আমি ঠিক কথা বলিনি, চাকরির জন্য আসিনি আমি।'

'ও। কী কাণ্ড। আসলে কদিন আগে স্কুলে একটা পদ খালি হয়েছিলো, সবাই এসে এতো ভিড় করতো, আমি ভেবেছিলাম—যাক গে প্রয়োজনটা তা হলে কী ?'

'আপনাকে কতগুলো খবর জানাবার আছে।'

'বলুন।'

'এখন মনে হচ্ছে সেটা না জানালেই বা ক্ষতি কী ?'

'আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি এখনো।'

'এমন সুন্দর সকাল, সকালের মেঘ-ছেঁড়া রোদ, বাড়ি বাগান বারান্দা—বারান্দার মালিক—' পরিপূর্ণ চোখে পূর্ণেন্দুর দিকে তাকালো সে, তারপরেই সচকিত হয়ে মৃদুহাস্যে বললো, 'অন্য কথা ভাবছিলাম।'

পূর্ণেন্দুও তাকিয়ে থেকে সহাস্যে বললো, 'সেটা না বললেও বুঝতে পারছিলাম।'

'সুখের জন্য কে না কাঙাল বলুন ?'

'তাই তো।'

'আমি এখানে এসে পৌঁছবার মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি আমার এমন মতিভ্রম হবে।'

'আমি কিন্তু আপনার বক্তব্যটা ঠিক ধরতে পারছি না।'

'পারা স্বাভাবিক নয়।'

'আপনাকে কি আমি কখনো কোথাও দেখেছি ? খুব চেনা চেনা লাগছে।'

'তা-ও অস্বাভাবিক নয়। আমি যদ্দুর জানি আপনার কাছে আমার একটা ছবি পাঠানো হয়েছিলো।'

'আপনার ছবি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার ছবি ? আপনার ছবি আমাকে কেন ? ও-ও-ও'—এইবার মনে পড়ে গেল পূর্ণেন্দুর। অবাক বিস্ময়ে স্খলিত গলায় বললো, 'তা হলে কি আপনিই তিনি ?'

'আমার নাম অনুরাধা দত্ত।'

'যার সঙ্গে আর সাতদিন বাদে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়েছিলো ?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, 'আমি এবার যাই।'

'তা কখনো হয় ? এমন অতিথিকে কখনো বিনা অভ্যর্থনায় ছাড়া যায় ?' পূর্ণেন্দুর গলায় বেশ আগ্রহ ফুটে উঠলো।

মেয়েটি রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে বললো, 'লোভের মতো পাপ আর কিছুই নেই, আমাকে এরকম অভ্যর্থনা জনানো মানেই তাতে ইন্ধন জোগানো।'

'মানে।'

'মানে—মানে' বিক্ষিপ্ত বেদনার্দ্র গলায় সহসা যথেষ্ট শক্তি এনে বললো, 'আমি আমার ভাঙাজীবন জোড়া দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছি।'

'কী হয়েছে আপনার ?'

'আমি বলছিলাম এ বিয়ে আপনি করবেন না।'

'কেন ?' পূর্ণেন্দু চমকে গেল।

'আপনি কি আমাকে চেনেন ? আমার বিষয়ে কি কিছু জানেন যে এই বয়সে এভাবে—'

সারাটা সপ্তাহই যে পূর্ণেন্দু নিজেও এই কথাগুলো ভেবেই বিব্রত হয়েছে, ভুলে গেল সে কথা। জোর দিয়ে বললো, 'চেনা জানার প্রশ্ন কী ? আমাদের দেশে তো এভাবেই বিয়ে হয়।'

'সব ক্ষেত্রে সেটা ভালো নয়। অন্তত এ ক্ষেত্রে তো নয়ই।'

'আপনার বক্তব্য বোধগম্য হচ্ছে না।'

'আমার পরিবার সত্য গোপন করে আমাকে বিয়ে দিচ্ছে।'

'কী সত্য গোপন করছে ?'

মেয়েটি চুপ করে রইলো।

পূর্ণেন্দু হিংস্র হয়ে বললো, 'আর কারোকে ভালোবাসেন, এই তো ?'

'না।'

'তবে কী।'

'জানেন বোধহয় আমি বিমাতার সংসারে প্রতিপালিত।'

'জানি।'

'তিনি আমাকে অপছন্দ করেন, বলা যায় গল্পকথার সৎমায়ের মতোই তাঁর ব্যবহার।'

'অনুমান করতে পারি।'

'যা অনুমান করতে পারেন না তা হচ্ছে এই যে, তিনি এবং তাঁর প্ররোচনায় আমার বাবা কিছুকাল যাবৎ আমাকে ভাঙিয়েই তাঁদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করেছেন।'

'আপনাকে ভাঙিয়ে মানে ?'

'সে রাস্তা ঋজু নয়, অতি কদর্য।'

পূর্ণেন্দু তাকিয়ে রইলো।

'আমার বয়েস চৌত্রিশ নয়, তিরিশ। আপনার বউদির কথামতো ঘটক সেটাকে চৌত্রিশ করে নিয়েছে।'

'ঘটক। এর মধ্যে ঘটক আছে নাকি।'

'ঘটকই এই যজ্ঞের পুরোহিত। বাবা বলেছিলেন যেখানে হোক যার সঙ্গে হোক এক

মাসের মধ্যে ঠিক করে দিতে হবে বিয়ে। তা সে দিয়েছে। কী করে আপনার বউদির সঙ্গে তার যোগাযোগ হলো, কী করে না জেনে না শুনে এই স্বর্গোদ্যান স্থির হলো আমার অদৃষ্টে, সে কথা ভেবে এখানে এসে থেকে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।'

'তা হলে বউদি ঘটকের পাল্লায় পড়েছিলেন!'

'ঘটক রাতকে দিন করে। আমার পক্ষে রাতকে রাত রাখলেও বাবা পিছু-পা হতেন না। কিন্তু আপনাদের দিক থেকে আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিলো।'

'আপত্তি না থাকলে ঘটনাটা খুলে বলবেন কি?'

'পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত পিতৃগৃহের ক্রীতদাসী ছিলাম। বিমাতার সন্তান-সন্ততি পালন করা থেকে সংসারের অনুকোটি চৌষট্টি সমস্ত কাজই আমাকে করতে হতো। হঠাৎ কোথা থেকে কে এক ধনী ব্যক্তি এসে হাজির হলেন বাড়িতে। কী সুবাদে এসেছিলেন, কেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। বাড়িতে কয়েক দিন মায়ের সঙ্গে বাবার প্রচণ্ড ঝগড়া চললো, মনে হলো কোনো বিষয়ে মা যা বলছেন বাবা তাতে কোনো মতেই রাজি হচ্ছেন না। তারপর কোনো সন্ধ্যায় কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে-যাবার কথা বলে বাবাই ঐ লোকটির বাগান বাড়িতে রেখে এলেন আমাকে।'

'সে কী!'

'ছ' মাস বাদে ফেরত এলাম আমি। সবাইকে বলা হলো মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। কয়েকদিন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করলাম, যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো ভাবলাম, আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম, কিছুই পারলাম না। আবার জুড়ে গেলাম সংসারের ঘানিতে। বিমাতার একটি কন্যার ভালো ভাবে বিয়ে হ'লো। কিন্তু কন্যা তো আরো দুটি আছে। দ্বিতীয়বার দালাল লাগিয়ে আবার কার সন্ধান পেলো, এবার বাড়িতে কোনো বচসা শোনা গেল না। চাকরির ইনটারভিউর নাম করে নিয়ে গিয়ে আবার আর এক গুহায় ঢুকিয়ে দিয়ে এলেন। ফিরেছিলাম তিন মাস বাদে। আর এই সেদিন যখন তৃতীয় খদ্দের প্রস্তুত, আমি বুঝে ফেললাম। বাঁচবার অন্য কোনো উপায় না দেখে বললাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা, আমাকে দিয়ে আর উপার্জনের আশা নেই। বলাই বাহুল্য এর জন্য আমাকে যে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হলো তা অকথ্য। কেননা দ্বিতীয় লম্পটের কাছ থেকে অনেক আগেই ফিরে এসেছিলাম। সুতরাং এ অপরাধের জন্য সর্বতোভাবে আমিই কোনো না কোনো ভাবে দায়ী। ক্ষমার প্রশ্ন কোথায়? মা নবদ্বীপের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসতে বলেছিলেন, বাবা সেটা না করে কারো না কারো গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে দায় মোচন করতে চাইলেন। কিন্তু যদ্দিন থেকে এই বিয়ে ঠিক হয়েছে, তদ্দিন থেকে আমি দিনে রাত্রে এক বিন্দু শান্তি পাচ্ছি না। কেবলি মনে হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে আমি কার ঘরে ঢুকবো? পাপ মানুষের দেহে নয়, মনে। যা আমি বাধ্য হয়ে করেছি তার জন্য আমি দায়ী নই, সেখানে আমি একটা অসহায় যন্ত্র মাত্র। কিন্তু যিনি আমাকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাঁকে আমি কোনো রকমেই ঠকাতে পারি না! সে পাপ তো দেহের পাপের মতো স্নান করলেই ধুয়ে যাবে না? মনের মধ্যে সাপের বিষ হয়ে অহরহ আমাকে যন্ত্রণা দেবে।'

পূর্ণেন্দু তীব্র স্বরে বলে উঠলো, 'এ অবস্থায় আপনি ওরকম পিতামাতার কাছে থাকলেন কেন?'

'কোথায় যাবো বলুন? আমার কেউ নেই। অবিরাম গৃহবন্দী থেকে থেকে ঘর ছাড়া আর আমি কিছু জানি না। আমার চরিত্র এতো দুর্বল যে, বিদ্রোহ করে রুখে উঠবো তা পর্যন্ত পারি না। ছেলেবেলা থেকে ভয় ছাড়া আর আমার কোনো সঞ্চয় নেই মনে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। তাই যদি হবে তাহলে কী সাহসে এখানে এলেন।'

'আমার বিবেকবোধই আমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে। এই আমি প্রথম জ্বলে উঠেছি একবারের জন্য। এই আগুন আগে জ্বললে এখানে আসবার প্রশ্ন উঠতো না।'

'কী করতেন ?'

'আর কিছু না পারি গলায় দড়ি দিতে পারতাম।' সজল চোখে তাকিয়ে হাসলো 'অনেক বিরক্ত করলাম, অনেক সময় নষ্ট করলাম এবার যাই।' দু পা এগিয়ে ছিলো। পূর্ণেন্দু উঠলো। তার মুখের ফর্সা রং টক টক করছিলো, বললো, 'কোথায় যাবেন ?'

'আর কোথায় ? যদি ট্রেনের তলায় না পড়তে পারি নিশ্চয়ই সে বাড়িতেই উঠবো গিয়ে।'

'অসম্ভব।'

অনুরাধা থামলো, ব্যাকুল স্বরে বললো, 'কতো যে অসম্ভব আমার চেয়ে কে বেশি জানে। এমন কি হয় না, আপনি সত্যি আপনার স্কুলে আমাকে একটা কাজ দেবেন। বাচ্চাদের আনা-নেয়ার কাজ দিলেও আমি তা করতে পারি।

'যে মেয়ে আর সাতদিন বাদে আমার স্ত্রী হবে তাকে আমি আয়ার কাজ করতে দেবো কেন ?'

'ক্কী !' অনুরাধার ভুরু বেঁকে গেল।

'এই মাত্র বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। এখন আর একটা পাঠাতে হবে।'

'ও।'

'বউদিকে জানিয়ে দি তাঁর নির্বাচিত মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হবার পরে আমি আমার মত পাল্টালাম।'

অনুরাধা স্তম্ভিত বিস্ময়ে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে রইলো, চোখে চোখ রেখে হাসলো পূর্ণেন্দু 'না, দয়া নয়, উদ্ধার নয়, কোনো মহানুভবতাও নয়, ভালো লেগেছে বলেই ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো ?'

'সব জেনেও তারপর—'

'ও কিছু নয়' হাতের ঝাপটায় সে কথা সে নস্যাৎ করে দিল, 'তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে আমি যে কী পরিমাণ উড়েছিলাম তা কি আমি ছুটে বলতে গেছি আপনাকে ? আপনার মতো ফাঁদে পড়ে নয়, নিতান্তই স্বেচ্ছায়। সেটা ভাবছি না, ভাবছি আপনার পাষণ্ড পিতৃদেবটিকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায়। আব এক জন রেজিস্ট্রারের কথাও ভাবছি।'

'রেজিস্ট্রার ?'

'এখন তো সাতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয় ? ঐ নরকুণ্ডে এক মুহূর্তের জন্যও আর আপনাকে যেতে দিতে আমি রাজি নই। রেজিস্ট্রার আমার চেনাই আছে, বললেই নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে সাক্ষী সাবুদ ডেকে এখুনি একটা বিয়ের ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন। আমি বরং যাই, সব ব্যবস্থা করে ডেকেই নিয়ে আসি। আপনি ভিতরে যান, বিশ্রাম করুন, গৃহস্থালীও দেখতে পারেন একটু—হঠাৎ আবেগ ভরে হাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে 'আমার ভীষণ ভালো লাগছে, কী সুন্দর দিনটা আজকে—'

চলে গেল সে। অনুরাধা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো, এতো দুঃখের পরে এতো প্রার্থনার পরে এতোদিনে সত্যিই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দময় উত্তেজনার উপলব্ধিতে অভিভূত হয়ে রইলো।

ঈশ্বর ও নারী

হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ যাওয়ার পথে একটি পর্বত চূড়ায় একটি আশ্রমের চত্বরে বসে মহাঋষি আনন্দযোগী ছাত্র শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিকেল পড়ে এসেছে, আঁধার ঘনিয়ে এলো।

গেরুয়া বসনের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত জীবনের ঘষা তামার মতো উজ্জ্বল রং এবং সূর্যের রং মিলে অদ্ভুত এক বর্ণের সমাবেশ সৃষ্টি করেছে। গলায় লাল রুদ্রাক্ষের মালা, দেহ সুঠাম, মাথার চুল ঘন, আবক্ষ লম্বা দাড়ি সমাচ্ছন্ন মুখশ্রী প্রশান্ত গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি দিনান্তে বৎসসকাশে গাভীর মতো সজল ও স্নেহময়। বাক্য দ্বারা শিষ্যদের তিনি গাভীর মতোই লেহন করছিলেন। আশ্রমটির নাম অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষের বৈদিক ব্যাখ্যাই করছিলেন তিনি। আশ্রমটি আশ্রমও বটে, বিদ্যায়তনও বটে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছাত্রাবাস ও গুরুগৃহ। কয়েক ধাপ নেমে কিছু কিছু যোগাভ্যাস কুটিরও আছে। পায়ের তলায় চিরতরঙ্গিনী স্রোতস্বিনী প্রবাহিনী গঙ্গা। গঙ্গার জল হিমালয়ের ছায়া বুকে ধরে গাঢ় সবুজ। এঁকে বেঁকে নাচের ভঙ্গিতে সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে কোথায় কোথায় চলে গেছে। কখনো পাটির মতো শীতল, কখনো উতলা। বাধাপ্রাপ্ত হলেই চণ্ডীরূপিণী, নচেৎ শান্ত। জলের তলাকার নুড়ি বিছানো বুক স্ফটিক পাথরের মতো স্বচ্ছ। পাথরের রং অবশ্য সর্বদাই সাদা নয় কখনো লাল কখনো গেরুয়া কখনো সবুজ। তবে বেশির ভাগই সাদা। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা গুরুরা যোগীরা মুনিরা সবাই নেমে আসেন এখানে, হস্তপদ প্রক্ষালন করেন, অবগাহন করেন, সূর্যস্তবে অগ্নিস্তবে ভরে দেন দশদিশি।

আনন্দযোগী নামেন না। তাঁর নিবাস অনেক উঁচুতে একটি সুরম্য শ্বেতপাথরের নাতিপ্রশস্ত ঘন বৃক্ষলতায় ছাওয়া গুহা অভ্যন্তরে। গুহার আশেপাশে মোটা ধারায় অনেক ঝরনা নেমেছে। এই ঝরনার জলেই তিনি অবগাহন করেন, পানও করেন এই জল। তাঁর আহারও এই অরণ্য থেকেই সংগৃহীত হয়। এই অরণ্যের সমস্তই তাঁর নখদর্পণে। যেমন ফলমূলের সন্ধান জানেন, তেমনি বনৌষধি পরিচয়েও দক্ষ। পাহাড়ের এই অংশটাকে তিনি বলেন দেবস্থান। তাঁর ধারণা দেবতারা একদা এরকম জায়গাতেই বাস করতেন।

গুহার অনেকটা নীচে, অন্তরীক্ষের কিছুটা উপরে, একা একখানা লতাপাতায় ছাওয়া কুটির আছে, পৃথিবীর অনেক নমস্য পণ্ডিত অনেক আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানের জন্য আসেন এখানে ; আনন্দযোগীর সঙ্গে মিলিত হন, তাঁদের জন্যই এই কুটির।

গুহা থেকে ছমাস অন্তর কোনো এক নির্দিষ্ট তিথিতে নেমে এসে অন্তরীক্ষের চত্বরে বসেন তিনি। শিষ্যরা এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন। তাঁকে দর্শন করে তাঁদের মন ভক্তিরসে পূর্ণ হয়, ঈশ্বর দেখার আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে।

আজ সেই দিন। তিনি বলেছিলেন, 'অন্তরীক্ষ মানে শূন্য নয়, স্বর্গ এবং মর্তের মাঝামাঝি একটি বিস্তীর্ণ সমতল। দেবযানগামীরা এই পথেই গমন করতেন। যাঁরা ইষ্ট পূর্ত এবং দানাদি কর্মদ্বারা পুণ্যার্থী হতেন তাঁদের জন্য এই পথ সুগম ছিলো। জীবাত্মাই

কর্মফল ভোগ করেন পরমাত্মা বা ঈশ্বর তা করেন না। অন্তঃকরণকে চারভাগে বিভক্ত করো, যেমন চিত্ত বুদ্ধি মন অহংকার। বিষয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা—

সহসা উৎকীর্ণ হলেন। বহুদূর থেকে শব্দ ভেসে এলো 'বাঁচাও বাঁচাও।' বললেন 'দেখে এসো তো কোথাও কেউ বিপন্ন হয়েছেন কি না।'

অন্তরীক্ষ থেকে নেমে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আর্তস্বর অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ নেমে গেলেন কয়েকজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মহিলাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরাধরি করে তুলে এনে আনন্দযোগীর পায়ের তলায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপচাপ। অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তাভায় মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দযোগীর চোখের দৃষ্টি ঈষৎ চঞ্চল হলো। কোনো মন্ত্র আওড়ালেন বিড় বিড় করে। বললেন 'আরোগ্য কুটির।'

রোগশোক সর্বত্রই আছে। দেহধারণ করলেই তার মাশুল দিতে হয়। এই আশ্রমও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই একটি আরোগ্য কুটিরও আছে তবে রোগের আক্রমণ এখানে প্রায় শূন্যের অঙ্কে। ছাত্র শিষ্য গুরু সকলেই সুস্থ এবং সবল। আশ্রম পিতা আনন্দযোগীর নির্দেশে কতগুলো যোগব্যায়াম পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা সর্বদাই প্রফুল্ল এবং নীরোগ। কুটিরটি মোটামুটি খালিই পড়ে থাকে। গুরুর আদেশে মহিলাটিকে তাঁরা সেখানেই গিয়ে কম্বল শয্যায় শুইয়ে দিলেন।

আনন্দযোগী নিজের গুহায় উঠে গেলেন না, অন্তরীক্ষের দুই ধাপ নীচে 'আরোগ্য কুটিরে' এসে দাঁড়ালেন। এই আশ্রমের তিনিই বৈদ্য। অরণ্যের লতাপাতা বৃক্ষমূলই তাঁর মহৌষধি।

নাড়ি দেখলেন ক্ষীণ, কপালে রক্তের ধারা নেমেছে। মহিলাটির পরনে বিজাতীয় পোশাক। গভীর নীল রংয়ের স্ট্রেচ প্যান্ট, গভীর লাল রংয়ের শার্ট। মাথায় রুমাল বাঁধা।

নিজে হাতেই তিনি রুমালের বাঁধন খুলে দিয়ে ক্ষতস্থান দেখতে চাইলেন। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। চাপ চাপ রক্ত। তিনি শিষ্যদের মুখের তাকালেন। তাঁরা প্রশ্ন বুঝে নিচু জবাব দিলেন, বোধহয় গাড়ির দরজা খুলে ছিটকে পড়ে গিয়েছেন, ভাগ্য ভালো অতল খাদে জলের মধ্যে গিয়ে পড়েননি এপাশে পাহাড়ের গায়ে পড়েছেন। পাথরের আঘাতেই এই রক্তক্ষরণ।'

প্রাথমিক শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করলেন তিনি, তারপর ক্ষতস্থানে লতাপাতার ওষুধ ব্যবহার করে নিপুণ হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

শিষ্যরা অস্ফুটে বললো, 'আমরা আছি, আপনার বিশ্রাম দরকার।'

তিনি অস্ফুটে বললেন, 'জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমার থাকা দরকার, তোমরা যাও।'

তাই হলো, তিনি বসে রইলেন ধ্যানস্থের মতো, শিষ্যরা চত্বরে ফিরে, গেলেন। পাশে উপাসনা গৃহ। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আনন্দযোগীর আশ্রমিক জীবনে এমন ঘটনা অভিনব। জীবন কি বিচিত্র। না ভেবে পারলেন না। এই গুহাবাসী হয়েছেন তিনি ষোলো বছর আগে। ছিলেন গ্রামের এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ছেলে। মাতৃহীন বালক বাবার আদর্শেই অনুপ্রাণিত। বেদবেদান্তে বাবার দখল ছিলো সর্বজনবিদিত। সারা গ্রমেরই তিনি ভক্তিভাজন ছিলেন। দেখতে দেখতে ছেলেকেও সেই রাস্তাতেই নিয়ে গেলেন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকেও তারা সম্মানের চোখে দেখতে লাগল। জমিদারের স্থাপিত স্কুল সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো এমন ছাত্ররত্ন পেয়ে। প্রবেশিকা

পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্কুল মিলিয়ে প্রথম দশজনের মধ্যে প্রথম হলেন তিনি। সেই যে প্রথম হলেন আর কখনো দ্বিতীয় অঙ্কে প্রবেশ করলেন না। দর্শনশাস্ত্রে পিতার নিকটই হাতেখড়ি। সেই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধীরে ধীরে উদাস আর অন্যমনস্ক বোধ করতে লাগলেন। অনুসন্ধিৎসা আচ্ছন্ন করে রইলো মন। বাবা ছেলেবেলায় আদর করে ডাকতেন চৈতন্য পণ্ডিত, এক সময় পুত্রের অবস্থা প্রায় সেই রকমই অনুভব করে বিবাহ দিতে উদ্যত হলেন।

সেই সময়ে সেই গ্রামে এমন যোগ্য পাত্র আর কে ছিলো ? গুণগ্রাহী জমিদার রুদ্রকান্ত রায়চৌধুরী একদা তাঁর নাতনীর জন্য সসম্মান প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন এসে। অতি উঁচুদরের মানুষ, অতি সজ্জন, অতি শিক্ষিত। পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে মান্য-মাননার সম্পর্ক। অবস্থার তারতম্য সেই শ্রদ্ধাভক্তিকে কখনোই ক্ষুণ্ণ করেনি।

বললেন, কুলেশীলে বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে ধ্যানে আপনার পুত্রের সমতুল্য আর কে আছে ? আমার পৌত্রী তাঁর যোগ্য না হোক এমনিতে অযোগ্য নয়। তার রূপ আছে। গুণের মধ্যে স্কুলের পাঠ্য সাঙ্গ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কন্যার শিক্ষাদীক্ষার জন্যই তার পিতামাতা কলকাতানিবাসী। আপনি তো জানেন ভবানীপুরে আমার একটি বাসস্থান আছে।

পণ্ডিতমশায় মুখ নিচু করে থেকে বললেন, 'এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর আমার কী হতে পারে। তবে মা লক্ষ্মী যে স্বাচ্ছন্দ্যে আপনার গৃহে প্রতিপালিত এবং অভ্যস্ত আমার কুটির তার পরিপন্থী হবে না তো ?'

রুদ্রকান্ত বললেন, 'আমার কিঞ্চিৎ অর্থ হয়তো বেশি আছে কিন্তু পরমার্থ কোথায়, আপনার পুত্র আমাকে সেই দান দেবে। শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছে। আমার নাতনী এমন প্রতিভাবান স্বামী পেলে অবশ্যই তার জীবন ধন্য মনে করবে।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'আমার কোনোই আপত্তি নেই, সপ্তাহান্তে আমার পুত্র ঘরে এলে আমি তার মতামত জেনে নেবো।'

পুত্র বললো, 'না।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'কেন নয় ?'

পুত্র বললো, 'আমার ভালো লাগে না।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'তুমি শৈশবে মাতৃহীন। কোনো মেয়ের স্পর্শে তুমি ধন্য হওনি, তাই তুমি সেই পরমাশ্চর্য স্নেহকে অনুধাবন করতে পারছো না। সঙ্গিনীর মর্ম আমি জেনেছিলাম কিছুদিনের জন্য, আমি জানি, স্ত্রীরত্ন সকল রত্নের সেরা। বিবাহ না করলে কোনো পুরুষ সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হয় বলে আমার ধারণা নেই।'

পুত্র চুপ করে থাকলেন।

পিতা মৌনং সম্মতি লক্ষণং মনে করে বললেন, 'তাহলে একবার তাকে তুমি দ্যাখো।'

'দেখেছি!'

'কবে ? কোথায় ?'

''বাল্যকালেও দেখেছি, কালও দেখলাম।'

'কাল ?'

'পদ্মদিঘির ধারে কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছিলো।'

'কেমন লাগলো ?'

হঠাৎ একটু দোলা লাগল হৃদয়ে।

সাক্ষাৎকারের অভিনব নমুনাটা মনে পড়ে গেল। তিনিও ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলেন। একটি মেয়ে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললো, 'আমি জানি আপনি কে।'

চিনতে তিনিও পারলেন। বললেন, 'আমিও জানি আপনি কে।'

'তাহলে আমার কুকুরটা একটু ধরবেন ?'

'কেন ?'

'তাহলে আমি ঘাটে নেমে পদ্মফুল আনবো।'

'পদ্মফুল কি ঘাটের নাগালে ? সে তো মধ্য জলে ?'

'একটা কিছু দিয়ে টেনে আনবো। আপনি ধরুন না ওকে।'

এই সারল্যে মুগ্ধ হলেন তিনি। তাঁর উদাস যুবক হৃদয় অনুরণিত হয়ে উঠলো বললেন, আপনার কুকুর আপনিই ধরে থাকুন আমি দেখছি কোনক্রমে একটা ফুল আপনাকে উপহার দিয়ে ধন্য হতে পারি কি না।'

ধন্য তিনি হলেন। মেয়েটির মুখ পদ্মফুলের মতোই আরক্ত দেখালো আনন্দে। যাবার আগে কেমন একরকম করে যেন তাকিয়ে গেল।

তারপর আজই এই প্রস্তাব শুনে প্রায় চমকে উঠেছিলেন কিন্তু বিবাহ ব্যাপারটিতে মনের কোথাও সায় খুঁজে পেলেন না।

পিতার প্রশ্নের জবাব দিতে সামান্য দেরি করে বললেন 'এটুকু দেখাতে কেমন লাগলো বলা শক্ত।'

'তাহলে তুমি মেলামেশা করে দ্যাখো।'

'আমাকে ভাববার সময় দাও।'

'নিশ্চয়ই, তবে আমার বড়ো ইচ্ছে তুমি এবার বিবাহ করো।'

সারা রাত ধরে সত্যিই তিনি ভাবলেন। স্বামী হিসেবে নিজেকে কোনোক্রমেই তাঁর যোগ্য মনে হলো না। তিনি যে রকম জীবনের প্রয়াসী তার সঙ্গে বিবাহের কোন মিল নেই। নিতান্তই নিরীহ বেরসিক মানুষ তিনি। সহপাঠীরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করেছে চিরকাল। ছাত্রজীবনেও এই নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, এখন শিক্ষক জীবনেও তিনি ব্যতিক্রম নন। যদিও বয়েস তাঁর পঁচিশ বছর সাত মাস। অন্যান্য তরুণ মাস্টাররা হেসে বলেন, বাহান্ন বছর সাত বাহান্নং তিনশো চৌষট্টি মাস। এ অবস্থায় বিয়ে করলে কোন মেয়ে তাঁকে সহ্য করবে ? তাঁর খাওয়ার আগ্রহ নেই, পরার আগ্রহ নেই, সিনেমা থিয়েটার নারী সংশ্রব কিছুরই কোনো তৃষ্ণা নেই। শুধু অন্বেষণ। নচিকেতার অন্বেষণ। কিন্তু নচিকেতা তো জবাব পায়নি, আমি পাব।

তবু ঠিক হলো বিয়ে। গুরুজনদের অদম্য ইচ্ছের সঙ্গে সেই মেয়েটির প্রেম যুক্ত হয়ে তাঁকে বিচলিত করলো। যথাবিহিত আয়োজন চলতে লাগলো। পিতা তস্য পিতার বিত্তে, মন্দ ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন না। বাসপোযোগী একখানা বাড়িও ছিলো প্রভূত স্বর্ণালঙ্কারাদি ছিলো, চাষ-আবাদের জমিও সম্বৎসরের খাদ্য যোগান দিত।

অথচ খরচ ছিলো না কিছু। বাবা প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করতেন। মাঝে মাঝে

বলতেন, 'একবার পথে বেরুবো। তুমি বড়ো হয়ে বিবাহ করলে আমি প্রবজ্যা নেবো। দেবতাদের বাসভূমি দেখবো এ আমার আজন্মের সাধ।'

চকিত হয়ে তিনি বলতেন, 'দেবতাদের বাসভূমি ? সে তো স্বর্গ।'

'স্বর্গেই তো। আমি সেই স্বর্গেই যেতে চেষ্টা করবো।'

আট-দশ বছরের বালক, মহামহোপাধ্যায় শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর পুত্র আনন্দশঙ্করের দুই চোখ তখন জলে ভরে যেতো। তিনি জানতেন, বাবার স্বর্গে যাওয়া মানেই তাঁর মৃত্যু।

'আরে বোকা, না না। তোকে ফেলে আমি মৃত্যুবরণ করবো না। আমার আয়ুর পরিধি জানি। দেবতারা কি ঈশ্বর নাকি ? দেবতারাও মানুষ। উৎকৃষ্ট মানুষ। ভবিষ্যতে তুই যা হবি।'

'দেবতারা মানুষ ?' আনন্দশঙ্কর একেবারে হতবাক।

'আয় তোকে এখুনি বুঝিয়ে দি পরে বড়ো হয়ে যখন বেদবেদান্তে দিগ্গজ হবি তখন মিলিয়ে নিস।'

তারপর বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আদিকালে যে মনুষ্যকুল সভ্যতায় সমধিক অগ্রসর ছিলেন তাঁদেরই দেবতা বলা হতো। তাঁরাই আর্য। হিমালয়ের বিশাল অরণ্যপর্বত ঘিরে এঁরা নিজেদের বাসভূমি তৈরি করে নিয়েছিলেন। পাহাড় খনন করে করে অতি সুদৃশ্য সুগঠিত সুরক্ষিত সব পথ তৈরি করেছিলেন। সেই পথ ধরে কখনো কখনো তাঁরা স্বর্গভূমি থেকে অন্তরীক্ষ অঞ্চল পেরিয়ে নিচে মর্ত্যলোকেও নেমে আসতেন। অন্তরীক্ষ ছিলো গন্ধর্বদের বাসস্থান। দ্যুলোক এবং ভূলোকের মধ্যবর্তী এক বিশাল পার্বত্য অঞ্চল। ঠিক এর উপরেই স্বর্গলোকের শুরু। চার ধরনের পথ ছিলো। এই সব পথ এমন ছিলো যে কোনো শত্রুর সাধ্য ছিলো না সেখানে ঢোকে। স্বর্গলোক থেকে দেবতারা দুটি ভিন্ন-পথে গমনাগমন করে বাইরের জগতের সংশ্রবে আসতেন তার একটি হচ্ছে দেবযান, অন্যটি পিতৃযান। দেবযান দেবলোকের কর্মীরা রক্ষা করতো পিতৃযান পিতৃলোকের অধিপতি যমের রক্ষণাবেক্ষণে সুরক্ষিত থাকতো। পিতৃযান কিন্তু স্বর্গলোকের আরো উপরে। শুধু পিতৃযানই নয় দেবযান দুইলোকেরই সর্বময় কর্তৃত্ব যমের উপরেই ন্যস্ত ছিলো। তিনিই ছিলেন স্বর্গ-রাজ্যের হর্তাকর্তাবিধাতা। দেবতাদের এবং পিতৃগণের অন্ত্যেষ্টির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বলে তাঁকে মৃত্যুও বলা হতো। শত্রুর গতিবিধিও যমের কর্মচারীরা লক্ষ্য করতো। যে-সব অপরাধীকে তারা বেঁধে যমের কাছে নিয়ে আসতো তারা কিন্তু কেউ মর্ত্যজাতীয় মনুষ্য নয় সবাই দেববর্গীয়। মর্ত্যজাতীয়ের শাস্তিবিধান তিনি নিজের হাতে করতেন না। সেটা ছিলো তার অনুচরদের হাতে। যমদূত আখ্যাটি বোধহয় এই থেকেই প্রচলিত।

এখন যে পুলিশেরা দেশে-বিদেশে কুকুর দিয়ে খুনের কিনারা করে সেটা নতুন নয়। তখনো সারমেয় রক্ষীরা টহল দিয়ে ফিরতো, যাদের 'স্পর্শ' বলা হতো, (অর্থাৎ স্পাই) তাদের সঙ্গে সঙ্গে সব সময়েই এই রক্ষীদের দেখা গেছে, এরা ভীষণ হিংস্র-প্রকৃতির ছিলো, অপরাধীদের ঠিক চিনে বার করতে পারতো। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সময় তাঁর পিছে যে একটি কুকুর এসে সশরীরে স্বর্গ গমনে সৃষ্টি করছিলো নিশ্চয় এদেরই বংশধর।'

বলতে বলতে পিতার দৃষ্টি সুদূর হয়ে উঠতো, পুত্রও আর মর্ত্যভূমিতে অবস্থান করতেন না।

আট-দশ বছর বয়েসের শোনা সেই গল্প পঁচিশ বছর বয়সেও গিজগিজ করতো তাঁর

মাথার মধ্যে। বাবা প্রবজ্যায় যাবেন কি যাবেন না সেটা গৌণ, বড়ো হতে হতে তাঁর ইচ্ছেটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিলো।

তবু বিয়ে ঠিক হলো। পিতামাতার রুচিমতো লরেটোয় পড়া কিঞ্চিৎ ইঙ্গভাবাপন্ন মেয়েটি অদ্ভুতভাবে আসক্ত হলো তাঁর প্রতি। ঘন ঘন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলতে লাগলো দুই বাড়িতে। ঘন ঘন দেখা হতে লাগলো ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে তাঁর অপ্সরা বলে ভ্রম হতো। সেই যে জলের ধারে কুকুর নিয়ে বেড়াতে দেখেছিলেন প্রথম দিন, সেই থেকেই এই ধারণার জন্ম। অপ্সরারাও নানাপথে তাদের পালিত কুকুর নিয়ে ঘুরতো। অপ মানে জল। তারা জলের কাছাকাছি থাকতো বলেই তাদের নাম অপ্সরা।

মেয়েটির নাম যে কী ছিলো। চোখ বুজে চিন্তা করলেন মহাঋষি আনন্দযোগী, কিছুতেই মনে পড়লো না। অথচ চেহারাটা আজও পোকায় কাটেনি। এই ষোলো বছরেও নয়। পরিষ্কার। স্পষ্ট। উজ্জ্বল।

বিবাহের বারো দিন আগে মৃত্যু ঘটলো পিতার। সাপে কাটলো তাঁকে। পিতা তাঁর কাছে শুধু পিতাই ছিলেন না, পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা সব কিছুর প্রতীক। শোকে আত্মহারা হলেন। বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল এক বছরের জন্য। তিনি শান্তির আশায় পর্যটনে বেরুলেন ছুটি নিয়ে।

বেরুবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, সালঙ্কারা এই মেয়েটি, এই যে এখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুয়ে আছে মেঝেতে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে শোবার ঘরে ঢুকলো। প্রদীপ জ্বলছিলো, ছায়া কাঁপছিলো পিতার সঙ্গবিহীন শূন্য কক্ষে। আনন্দশঙ্কর শুয়ে শুয়ে বেদাধ্যয়নে রত ছিলেন। পিতার বর্ণিত দেবযান পিতৃযান বিষয়েই পাঠ নিচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, 'কে ?'

'আমি।'

আধো অন্ধকার ঘরের নির্জনে মেয়েটির সুমিষ্ট গলা যেন গান গেয়ে উঠলো। তিনি সাগ্রহে বললেন, 'এসো। বোসো। এই অসময়ে ?'

'তুমি তো কাল সকালেই চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'কবে ফিরবে ?'

'ছুটি ফুরোলেই ফিরতে হবে।'

'শুধু কি ছুটি ফুরোবে বলেই ফিরবে ? আর কিছু নয় ?'

'আর কী ?'

মেয়েটির চোখ ছল ছল করলো। চুপ কার ঢোক গিললো। আনন্দশঙ্কর নিজেব ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত গলায় বললেন, 'তুমি আছ সে কথা আমি একদিনের জন্যও ভুলবো না।'

'আমি জানি, ভুলবে।'

'আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই ?'

'তুমি যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে।'

'কেন ?'

'তোমার মন আমার মধ্যে নেই।'

'তুমি জানো ?'

'জানি।'

'ভুল জানো। আমি এই জগতে যাকে প্রাণপেক্ষা ভালোবাসি, সে তুমি।'

'জানি।'

'জানো?' তবে কেন বলছো আমার মন তোমার মধ্যে নেই।'

'তুমি অনেক বড়ো। তোমাকে আমি এই দুই হাতের ভিতরে কেমন করে বেঁধে রাখবো? এই বলে সত্যি দুই হাতের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তিনিও তাঁর দুই হাতের দৃঢ় আলিঙ্গনে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে ভরে রেখে কাঁদতে দিলেন। কোনো স্ত্রীলোকের গাঢ় স্পর্শ সেই তাঁর প্রথম, সেই তাঁর শেষ।

দেবযান পিতৃযান খুঁজতে এসে এই পর্বতে পথ হারিয়েছিলেন তিনি। তখন পাহাড়ে উঠবার এমন সরকারি পাকা রাস্তা ছিলো না, পদব্রজেই ভ্রাম্যমাণ ছিলেন। হেঁটে হেঁটে উঠতে ছ মাস লেগেছিলো, গায়ে উকুন হয়ে গিয়েছিলো। তবু নেশা। কিন্তু সত্যিই কি বেদ বর্ণিত কোনো পথ আর আছে তার পুণ্য চিহ্ন বুকে নিয়ে। নেই। কবে কোন অরণ্য গ্রাস করেছে তাকে। তবু যেদিন এই অন্তরীক্ষের চত্বরে এসে দাঁড়ালেন, একটা বুক ফাটা চিৎকারে আকাশ বাতাস পাহাড় পর্বত মথিত করে বলে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

স্বভাবতই তিনি বিষণ্ণ গম্ভীর। পুস্তকের সঙ্গে ছাড়া মনুষ্যসংশ্রবে কখনো কোনো উত্তেজনা অনুভব করেন না, কিন্তু সেদিনের আনন্দ প্লাবিত জ্যোৎস্নার মতো সারা দেহমনে ছড়িয়ে পড়ছিলো। পাহাড় আর মাটির মধ্যস্থলে এইরকম একটি সমতল চত্বর আবিষ্কার করে সত্যিই মনে হলো এরই নাম অন্তরীক্ষ। এককালে এইখানেই গন্ধর্বরা বাস করে গেছেন।

কিন্তু স্বর্গের পথ কোথায়? কোথায় দিব্যলোক পিতৃলোক। কোন পথে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেছিলেন? কোন পথে নচিকেতা যমসকাশে এসেছিলেন?

পাগলের মতো খুঁজতে লাগলেন সেই সব রাস্তা। ধীরে ধীরে সূর্যালোক উদ্ভাসিত পর্বতশিখর কখন অন্ধকারে বিলীন হলো। তিনি কোনো সুড়ঙ্গ পথে চলতে চলতে বর্তমানের বাসস্থান এই গুহার কাছাকাছি উঠে এসে জ্ঞান হারালেন। কিন্তু মারা গেলেন না, শীতে জমে থাকলেন না। রজনীর শেষযামে চোখ খুলে কী যে দেখলেন, কী যে দেখলেন না, কী যে পেলেন, কী যে পেলেন না, তার কোনো বর্ণনা নেই।

হাতে তাঁর এক বছর সময় ছিলো। চাকরির জন্য ভাবেননি, এই মেয়েটির জন্য ভেবেছিলেন। নিয়ম মতো এক বছর অশৌচ পালন করবেন, তারপর বিবাহ। স্তবে বসলেন—

হে দেবরূপিণী রাত্রি, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার স্পর্শ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ। নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ শোভা সম্পাদন করেছ তুমি। আমি বিমুগ্ধ। যাঁরা নীচে আছেন, অথবা যাঁরা উর্ধ্বে আছেন সকলকেই তুমি আচ্ছন্ন করে আছ। তুমি এসেই ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করেছিলে। তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে রাত্রিদেবী, পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস করে তদ্রূপ তোমার আগমনে আমরা শয়ন করেছি, তুমি আমাদের পক্ষে শুভকরী হও। চরাচর নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ সকলেই নিস্তব্ধ। তুমি সকলের পক্ষেই শুভকরী হও। হে উষাদেবী, ঋণকে যেমন পরিশোধ পূর্বক নষ্ট করো, সেই রকম অন্ধকারকেও এবার দূরীভূত করো। হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তুমি বিদায় নিচ্ছ, তেমাকে আমি বারংবার নমস্কার করি, তুমি আমার স্তব গ্রহণ করো।

হে আমার হৃদয়, তুমি তো জান, তৎকালে যা ছিলো না, কোনোকালেই তা ছিলো না। পৃথিবীও ছিলো না অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিলো না। কে আবরিত করে রেখেছিলো ? এই গম্ভীর গর্জনপটিয়সী জলধারা কি তখন ছিলো ? তখন মৃত্যু ছিলো না, জীবন ছিলো না, অমরত্ব ছিলো না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিলো না। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। সমস্তই চিহ্নবর্জিত, শুধু অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা তিনিই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। কোথা থেকে যে কী জন্মাল কেই বা প্রকৃত জানে। কেই বা বর্ণনা করতে পারে। দেবতারাও তো এই সমুদয় সৃষ্টির অনেক পরে। শুধু তিনি জানেন যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরম ধামে সমাহিত। অথবা তিনিও কি জানেন ?

দুই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আকাশে মুখ তুললেন তিনি। পূর্বে সূর্যোদয় হচ্ছিলো, পশ্চিমে সাতটা রং খেলা করছিলো, তার প্রতিভাস নিয়ে একটা নিমেষ মধ্যে যা দেখবার তা তিনি দেখলেন, যা উপলব্ধি করবার তা তিনি করলেন। তখন তিনি শীত রহিত হলেন গ্রীষ্ম রহিত হলেন দুঃখ রহিত হলেন। দেহমন পুলকে আপ্লুত হলো স্নিগ্ধ বায়ুর মতো একটা শান্তির আরাম ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটলো।

না, আর তিনি ফেরবার কথা ভাবতে পারেননি। এক অপার্থিব আকর্ষণ তাঁকে রজ্জুবদ্ধ করে রেখে দিল। শুধু সেই অপার রহস্যময় পরম ধামের পরম পুরুষের চিন্তা ছাড়া আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব রইলো না জীবনে।

সত্যি কী করে তারপর ষোলোটা বছর কেটে গেল কে জানে। এই আশ্রম তিনি চাননি, এই শিষ্য ভক্ত তিনি চাননি, ঝরনার জল, গাছের ফল আর গুহার অভ্যন্তর ছাড়া জগতে আর কিছুরই কোনো প্রয়োজন ছিলো না তাঁর। তবু যেন কেমন করে এই সন্তানসন্ততিরা পিতা বলে আসন দিলেন তাঁকে, কখন যেন বিশ্বভ্রাতৃত্বে জড়িয়ে পড়লেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না কেমন করে কী হয়ে গেল।

আর তারপর এই ? কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য। কেউ ঋণী হয়ে এই পথে গমনাগমন করতে পারে না, সেই পাপ স্খালনের দরকার ছিলো। কিন্তু কী করে আমি সব ভুলে ছিলাম সেও তো কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এই ভুলিয়েই বা কে রাখে মনেই বা কে পড়িয়ে দেয়। তুমি। সব তুমি। সব তুমিময়। সর্বত্র তুমিময়—

'জল।'

জ্ঞান ফিরলো মহিলার। প্রায়ান্ধকার কুটিরের চারপাশে তিনি তাকালেন। আনন্দযোগী সযত্নে কমণ্ডলু থেকে জল মুখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো আছেন ?'

মহিলার দৃষ্টি তাঁর মুখে নিবদ্ধ হলো। চোখ ফেরালেন না। অনেক পরে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আমি কোথায় ?'

'এটা একটা আশ্রম।'

'আপনার আশ্রম।'

'আমাদের আশ্রম।'

'ও।'

'মাথার কোনো যন্ত্রণা নেই তো ?'

'আপনিই কি আমাকে বাঁচিয়েছেন ?'

'আমি নিমিত্তমাত্র, যা করবার তিনিই করেন।'

'ও।'

'আপনার সঙ্গে কেউ ছিলো না ?'

'না।'

'এই দুর্গম পথে একা আসা উচিত হয়নি।' তিনি গাত্রোত্থান করলেন। বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ওরা থাকবে, আপনি শান্ত হয়ে ঘুমোন, কোনো ভয় নেই।'

'না, ভয় কী ?' মহিলা চোখ বুজলেন।

মাথার ঘা শুকোতে সময় লাগলো কয়েকদিন। কয়েকদিন থাকতে হলো আশ্রমে। এর মধ্যে আর এদের আশ্রম পিতাকে দেখতে পেলেন না তিনি। শুনতে পেলেন আর ছয় মাসের মধ্যেও তাঁকে দেখা যাবে না। আপন গুহা থেকে বেরিয়ে নেমে আসবেন না।

'কেন ?'

'এই নিয়ম। এই নিয়মের আবর্তেই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা চলাফেরা সব আবর্তিত।'

'ছ মাস বাদে আবার দেখা হবে ?'

'দেখা হবে না, দর্শন করবো। আবির্ভূত হবেন।'

'এই গুরুকে আপনারা কোথায় পেলেন ?'

'পুষ্প যেরকম সৌরভ লুকোতে পারে না, পুণ্যবানেরাও তেমনি প্রকাশিত হন। আমরা তাঁকে আবিষ্কার করেছি, আমরা একে অন্যের দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পায়ে হেঁটে উঠে এসেছি এখানে, নিজেদের কুটির নিজেরা বানিয়ে বাস করছি। তিনি ছ মাসে একদিন দেখা দেন। আমরা ধন্য হই। আপনি যেদিন অকস্মাৎ দুর্ঘটনায় পতিত হলেন, সেদিনই তিনি ছ মাস পূর্ণ করে নীচে নেমেছিলেন।'

'আপনারা উপরে তাঁর বাসস্থানে যান না ?'

'না। উনি অরণ্যপথে কিভাবে আসেন, কিভাবে উঠে যান আমরা তা জানি না। সে পথ অতি সঙ্কুল।'

'শুধু তিনিই চলতে পারেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পিতার নিবাস স্বর্গধামের নীচে দেবস্থানে আমরা যাবার রাস্তা সুগম করে নিয়েছি। অতি প্রয়োজন হলে সেখানে উঠি। ডাক-বাক্স আছে, যা জানাবার জানিয়ে রেখে আসি। উঁচু গাছের মাথায় চিহ্ন রাখি, উনি এসে খবর নিয়ে যান।'

'আমার একটা নিবেদন কি আপনারা এভাবে পৌঁছে দিতে পারবেন ?'

'কেন পারবো না।'

একটা চিরকুট লিখে দিলেন তিনি। সংবাদ বিশেষ কিছুই নয়, কাল সকালেই আশ্রম ছাড়তে চান, যাবার আগে অনেক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

'মাতাজি, তুমি কালই যাবে ?' একটি মুণ্ডিতমস্তক ছাত্র করুণ চোখে তাকালেন।

ক'দিন আছেন। এঁদের সেবা যত্নের কোনো তুলনা নেই। বয়স অনুপাতে অনেকের সঙ্গেই স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ইত্যাদির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর চোখেও কারুণ্য ঘনালো।

কিন্তু যেতে তো হবেই ? এতোক্ষণে সঙ্গীরা কোথায় কী তোলপাড় করছে কে জানে। একটি সংস্থার তিনি ডিরেক্টর, বেশ কিছুকাল ভারতবর্ষের বাইরেও নানাকাজে ঘুরেছেন, বর্তমানে কায়েমী ভাবেই দিল্লীনিবাসী—। ট্যুরে বেরিয়েছিলেন। রুড়কি, হরিদ্বার এবং হৃষীকেশ এই তাঁর গন্তব্য। তার মধ্যে কী কাণ্ড।

সঙ্গে সহকর্মী এবং বন্ধু সুরিন্দর সিংও আছেন। সুরিন্দর সিং তাঁর পাণিপ্রার্থী। লোকটি খুব উঁচুদরের বা সংস্কৃত না হলেও সহৃদয়। বয়স হয়েছে, বিপত্নীক, দেখতে সুন্দর। নানা কথা ভেবে তিনিও এই প্রস্তাবটা উপেক্ষা করেননি। বয়েস তো তাঁরও কম হলো না, আর ভালো লাগে না একক জীবন। মরলে কাঁদবার জন্যও তো একটা লোক দরকার। মৃত্যুর আগেও সঙ্গীর প্রয়োজন থাকে। অসুখ বিসুখ হলে আগের মতো অগ্রাহ্য করতে পারেন না, আপন বলতে কেউ থাকুক, কেউ ভালোবেসে অথবা সহানুভূতির সঙ্গে কিছু করুক এটা চান।

অবশ্য সবই ছিলো। স্বেচ্ছায় হারিয়েছেন। শুধু নিজেদের ইচ্ছেয় বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলেই পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁদের। আসলে সবই অতিরিক্ত আহ্লাদের ফল। নিজের ইচ্ছে ছাড়া আর কারো ইচ্ছেকেই দাম দেবার অভ্যাস ছিলো না। তাই কি ? কে জানে। দাদু জীবিত থাকলে বোধহয় এমন সুদূরপ্রসারী ঘটনাটা ঘটতো না জীবনে। তিনি তাঁর কথা বুঝতেন।

আপন জেদে রক্তচক্ষু হয়ে বলেছিলেন, 'এ বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।' শক্ত মুখে তিনি বলেছিলেন, 'যে টাকা তুমি বিয়েতে খরচ করতে সে টাকা দিয়ে আমাকে বিলেত পাঠিয়ে দাও!'

'বিলেতে গিয়ে কী করবে ?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটবো না। পড়াশুনোয় আমি কোনোদিন তোমাদের হতাশ করিনি, তুমি কেম্ব্রিজেও পড়াতে পার, অক্সফোর্ডেও পড়াতে পার—'

'না। আমি তোমার বিয়ে দেব।' দাঁতে দাঁতে চেপে বাবার একই গোঁ।

তারপর কোথাকার জল কোথায় না গড়ালো! বাবাও জেদ ছাড়বেন না, তিনিও একবিন্দু নোওয়াবেন না। মেয়েকে বাগ মানাতে না পেরে শেষে একদিন তালা দিয়ে আটকে দিলেন ঘরের মধ্যে। বললেন, 'বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত থাক এভাবে।'

পালালেন বিয়ের দিন সকালে। আজকের কথা নয়, সদ্য এম-এ পাস করেছেন, বাইশ বছর বয়েস। এক গা গয়না আর লাল পাড় কোরা শাড়ি পরে মেথরের দরজা দিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরলেন, ট্যাক্সিতে বসে গয়নাগুলো আঁচলে বেঁধে, কোনো সহপাঠিনী বন্ধুর মেসের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন। সেই অজ্ঞাতবাসে থেকেই একটা করে প্রতিটি গয়নার বিক্রয় মূল্য তাঁকে যথেষ্ট সঙ্গতি দিল, তারপর এর ওর সাহায্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করে একদিন জাহাজে উঠলেন। জাহাজে উঠেই লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিলো, ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলো মা ও বাবার কোলে, বিয়ে করবেন না এই অহেতুক জেদের জন্য মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছিলো দেয়ালে। তখন আর উপায় ছিলো না।

তারপর থেকে ভাসতে ভাসতে এইখানে এসে পৌঁছুলেন। এই বয়সে যে বয়সে সুরিন্দর প্রস্তাবটা যথেষ্ট সংগত বলে বোধ হচ্ছে। যে বয়সে আর পরিজন ছাড়া থাকা যাচ্ছে না।

'সেক্রেটারি রাজনও এসেছে সঙ্গে, দুজন আর্দালি এসেছে। ওরা আপিসের গাড়িতেই এসেছে, তিনি আলাদা তাঁর নিজের গাড়িতে। তিনি আর সুরিন্দর সিং। এই অঞ্চলটা এঁর আগে দেখেননি, স্বাধীনভাবে ঘুরেফিরে দেখবেন বলেই এই ব্যবস্থা। চালান নিজেই

পাশে অবশ্য সব সময়েই কোনো না কোনো ভক্ত প্রেমিক বসে থাকেন। বর্তমানে সুরিন্দর সিংই অবিরত সঙ্গী।

চরিত্র নিয়ে দুর্নাম আছে তাঁর, হয়তো খুব অকারণও নয়, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

একটা সারপ্রাইজ দেবেন বলেই একেবারে কাকভোরে একা একা বেরিয়েছিলেন। যেতে যেতে প্রায় নেশাচ্ছন্নের মতো দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত উঠে গেলেন। হৃষীকেশে এসে থেকেই তিনি এক-অলৌকিক নেশায় উজ্জীবিত হয়েছেন। তাঁর কিছুই ভালো না-লাগা জীবন যেন সহসা কী এক সম্মোহনের শিকার হয়েছে। আসলে হৃষীকেশ নামটাই সম্মোহক। দেবপ্রয়াগে গিয়ে ভগীরথ আর মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখে ফিরতে কতো কথাই যে মনে হচ্ছিলো। একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বোধ হয়, কী করে গাড়িটা পাহাড়ে ঠোক্কর খেলো, কী করে ছিটকে পড়লেন দরজা খুলে কিছুই বুঝতে পারলেন না। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় একটা মর্মান্তিক চিৎকার বেরুলো গলা দিয়ে, তারপরেই ত্রিভুবন অন্ধকার। আর জেগে উঠেই এই আশ্রম।

কোথাও যেতে হলে তার একটা প্রস্তুতি অবশ্যই থাকে। এখান থেকে যাবার জন্য তা ছিলো না। আশ্রম পিতা সেই প্রথম দিনই উপরে উঠে যাবার আগে রোগিণীর বিষয়ে যাবতীয় আদেশ নির্দেশ এঁদের দিয়ে গেছেন। তার এক নম্বর এই যে, যখন যে মুহূর্তে তিনি যে ইচ্ছে প্রকাশ করবেন, তা যেন তাঁরা লঙ্ঘন না করেন। দুই নম্বর গাড়ি যেন হৃষীকেশ থেকে সারিয়ে এনে প্রস্তুত রাখা হয়। তিন নম্বর যদি কারো কাছে কোনো খবর দেবার প্রয়োজন মনে করেন তিনি তৎক্ষণাৎ যেন তা পালন করা হয়। চার নম্বর যেদিন যাবার উপযুক্ত হবেন এবং যেতে চাইবেন, কেউ যেন সঙ্গী হয়ে লোকালয় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

এঁদের গুরুর কাছে সত্যিই তিনি কৃতজ্ঞ। এঁদের কাছেও অনেক জমা হলো। আর কখনো এঁদের সম্মুখীন হবার কোনো কারণ ঘটবে কি ঘটবে না কে জানে। নারীবর্জিত এই স্থানে আসার কোনো অকারণ অধিকার নিশ্চয়ই তার নেই। শুধু বিপন্ন হয়েছিলেন বলেই এই দয়া। কিন্তু বিপন্ন তো কেউ ইচ্ছে করে হতে পারে না, রোজ রোজও হওয়া যায় না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই সবই ভাবছিলেন। আশ্রম নিস্তব্ধ হলো। অল্প অল্প আলো ফুটেছে আকাশে, বোধহয় চাঁদ উঠবে এবার। হিমালয়ের জলস্থল অন্তরীক্ষ ব্যাপী বৃহৎ ভয়ঙ্কর রূপ আরো ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। এই সময়ে একটি ছায়া দীর্ঘ হলো। চমকে উঠেছিলেন। তারপরেই আশ্চর্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি!'

'আমি এইমাত্রই বৃক্ষচূড়ায় সাংকতিক চিহ্ন দেখে আপনার চলে যাবার সংবাদটি জানতে পারলাম।' মহাঋষি আনন্দযোগী, এগিয়ে এলেন কুটিরের দিকে।

মহিলাটি ক্ষিপ্রকম্পিত হাতে ঘরের মধ্যস্থলে একটি কম্বলাসন বিছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এ আমার স্বগৃহ নয়, কী দিয়ে অভ্যর্থনা করি।'

'আপনার দেহ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে তো?' গুহা ভিন্ন কোনো কুটিরের অভ্যন্তরে এই দ্বিতীয়বার তিনি প্রবেশ করলেন। প্রথমবারও এই মহিলাটির জন্যই প্রবেশ করতে হয়েছিলো। দশ দিন হয়ে গেল। এই দশ দিনে তিনি অনেকবার এঁর কথা ভেবেছেন, বিস্মৃতি থেকে নামটিও উদ্ধার করেছেন, মহাশ্বেতা মৈত্র।

মহাশ্বেতা বললেন, 'এই একরকম।'

'কাল প্রত্যূষেই চলে যাবেন ?'

'আজ্ঞে সেরকমই ভেবেছি।'

'যদি এমন হয়, আরো দু'চারদিন থেকে শরীরটা আরো একটু সুস্থ করে যেতে চান, তা হলে—

'না না, একজন সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য আপনারা যা করেছেন, সেই ঋণই আমি আমৃত্যু বহন করবো।'

'ঋণ বলছেন কেন ?'

'অবশ্যই ঋণ।'

চুপ করে থাকলেন আনন্দযোগী। বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতেই নিচে নেমে এসেছি।'

'আমার অশেষ সৌভাগ্য। কিন্তু কেন এলেন ? শুনেছি যে পথে নামেন সে পথ অতি সঙ্কুল, অন্য কেউ সেখানে চলাচল করতে পারে না—'

'না নেমে উপায় ছিলো না, আমি উদভ্রান্ত বোধ করছিলাম।'

'তার হেতু কি আমি ?'

'অনৃভাষণে অভ্যস্ত নই, আপনার অনুমান সত্য।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অত্যন্ত লজ্জিত।'

'আপনার দিক থেকে লজ্জা দুঃখ ঋণ বা কৃতজ্ঞতা কোনো শব্দেরই কোনো প্রয়োজন নেই। সেই শব্দগুলো সবই আমার প্রতি প্রযোজ্য।'

'ছি ছি, কী বলছেন।'

'আমি যে পথে যে লোকে এসে পৌঁছেছি, আমার মতো পাপীর পক্ষে সে স্থান কোনো প্রকারেই যথাযোগ্য নয়।'

'আপনি পাপী ?'

'আমি অপবিত্র।'

'আপনি অপবিত্র।'

'সংসারে আমি অনেক ঋণ রেখে এসেছিলাম।'

'আপনি আমার প্রাণদাতা বিধাতা। পারমার্থিক কোনো বিষয়ে কাজে না লাগলেও যদি আর্থিক কোনো ঋণের প্রশ্ন থাকে, আমি সেটা সংশোধন করে আপনার আশ্রমের কাছে আমার নিজের ঋণের বোঝা কিঞ্চিৎ লাঘব করতে চেষ্টা করি।'

'ষোলো বছর আগে আমি আপনাকে যে কথা দিয়ে এসেছিলাম, তা রক্ষা করিনি, সেটাই আমার ঋণ।'

'ষোলো বছর আগে ? আমাকে ? আপনি কি আমাকে চিনতেন ?'

'সেই ঋণ আমি ছাড়া আর কেউ কি পরিশোধ করতে পারে ?'

'প্রভু, আমি তো আপনাকে স্মরণ করতে পারছি না।'

'ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে তো আর আমার অপরাধ স্খালন হচ্ছে না ? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

'আমি অতি পাপিষ্ঠা, তা নইলে আপনার এমন মতিভ্রম কেন হবে যে আমার মতো একজন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের কাছে আপনি মার্জনাপ্রার্থী হবেন।'

'ভ্রষ্টা !'

'নিজেকে নিয়ে আমি অনেক ছিনিমিনি খেলেছি।'

'আহা!' শিশু ব্যথা পেলে মাতা যেভাবে তাকিয়ে থাকেন সেই দৃষ্টিতে তিনি মহাশ্বেতাকে অবলোকন করলেন। চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কিরণে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত জগৎ, উচ্চতম পর্বত থেকে গঙ্গার নেমে আসার প্রচণ্ড ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মহাশ্বেতার বুক থেকে একটি গভীর নিঃশ্বাস নির্গত হলো। চোখ মাটিতে নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'এর পরেও কি আমার কাছে কোনো ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে আপনার?'

আনন্দযোগী ধ্যানের ভঙ্গিতে টান হয়ে বসলেন, গভীর সুরে বললেন, 'হয়তো তার জন্য আমিই দায়ী। সেটাও একটা ঋণ।'

'আপনার মহানুভবতা আপনারই যোগ্য।'

'আপনার স্বামী কোথায়?'

'আমার স্বামী?' মহাশ্বেতা হাসলেন, 'স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও আছেন বলে তো আমার জানা নেই।'

'আপনি আর তারপর বিবাহ করেননি?'

'এই গভীর রাত্রে একজন অসহায় রমণীর কাছে এসে এসব প্রশ্ন কি আপনাকে মানায়?'

ঘরের মধ্যে বজ্রপতন হলো, 'মহাশ্বেতা, আমি তোমার সঙ্গে গৃহে ফিরতে চাই।'

'আমার সঙ্গে। তুমি গৃহে ফিরতে চাও!' ঠাট্টা অভিমান ভুলে মহাশ্বেতা আপাদমস্তক কেঁপে উঠলেন, তাঁর কান্না এসে গেল।

'তুমি অবিবাহিত বা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকলেই সেটা সম্ভব।'

'না না—'

'কেন নয়?'

'আমার দীক্ষা দাও, আমাকে তোমার শিষ্যা করো। একজনের প্রত্যাখ্যান ভুলতে অন্যদের উপর যে অবিচার করেছি শাস্তি দাও তার জন্য—'

'আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিনি, আমি ব্রহ্মানন্দে অবগাহন করে তোমাকে ভুলে ছিলাম।'

'যিনি ব্রহ্মানন্দে ডুবে সব ভুলতে পেরেছেন, তাঁকে আমি প্রণাম করি। তাঁকে নামাবো এমন পাপ করার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।'

'এই দশদিন আমি শুধু তোমাকেই ভেবেছি। তোমাকেই ভেবেছি।'

'আমাকে! তাঁকে নয়?'

'তাঁকে! তাঁর সঙ্গে তোমার তো কোনো বিরোধ নেই।'

'আছে। সহস্রবার আছে। তুমি সর্বত্যাগী ঋষি আমি তোমার কাছে সংসারের একটা কীট মাত্র। হা ঈশ্বর! এ জন্যই শাস্ত্রে বলে নারী নরকের দ্বার।'

নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি।

আনন্দযোগী ভারী গলায় বললেন, 'এই অসম্মানজনক অশালীন এবং বেদনাদায়ক উক্তি যিনি করেছিলেন, তিনি নমস্য হলেও দূষ্য। যাঁর অভ্যন্তরে দেহ গঠিত হয়েছে, যিনি জন্ম দিয়েছেন, যাঁর বক্ষসুধা পান করে লালিত পালিত হয়ে শিশু মনুষ্যপদবাচ্য হয়েছে তাঁর তুল্য গুরু কে আছে এই ভবসংসারে? শুধুই কি জন্ম? অন্তিম বিশ্রামও আমাদের মায়ের কোলে। মৃত্যুও আমাদের মা।'

'তবে কেন মাঝখানে এমন বিভ্রাট করি আমরা ?'

'যারা বিভ্রান্ত হয় তাদের তোমরা দয়া করো, কৃপা করো, ক্ষমা করো। সেই অপরাধ নিজেদের উপর আরোপ করে ছোটো হয়ো না। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।'

'কিন্তু—কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়, আমি তোমার সঙ্গে গৃহবাসী হবো, আমার ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন।'

'আমার কাছে তোমার কোনো ঋণ নেই। আমি তো জানতাম, তোমাকে বেঁধে রাখবো এমন শক্তি আমার ছিলো না। তুমি অনেক অনেক বড়ো, অনেক মহৎ, তুমি আমাকে এখানেই তোমার শিষ্যার সম্মান দাও। তোমাকে সেবা করার অধিকার দাও। আমাকে সেই মন্ত্র দাও, যে মন্ত্রে আমি কোনো একদিন সমস্ত পাপ ধুয়ে নির্মল হয়ে উঠতে পারি।'

'দেহ আত্মার মন্দির, এখানে কোনো পাপ প্রবেশ করতে পারে না। তুমি নির্মল, তুমি পবিত্র, তুমিই আমার পরমপ্রাপ্তির শেষ স্তর।'

'না, না, না। আমি তোমার এই অধোগতির কারণ হতে চাই না। তুমি ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তোমার পিতা।'

'ঈশ্বর যেমন আমার পিতা, তেমনি তোমারও পিতা। আমি তাঁরই নির্দেশে নিচে নেমে এসেছি। আমার জাগতিক পিতা আমাকে বলেছিলেন স্ত্রীসংসর্গবিহীন পুরুষ অসম্পূর্ণ। আমি সে কথা এই দশদিন যাবৎ সকল চিত্ত দিয়ে অনুধাবন করেছি, বুঝেছি জাগতিক পিতাই নয়, পরম পিতাও অসম্পূর্ণ মানুষের চেয়ে তাঁর সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে দেখতেই ভালোবাসেন।

'আমি অবোধ, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমার ভয় করে।'

'তুমি আমাকে অন্তরে বাহিরে গ্রহণ করো, আমাকে মহামুক্তিতে নিয়ে যাও।'

'আনন্দ—'

'তুমি আমাকে আলিঙ্গন করো, আমি তোমাকে চুম্বন করে তৃপ্ত হই।'

—'আনন্দ—'

'তুমি উত্তীর্ণ হও। যে দিব্যবিভা একদা উদ্ভাসিত হয়ে আমাকে শান্তির পাথারে ভাসিয়ে রেখেছে আমি সেই শান্তি তোমার মধ্যে সংক্রামিত করে আমার এই ষোলো বছরের স্বার্থপরতার অন্যায় খণ্ডন করি।'

'আমি অযোগ্য আমি অক্ষম—আমাকে তুমি দয়া করো আমাকে তুমি এখানেই আশ্রয় দাও—'

'তাঁকে পাবার অক্লান্ত সুখে আমি সুখী করবো তোমাকে।'

'আমি যেন তোমার বিঘ্ন না হই।'

'তাঁরই অঙ্গ থেকে যে দেহ উদ্ভূত, সেই আত্মজাকে অবশ্যই তিনি পরিগ্রহ করবেন। চলো।'

'কোথায় ?'

'আমার গুহায়।' মহাযোগী উঠে দাঁড়ালেন। মোহাচ্ছন্নের মতো মহাশ্বেতাও উঠে দাঁড়ালেন। হাত ধরলেন তিনি, বললেন, 'ভয় করছে ?'

সহসা দুই বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে মহাশ্বেতা বললেন, 'ভয় কিসের। আমার পরমেশ্বর তো তুমি।'

মাৎসুমোতো

প্রথম দেখাতেই জাপানী মেয়ে মাৎসুমোতো আমাকে ভালোবাসলো. বাঁ হাতের কড়ে আঙুল বাড়িয়ে আমার ডান হাতের কড়ে আঙুল জড়িয়ে ভরা গলায় বললো 'বন্ধু হলাম।' তার এই আবেগের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, অপ্রত্যাশিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'এই বন্ধুতা আমি চিরদিন মনে রাখবো।' এরপরে মাৎসুমোতো আমার দুই গালে দুবার চুমু খেল। তার অসম্ভব নরম হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

দেখা হয়েছিলো এক ভোজসভায়, ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা সেই ভোজের আয়োজন করেছিলেন, বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন তারা। কিছু জাপানী ছাত্রছাত্রীও ছিলো সেখানে, এই মাৎসুমোতো তাদেরই একজন। বয়স্ক ছাত্রী, মাঝে অনেক দিন বাদ দিয়ে আবার ভর্তি হয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিনী হবার জন্য। সম্পূর্ণ জাপানীপ্রথায় আদর অভ্যর্থনা এবং খাদ্য-পানীয় শেষ হ'তে সেদিন রাত হয়েছিলো। হোটেলে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। যে-গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন ওঁরা, মাৎসুমোতোও সেই গাড়িতে ছিলো। সে সব সময় আমার হাত ধরে বসেছিলো, কিছু কৌতুক আর কিছু ভালোবাসা মেশানো দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। বিদায় নেবার সময় এতোখানি নিচু হলো, নরম হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে দিয়ে বললো, 'কাল তোমাদের কখন পাবো ?'

আমি হিসেব করে বললুম, 'সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কেবল এখানে আর ওখানে—তারপরে ছুটি। তুমি আসবে ?'

'সেইজন্যই তো জিজ্ঞেস করলুম।'

'খুব ভালো কথা। তা হলে আটটার পরে এসো।'

'আটটা পনেরোতে আসবো।'

আমাদের পৌঁছে দিতে চারজন অধ্যাপক এসেছিলেন, একে একে প্রথামতো সকলেই বিদায় নিলেন, মাৎসুমোতো গাড়িতে উঠে মুখ বাড়িয়ে ঘাড় কাত করলো।

পরের দিন কাঁটায়-কাঁটায় আটটা পনেরোতেই এলো সে। শুধু হাতে নয়, উপহার নিয়ে এসেছে। একটি অতি উৎকৃষ্ট ব্রোকেডের ব্যাগ, একগুচ্ছ চেরী, আর এক বাক্স মিষ্টি। আমি বললুম 'এসব কী ?' মাৎসুমোতো বলল, 'ভালোবাসা।'

'ভালোবাসার চেহারা যে এরকম আমি তা জানতুম না।'

'তোমাকে দেখার আগে আমিই কি জানতুম সে কথা ? আমার যে তোমার জন্য কতো কিছু আনতে ইচ্ছে করছিলো, তা তো তুমি জানো না। কিন্তু তোমাকে আমি আরো একটা জিনিস দেবো।' এই বলে কালো কুচকুচে একটি কলম আমার হাতে গুঁজে দিল। বললো, 'এটা আমার নিজের কলম'। আমার নাম খোদাই আছে এতে। আমি জানি পথের দেখা এই ক্ষণিকের বন্ধুকে যদিবা কখনো ভোলো, কলমটি দেখলেই মনে পড়ে যাবে। নামটা পড়ে নিতে পারবে। আমার ডাক নাম মাসু।'

আমি বললাম, 'মাসু তোমাকে আমি কখনো ভুলবো না, আমার এই দীর্ঘজীবনে এমন সুন্দর বন্ধুত্বতা আর কখনো আমি পাইনি, এমন পবিত্র ব্যবহার আমি কখনো দেখিনি।'

মাসু বললো, 'ভারতীয় মেয়েরা অতুলনীয়।'

আমি বললাম, 'জাপানী মেয়েরা স্বর্গীয়।'

এরপরে আমি আর মাসু রাত এগারোটা পর্যন্ত কতো কী যে গল্প করেছিলাম মনে নেই। মাসু ভাঙাভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিলো, মাঝে মাঝে আটকে গেলে ছোট্ট একটি ডিকসেনারি খুলে দেখে নিচ্ছিল বিশেষ শব্দটি। বিদায়ের সময় মাসু পরের দিন কখন দেখা হবে জিজ্ঞেস করলো।

পরের দিনও সারাদিন এখানে-ওখানে আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের পালা ছিলো। ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না। খুব বিমর্ষ হলো সে। সুদূর ভারতবর্ষের এককোণের এক বাংলাদেশের একটি নিতান্ত আটপৌরে মেয়ের জন্য তার এই কাতরতা দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম। মাত্র দশদিনের জন্য এদেশে এসেছি আমরা, আমার স্বামীকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন, আমি এসেছি সঙ্গে। চলেছি অবশ্য বহুদূরের পাল্লায়, এটি পথের নিমন্ত্রণ। বরং ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে ছেড়ে কেমন করে দিন কাটাবে তাই ভাবছিলাম, এই মমতায় আমার প্রায় চোখে জল এলো। সেই রাত্রে কিয়োটো হোটেলের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ হলাম।

বলাই বাহুল্য যে-কদিন ছিলাম, যেমন করে হোক কোনো না কোনো সময়ে আমি আর মাসু একসঙ্গে হয়েছি। কখনো কিয়োটোর মন্দিরের মতো পরিচ্ছন্ন রাস্তায় দু পাশের নুয়েপড়া চেরীগাছের ফুলেভরা ডালের তলা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে গল্প করেছি, কখনো কিয়োটো হোটেলের অগণিত, নানাবিধ চেহারার ইন্দ্রপুরীতুল্য বসবার ঘরে বসে সময় কাটিয়েছি, কখনো কোনো পুরানো জাপানী সরাইখানার অভ্যন্তরে টেম্পুরা খেতে-খেতে আড্ডা জমিয়েছি।

মাসু ধনীলোকের মেয়ে। তার বাবা কিমোনো ব্যবসায়ী। কিয়োটো এবং টোকিয়ো শহরে তাদের দুটি বিখ্যাত কিমোনোর দোকান আছে। টোকিয়োর দোকান মাসুর বাবা দেখাশোনা করেন, কিয়োটোর দোকানে বসেন মাসু আর মাসুর মা। এখানকার ছেলেমেয়েরা জাপানীর চেয়ে আমেরিকান বেশি, তার চুল ছেঁটে ফেলেছে, আঁটো ফ্রক ধরেছে, মুখে ইংরিজি বুলির খই ফুটছে। কিন্তু মাসুর পোশাক তেমনি পা ঢাকা, পিঠে ওবি বাঁধা ভারি কালো চুলের উঁচু খোঁপায় মুক্তোর লম্বা কাঁটা বসানো। গায়ের রং শাঁখের মতো সাদা, মসৃণ, মুখের লাবণ্য জোয়ারের মতো, যখন ফুলো-ফুলো চেরা চোখে তাকিয়ে হাসে, শিশুর চেয়েও পবিত্র দেখায়। মাসুর বয়স সাতাশ, কিন্তু এখনো অবিবাহিত।

আমি বললুম, 'বিয়ে করবে না?' মাসু বললো 'না।'

'কেন?'

'অনেক বাধা আছে।'

'কিসের বাধা? তুমি এতো সুন্দর, এতো ভালো, বিয়ে না করলে কতোগুলো লোক বঞ্চিত হবে। তোমার মতো স্ত্রী, তোমার মতো মা—' মাসু এইখানে থামিয়ে দিল আমাকে। চোখ নিচু করে বললো, 'অন্য কথা বলো।'

আমিও চুপ করে গেলাম, সত্যিই তো এসব ব্যক্তিগত কথায় আমার দরকার কী।

কিন্তু মাসুই একটু পরে আবার কথাটা তুললো, বললো, 'জীবনে আমি দুটি মানুষকে ভালোবেসেছি। অবিশ্যি মা বাবা বা আত্মীয়ের কথা ধরছি না এর মধ্যে। একজনকে প্রেম

দিয়েছি, একজনকে বন্ধুতা দিয়েছি।' বললাম, 'দুটোই খুব ভালো কথা। যাকে প্রেম দিয়েছ সেও নিশ্চয়ই তোমাকে প্রেম দিয়েছে আর বন্ধু তো বন্ধুতা দেবেই।'

Zen মঠের ফুলেভরা ঘাসে ছাওয়া মাঠে বসে আমরা কথা বলছিলাম, মাসু একগোছা দূর্বা হাতে তুলে নিল, ঘ্রাণ শুঁকলো, চুপ করে থেকে সজল চোখে তাকিয়ে বললো, 'কিন্তু দুটোই আমার ব্যর্থ হয়েছে!'

'ব্যর্থ হয়েছে? কেন?'

'যাকে প্রেম দিয়েছি,' সে প্রেম দিয়েছে অন্যকে, যাকে বন্ধুতা দিয়েছি, সে প্রেম দিয়েছে আমাকে।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'তুমি বিদেশিনী, তবু আমি আজ তোমাকেই আমার মনের কথা বলবো। তুমি ভারতীয়, তুমি নিশ্চয়ই আমার দুঃখ বুঝবে। কিন্তু একটাই শুধু ভয়, তুমি লেখো।'

'সেটা কি ভয়ের?'

'ভয়ের বৈকি, যদি লিখে ফেলো।'

'ক্ষতি কী?'

'ছি, ছি, সবাই জেনে যাবে।'

'আমি বাংলা ভাষায় লিখি, তোমার কোনো ভয় করবার কারণ নেই।'

মাসু হাসলো। মাসুকে যে দেখেনি তাকে বোঝানো যাবে না সে হাসি কতো মধুর। বললো, তা লিখলেই বা কী হয়। লেখারই বিষয়। আমার জীবন বড়ো অদ্ভুত, বড়ো বেদনাময়। হাতের ঘড়ি দেখলো, 'আরো ঘণ্টা দুই আমরা একসঙ্গে আছি, তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলি। মনের ভার আর আমি না নামিয়ে পারছি না। বিশেষ করে আজ কয়েকদিন যাবৎ বড়ো বেশি অশান্তি যাচ্ছে। মজাটা কি জানো, ঈশ্বর সত্যি করুণাময়। আমার এই প্রচণ্ড অশান্তির সময়ে কেমন তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচতাম না।'

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, 'মাসু, তুমি সত্যি আমাকে এত বন্ধু ভাবো?' তেরচা চোখে তাকালো মাসু, 'ভাবি না! তোমাকে প্রথম দেখেই তো আমি বুঝেছিলাম, যে মনের সঙ্গে আমি মন মেলাতে পারি সে হচ্ছে এই। কিন্তু কী দুঃখ ভাবো, দুজন আমরা দুই দেশের। হয়তো জীবনে আর কোনোদিন তোমাকে আমি দেখবো না।'

'ও-কথা বোলো না। আমি তোমাকে মস্ত-মস্ত চিঠি লিখবো, তুমি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে আসবে।' মাসু তার হাতের মুঠোয় আমার হাত তুলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলো। আমিও একটু সময় চুপ ক'রে রইলাম, তারপর বললাম, 'কী বলবে বলছিলে।'

'হ্যাঁ, বলবো।' এই বলে কোনো ভূমিকা না ক'রে মাসু আমাকে যে গল্পটা বললো তা এই—

মাসুর বাবার এক বন্ধু আছেন, তিনি কিয়োটোর সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের স্বত্বাধিকারী। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তার একটি ছেলের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকেই মাসুর বিয়ের ঠিক ছিলো। ছেলেটি চমৎকার, যেমন বিদ্যাবুদ্ধি সততা, তেমনি দেখতে সুন্দর। আশৈশব এক সঙ্গে খেলাধুলা মেলামেশা করে বড়ো হ'য়ে উঠেছে দুজন, দুই পরিবার পাশাপাশি থাকতে-থাকতে আত্মীয়ের মতো হ'য়ে গেছে। বিয়ের কথাটা মাসু বা ছেলেটি অনেকদিন পর্যন্ত জানতো না, জানবার আগেই ছেলেটি একদিন তাকে প্রেম নিবেদন করলো।

ছেলেটির নাম তোসিও হায়াসি। বাড়ির পিছন দিকের বাগান ঘেরা একটি চাতালে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো তারা। সেই বছর তাদের বাগানে অজস্র ফুল ফুটেছিলো, অজস্র প্রজাপতি এসেছিলো, তোসিও সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার হৃদয় আজ এই বাগানের মতোই উদ্ভাসিত, রক্তকণিকারা এই প্রজাপতির মতোই অস্থির চঞ্চল; মাসু, আমার মাসু, তুমি আমাকে ভালোবাসো তো ?'

তোসিও মাসুর চিরদিনের বন্ধু, তোসিওকে সে কি আজ ভালোবাসে ? জ্ঞান হ'য়ে থেকেই তো সে-কথা সে জানে। তোসিওর জন্য সে কী না করতে পারে। কিন্তু তোসিওর কথা শুনে, তোসিওর গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেদিন সে অনুভব করলো ভালোবাসার অনেক ধরন আছে, সব ধরন সকলের সঙ্গে আসে না। তোসিও তার কাছে আজ যে ভালোবাসার আবেদন জানাচ্ছে সে ভালোবাসা মাসুর অন্তরে জন্ম নেয়নি। প্রথমটায় মাসু হাসবে ভেবেছিলো, পরে ওর কান্না পেলো। চুপ করে থেকে বললো, 'আমাদের দেশে ভালোবাসার বিয়ে প্রচলিত নেই, তা কি তুমি জানো না ? গুরুজনরা এই ভালোবাসার কথা জেনে ফেললে আর কি আমরা দেখা করতে পারবো ?'

তোসিও বললো, 'গুরুজনদের এখানে টেনে এনো না, এখানে তাঁদের জায়গা নেই, এখানে তুমি আর আমি। তুমি তোমার মনের কথা বলো।'

মাসু ভেবে পেলো না কী বলবে। মুখের দিকে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোসিও বললো, 'বুঝতে পেরেছি জবাব দিতে পারছো না তুমি, এবং সেটা লজ্জার জন্য নয়, আসলে নিজের মনের কথা তোমার জানা নেই বলে। ঠিক আছে, আমি আবার কাল দেখা করবো তোমার সঙ্গে। এবার যাবার আগে তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শুনে যাবো আমি।'

তোসিও পড়াশুনো করতো নিউইয়র্কে। বড়লোকের ছেলেরা তাই করে এখানে। সেটা তাদের আভিজাত্যের লক্ষণ, তাদের ফ্যাশান। ছুটিতে-ছুটিতে আসে। এই দ্বিতীয় ছুটিতে এসেছে সে, দূরে গিয়েই হৃদয়ের এই ভাবটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে যেবার প্রথম গিয়েছিলো, কেঁদে ভাসিয়েছিলো মাসু, মাসুর সব খালি হ'য়ে গিয়েছিলো। তোসিও যে তার আবাল্য বন্ধু। তোসিওকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন ক'রে ! আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। অন্য বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে সেই অভাববোধ কেটে গিয়েছিলো। কিন্তু তোসিওর যায়নি, কী করে যাবে। মাসুর মতো বন্ধু তো সে একজনের বেশি দু'জনকে পেতে পারে না। দু'জনকে চাইতে পারে না, সে-ভাব তার আর কারো সঙ্গে আসবেই না হৃদয়ে। মাসুর জায়গা শুধু মাসুর জন্যই, তার প্রাণমন মাসুতেই ভরা।

সেই রাত্রে মাসু ঘুমুতে পারলো না। সারারাত এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটিয়ে দিল। পরের দিন যখন দেখা হবার সময় হলো ভয় করতে লাগলো তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নিয়েই চিরদিন যার সঙ্গে দেখা করতে অভ্যস্ত সে মানুষ সেদিন তার ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠলো বলে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগলো। একটা দুর্বোধ্য কষ্টে অশান্ত হয়ে পড়লো। ভেবে চিন্তে একটা চিঠি লিখলো সে, লিখলো 'তুমি আমার কাছে যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছো সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ হচ্ছে না। এর একটা পরিণতি আছে, সে পরিণতিটা আমি কিছুতেই মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পেরে কেবলি বিধ্বস্ত হচ্ছি। আমাকে সময় দাও।'

চিঠিটা সে দেখা ক'রে তোসিওর হাতে দিল। এক পলকে প'ড়ে ফেলে তোসিও খানিকক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো, তারপর একটি কথা না ব'লে চলে গেল। মাসু পিছনে-পিছনে গিয়ে বললো, 'রাগ করলে।'

তোসিও বললো, 'না।'

'কাল আসবে তো ?'

'না।'

'কেন ?'

'কাল চ'লে যাবো।'

'কোথায় ?'

'যেখানে থাকি।'

'তোমার তো এখন ছুটি।

'এখানে থাকার আর আমার কোনো অর্থ হয় না।'

মাসু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, 'এতোদিনের এতো ভালোবাসা কি ঐ একটা কথার উপরই নির্ভর করেছিলো ?'

তোসিও বললো, 'এতোদিন করছিলো না, এখন করছে।' এই বলে দ্রুত পায়ে ঘাস মাড়িয়ে একবারও ফিরে না তাকিয়ে নিজেদের আপেল বাগিচার মধ্যে ঢুকে গেল। পাশাপাশি কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে মাসু তাকিয়ে রইলো। পরের দিন শোনা গেল বাবা মা কারো কথা না শুনে তোসিও নিউইয়র্কে চলে গেছে।

মাসুর বয়স তখন একুশ, মন্দ বয়স নয়, মাসুর মা বাবা এবার তার বিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। আর এই প্রথম মাসু জানলো তোসিওর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তার। সে যে কী বলবে, কী করবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

যা সহজ, যা সুন্দর, যা উৎকৃষ্ট, সবই মাসুর কাছে উপস্থিত করেছিলেন বিধাতা, মাসুর বিড়ম্বিত ভাগ্য তা গ্রহণ করতে পারলো না। তোসিও তার স্বামী হবে, সন্তানের পিতা হবে তা এ কথাটা ভাবতেই দাঁতে কাঁকর পড়লো তার। তবু বিয়ের আয়োজনে বাধা হ'লো না। মেয়ের মতামতের কথা কোনো বাপ-মা ভাবে না, এ দেশে. মাসুর বাপ-মাও ভাবলেন না, টেলিগ্রাম পেয়ে তোসিও চ'লে এলো। এসে সব শুনে গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'মাসু কি রাজি হয়েছে ?'

তোসিওর বাবা মিস্টার হায়াসি আর মা মিসেস হায়াসি ছেলের কথা শুনে থ হ'তে হ'তেও হলেন না। তাদের ছেলে আমেরিকা প্রবাসী তার মতামত অন্যরকম তো হবেই। তারা ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমার মতো সচ্চরিত্র, বিদ্বান এবং সুপুরুষ স্বামীর জন্য একজন মেয়ের যতো প্রার্থনা দরকার, মাসু ঠিক ততো প্রার্থনা করছিলো কি না জানি না, তবে পেয়ে যে সে বর্তে যাবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং তার মতামত নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

এ-কথায় তোসিও শান্ত হ'লো না, বললো, 'আমি নিজে একবার ওর সঙ্গে কথা বলবো !'

মিস্টার হায়াসি এবার দৃঢ় হ'য়ে বললেন, 'একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে নাকি ?'

তোসিও বললো, 'জানি না। তবে বিয়ের আগে একবার ওর সঙ্গে আমি দেখা করবোই।'

'সেটা নিয়ম নয়।'

'যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলা ক'রে বড়ো হ'য়ে উঠেছি, তার সঙ্গে দেখা করার মধ্যে কী এত নিয়মের প্রশ্ন থাকতে পারে।'

'সে এখন তোমার বন্ধু নয়, বাল্যসঙ্গী নয়, ভাবী স্ত্রী। বিয়ের আর দশদিন বাকি, এই দশদিন তোমাদের দেখাশুনো বন্ধ।'

মা-বাবার মুখের উপর কথা বলা অভ্যেস নেই তোসিওর, চুপ করে মাথা নামিয়ে উঠে গেল। কিন্তু সময় সুযোগ বুঝে বাইরে থেকে মাসুর কলেজে ফোন করলো। হঠাৎ তোসিওর গলা পেয়ে এতো ভালো লাগলো বিয়ে-টিয়ে সব ভুলে ঠিক আগের মতো সরল আবেগে মাসু তাকে সম্ভাষণ করলো। তার উপরই রাগ ক'রে তিন মাস আগে চ'লে গিয়েছিলো তোসিও, তিন মাস ধরে প্রতিদিন একবার-না-একবার তার কথা মাসুর মনে হ'য়েছে, তার হাসি মনে পড়েছে,তার কথা বলার ভঙ্গি মনে পড়েছে, তার দুষ্টুমি ক'রে খেপানোর কথা মনে পড়েছে, তার সঙ্গটা যে কত মধুর ছিলো সে কথা মনে ক'রে মাসুর বিস্বাদ লেগেছে জগৎটা। তোসিওর মতো একজন বন্ধু সংসারে বিরল। সেই বন্ধুকে হারাবার ব্যথায় সে অতিশয় কাতর হ'য়েছিলো।

তোসিও বলল, 'কেমন আছো ?'

মাসু ব্যাকুল গলায় বললো, 'তুমি কেমন আছো ?'

ও-পিঠ থেকে একটু হাসলো তোসিও। 'এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তরী বোধহয় কূলে ভিড়লো। মাসু মাঝনদীতে বড়ো তুফান, ভেবেছিলাম তলিয়ে যাবে। তা হলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি ? কিসের ! ও—' এবার বুঝতে পেরে গম্ভীর হ'লো মাসু। বুকের ভিতরটা গুড়গুড় ক'রে উঠলো। তোসিওর ভালবাসার স্রোত যেদিকে প্রবহমান, সেই স্রোতে মাসুর বন্ধুতা ভাসতে চায় না। তোসিও তার অবচেতন মনে বোধহয় স্নেহময় ভাইয়ের আসন পেতে বসেছিলো তা নৈলে মাসুর মন এমন হবে কেন ? কান্না পেয়ে গেল মাসুর ?'

তোসিও বললো, 'কথা বলছো না কেন ?

'কী বলবো ?'

'তুমি প্রস্তুত হয়েছো তো ?'

'কী বিষয়ে ?'

'বুঝতে পেরেও ভান করছো, আমি আমাদের বিয়ের কথাও বলছি।' সময় নিয়ে মাসু বললো, 'আমার প্রস্তুতির উপর কি কিছু নির্ভর করছে ?'

'বিয়েটা যখন তোমার—'

'কিন্তু আমি একজন মেয়ে, আমার কথার মূল্য কী ?'

অসহিষ্ণু হ'য়ে তোসিও বললো, 'বুঝেছি।'

'তোসিও।'

'আর কিছু বলবার দরকার নেই।'

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু এই অপরাধে তুমি আমাকে তোমার বন্ধুত্বতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোরো না।'

'মাসু, আমি যা পারি না তা আমি কেমন ক'রে করবো। তুমি আমাকে ম'রে যেতে বলো রাজি আছি, তুমি আমাকে একটা একটা ক'রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলতে বলো

হয়তো তাও আমি পারবো, কিন্তু হৃদয় ভরা প্রেম নিয়ে নিছক বন্ধুত্বতার ভান ক'রে আর আমি তোমার কাছে দাঁড়াতে পারবো না। আমাকে বিদায় দাও।'

অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মাসু ডাকলো, 'তোসিও।'

তোসিও ফোন ছেড়ে দিল।

আবার চলে গেলো তোসিও। হায়াসি দম্পতি ছেলের ব্যবহারে মর্মাহত হ'লেন। মাসুর মা-বাবাকে মাসু নিজের অমতের কথা জানিয়ে তোসিওর উপর তাদের আক্রোশ নিবারণ করলো। নিভৃতে তার মা তাকে বললেন, 'কেন, তোর কিসের আপত্তি।'

মাসু বললো, 'জানি না।'

মা বললেন, 'এমন স্বামী কি একজন মেয়ে ইচ্ছে করলেই পেতে পারে? তোসিওর মতো গুণবান হৃদয়বান এবং ধনবান পাত্র আর আমি কোথায় পাব?'

মাসু বললো, 'আমি কোনোদিন বিয়ে করবো না।'

সন্দেহ ক'রে মা বললেন, 'তুই কি গোপনে আর কারো সঙ্গে মিশিস?'

'না।'

'তবে কেন ওকে ফিরিয়ে দিলি?'

'আমি ভাবতে পারি না, কিছুতেই ভাবতে পারি না মা।'

'ভাববার কী আছে এর মধ্যে!'

'আছে, অনেক আছে। ও আমার স্বামী হ'লে অনেক কিছু ভাববার আছে, আমি তো জানোয়ার নই যে সব পারি। আর তোসিও তো রক্তমাংসের মানুষ। আমি পারবো না মা, পারবো না।' খোলাখুলিভাবে এই কথা বলে মার কোলে উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো মাসু। মাসুর মা মাসুর মনের এই অদ্ভুত ভাবের কোনো ব্যাখ্যা না-পেলেও দুঃখটা বুঝলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েকে শান্ত হ'তে বললেন তিনি।

দিন চলতে লাগলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। আট মাস পরে মাসুর বি. এ. পরীক্ষা হ'লো, পাস ক'রে এম. এ.-তে ভর্তি হ'লো সে। এই ছ'মাস তোসিও আর আসেনি। বি. এ. পাসের খবর আসার সাতদিন আগে মাসুর জন্মদিন ছিলো, মূল্যবান উপহার এলো একটি নিউইয়র্ক থেকে, প্রেরকের নাম না থাকিলেও কে পাঠিয়েছে বুঝতে দেরি হ'লো না। আবার সাতদিন পরে পাস করা উপলক্ষে আর একটি উপহার এলো।

তার এক বছর পরে তোসিও দেশে এলো মায়ের অসুখের খবর পেয়ে; কিন্তু সবাই বললো তোসিওকে দেখে বোঝা যায় না তার মায়ের অসুখ না তার নিজের অসুখ। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলের কী হাল হয়েছে। মিঃ হায়াসি ছেলেকে দেখে রাগ ভুলে বিমর্ষ হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কোনো অসুখ করেছে?'

তোসিও মৃদু হেসে জবাব দিল, 'না তো।'

'তবে এ রকম চেহারা হ'য়েছে কেন?'

'কী রকম?'

'তোমাকে আমি ডাক্তার দেখাবো।'

'তুমি বৃথা চিন্তা করছো।'

'তোমাকে আমি আর ফিরে যেতে দেবো না।'

'আমার থিসিস কমপ্লিট করতে আরো এক বছর বাকি।'

'ছেড়ে দাও।'

'তা কখনো হয় ?'

'খুব হয়। এ-বছরটা তোমার বিশ্রাম দরকার।'

চুপ ক'রে রইলো তোসিও।

মায়ের অসুখ সেরে গেলেও সত্যিই তার যাওয়া হ'লো না। কেবলমাত্র পিতার আদেশের জন্যই নয়। একরাত্রে প্রবল জ্বর এলো তার। মাথার একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় সে মুহ্যমান হ'লো। আর সেই দুর্বল অবস্থায় তার মনের জোর রইলো না, অর্ধজাগ্রত বোধ নিয়ে সে মাসুকে খুঁজতে লাগলো। মিসেস হায়াসি নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে।

প্রাণমন ঢেলে সেবা করলো মাসু, শুধু তাই নয় তোসিওর স্ত্রী হবার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করলো সে। মনকে বোঝালো, যে তোমার জন্য ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তোমার কিছু ঋণ আছে, এবং তা তোমার পরিশোধ করা দরকার। আর যার জন্য তোমার মনে এতো শ্রদ্ধা ভালোবাসা তাকে গ্রহণ করতে এই দ্বিধা তোমার মনের একটা ব্যাধিমাত্র।

তোসিও সাতমাস পরে সুস্থ হ'য়ে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আবার চ'লে গেল নিউইয়র্ক। কথা রইলো মাসু এম. এ. পাস করলে, তার নিজের থিসিস শেষ হলে তারপর তারা বিয়ে করবে। এটা তাদের নিজেদের মধ্যে শর্ত হলো, বাপ মায়েরা কিছু জানলেন না।

কাটলো কিছুদিন। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরে মাসু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলো সেই সময়ে। মনে মনে ভেবেছিলো, বিয়ে করলেই প্রেম হ'লেই এক শারীরিক শুচিতা কেটে গিয়ে শান্তি পাবে সে। কিন্তু প্রেমে পড়া যে সত্যি কী ভীষণ, এবং তার মধ্যে শরীরের প্রাধান্য যে কতোখানি, সেটা সে প্রথম উপলব্ধি করলো এক জার্মান ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে। ভদ্রলোক জরুরি সরকারি কাজে কিছুকালের জন্য জাপানে এসেছিলেন, আর জাপানে এলে জাপানী কিমোনো কেনে না এমন বিদেশী কেউ নেই। এক ছুটির দুপুরে, যখন একখানা বই হাতে নিয়ে সে তাদের বিশাল দোকানের একটি নির্জন কোণে উপন্যাসের সবচেয়ে জোরালো জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি এসে দাঁড়ালেন। ক্যাশিয়ার ছুটি নিয়েছে, টাকাটা মাসুকেই নিতে হবে। ভদ্রলোক গমগমে একটু অভিযোগ করলেন দোকানের লোকেরা তাঁর দিকে ভালো ক'রে মনোযোগ দিচ্ছে না বলে। বই-টই রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো মাসু, নিজের অন্যমনস্কতার জন্য লজ্জিত হ'লো, মাথা নিচু করে অনেকবার ক্ষমা চাইলো কিমোনোর দাম নিয়ে পঞ্চাশবার "আরিগাতো, আরিগাতো", বলতে লাগলো। আরিগাতো মানে ধন্যবাদ। সব কথাতেই তাদের ধন্যবাদ বলা অভ্যেস। সেদিন তার মাত্রা ছাড়ালো। যাবার সময় ভদ্রলোক খুশি মনে বিদায় নিলেন। তিনদিন পরে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কলেজের পথে আবার দেখা হয়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে তিনি দৃশ্য তুলে বেড়াচ্ছেন। মাসুকে দেখেই এগিয়ে এসে হাত ঝাঁকিয়ে সম্ভাষণ করলেন। মাসু অনুভব করলো ভদ্রলোকটি যেন একটু বেশি সময় নিলেন হাত ঝাঁকাতে আর সেই সময়টুকু মাসুর বুকের তলায় ছোট্ট একটু কম্পন তুললো। মাসু বললো, 'ভালো ?' ভদ্রলোক বললেন, 'খুব ভালো। আরো ভালো এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।' মাসু আবার 'আরিগাতো'

বললো, খানিকটা পথ এক সঙ্গে হাঁটলো তারা, ভদ্রলোক জাপানী মেয়ের নমুনা হিসেবে মাসুর একটি ছবি তুলতে অনুমতি চাইলেন। মাসু গররাজি হবার কোনো কারণ দেখলো না।

এই সূত্রটি ধ'রেই আনাগোনা আরম্ভ হ'লো। ছবি দিতে আসা, ছবি তুলতে দেওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একজন নিয়ন্ত্রণ করা, তার আবার পাল্টা নিমন্ত্রণ—এইসব করতে করতে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হ'লো। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল তারা প্রায়ই নির্ধারিত সময়ে দেখাশুনো করছে। মাসু বুঝতে পারলো তার দুর্বলতা, তার বিবেক তাকে অনেক ধমকালো কিন্তু শোধরাতে পারলো না। এই টান বড়ো ভীষণ টান, মাসু প্রেমের শেষ সোপানে গিয়ে পৌঁছলো।

এদিকে চিঠি না-পেয়ে-পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলো তোসিও, টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম আসতে লাগলো। মাসু যেমন বিব্রত হলো, তেমনি বিরক্তও হ'লো। গুরুজনরা প্রশ্নে-প্রশ্নে অস্থির করে তুললেন। তোসিও সম্পর্কে কবে যে কেমন ক'রে একটা দায়িত্ববোধ জন্মে গেছে মাসুর, মাসু তা জানে না। বুকের একটা শিরাতে টান ধরলো। আর যাই করুক, তোসিওকে সে ঠকাতে পারে না। তোসিওকে বঞ্চনা করতে পারে না। রাত্রিগুলো তার চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলো, দিনগুলো প্রেমের স্রোতে। শেষে নিজের সঙ্গে একা হ'তেই তার ভয় আরম্ভ হ'লো। মনে হ'লো রাত্রি নামক কোনো বিশ্রামের সময় না থাকলে বুঝি বেঁচে যেতো সে।

ভদ্রলোক ছ'মাসের জন্য এসেছিলেন, লেখালেখি ক'রে আপ্রাণ চেষ্টায় কাজের মেয়াদ আরো তিনমাস বাড়িয়ে নিলেন। বছরের শেষে তোসিও দেশে ফিরলো। সে বুদ্ধিমান ছেলে, মাসুর পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু এতটা ভাবেনি। এসে স্তম্ভিত হ'লো। কিন্তু, কিছু বললো না, বলা তার স্বভাব নয়। এবার আর ফিরে গেলো না সে, চুপচাপ বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগলো। তার মা-বাবা তার বিয়ে দেবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলেন। তোসিওর মতামতের অপেক্ষা না রেখে দিগ্বিদিকে মেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিয়োটো শহরে হায়াসিরা বিখ্যাত পরিবার। তোসিও হায়াসি বিখ্যাত ছাত্র, মেয়ের বাপেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ছেঁকে ধরলো, তোসিও বললো, 'সব ফিরিয়ে দাও, মেয়ে আমি নিজে পছন্দ করেছি।' 'কাকে ? কাকে ?' হায়াসি স্বামী-স্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, তোসিও বললো, 'সময় হ'লে বলবো।'

ছেলে তাদের সব বিষয়েই ভালো, যেমন বাধ্য, তেমন নম্র, কিন্তু এই এক বিষয়ে মা-বাপকে উতলা করলো সে। উতলা অবিশ্যি নিজেই সবচেয়ে বেশি হ'লো, তার খাওয়ার ঠিক রইলো না, নাওয়ার ঠিক রইলো না, মাত্র তিন মাসের জন্য থিসিসটা কমপ্লিট করলো না, মাঝখান থেকে একটা ছোটো স্কুলে মাস্টারি নিয়ে বসলো। সারাদিন চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে, আর সময় মতো স্কুলে যায়। তোসিওকে ভালবাসতো সবাই, বন্ধুরা তাকে প্রাণতুল্য ভাবতো। মাঝে মাঝে তারা এসে জোর করে নিয়ে যেতো এখানে-ওখানে, সিনেমায় অথবা থিয়েটারে। ঐ যাওয়া পর্যন্তই, প্রাণ থাকতো না তাতে। তোসিওর মা-বাবার অশান্তির সীমা রইলো না। এবং কেউ কিছু না বললেও তাঁরা বুঝে নিলেন এর মূল কারণ মাসু। দুই পরিবারের এতোদিনের বন্ধুত্বতায় একটি অলক্ষ্য ফাটল ধরলো।

জার্মান ভদ্রলোকটির সঙ্গে মাসু যতোই প্রেমে আসক্ত হোক না কেন, তোসিওর কথা সে তা ব'লে মন থেকে উচ্ছেদ করতে পারলো না। কেন পারলো না তাও মাসু জানে

না। খবরাখবর সবই তার কানে যায়, মন খারাপ হয়, নিজেকে ফেরাতে চেষ্টা করে : লাভ হয় না। কোনো এক বিকেলে মাসু যখন কলেজ থেকে একটা পার্কের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো পড়ন্ত বেলার রোদে একটা নিচু গাছের তলায় একটি উঁচুনিচু কৃত্রিম ছোট পাহাড়ের একটি পাথরে তোসিও বসে আছে, এক ধাপ নিচে আর একটি পাথরে অন্য একটি বিদেশী মেয়ে। দৃশ্যটা বিকেলের সঙ্গে মিলিয়ে ছবির মতো। মাসু যেতে-যেতে হোঁচট খেলো, দাঁড়ালো, শেষে হন হন ক'রে চলে গেল। বাড়ি গিয়ে মনে হ'লো খিদে নেই, সন্ধ্যাবেলা বেরুতে গিয়ে মনে হ'লো শরীর খারাপ, নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো মানুষ জাতটার মতো বিশ্বাসঘাতক আর কেউ না।

তোসিওকে সে প্রায় দু'বছর পরে দেখলো, সত্যিই অনেকটা রোগা হ'য়েছে, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত, গালের দাড়িও যথোচিত পরিচ্ছন্নভাবে কামানো নয়, তবু মনে হ'লো আগের চেয়ে দেখতে যেন অনেকটা বেশি সুন্দর হ'য়েছে। আর প্রণয়িনীটিকে সামনে নিয়ে মুখের যে রকম আত্মহারা ভাব ছিলো, সে রকম ভাব মাসু অন্তত কোনোদিন দেখেনি। পুরুষ জাতকে মাসু ধিক্কার দিলো, তাদের ভালোবাসার বড়াইয়ের মুখে ছাই দিল।

শুধু মাসুই নয়, এর পরে পরিচিতদের মধ্যে আরো অনেকে তোসিওকে নানা জায়গায় ঐ মেয়েটির সঙ্গেই ঘোরাফেরা করতে দেখলো। কিছুদিনের মধ্যে একটা চাপা ফিসফাসও আরম্ভ হ'লো, শোনা গেল মেয়েটি তোসিওর স্কুলেরই একজন শিক্ষয়িত্রী। সবাই ওয়াক-থু করলো, বললো, শেষে নাকি তোসিও হায়াসি ঐ একটা কুচ্ছিত বিদেশী শিক্ষয়িত্রীর পাল্লায় প'ড়ে মাথা মুড়োলো। মনে মনে মাসুও ওয়াক থু না ক'রে পারলো না।

ততোদিনে জার্মান ভদ্রলোকটি নিজের দেশে চ'লে গিয়েছিলেন। আসলে ভদ্রলোকটি বিবাহিত, মাসুকে দেখার আগে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিলো না, আর মাসুকে দেখার পরে মাসুকে যতোটা ভালোবাসছেন স্ত্রীর প্রতি বর্তমানে তার চেয়ে অনেক কম আকর্ষণ অনুভব করলেও জীবন থেকে তাকে একেবারে বাদ দেবেন এরকম একটা কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তার উপরে দুটি বাচ্চা আছে। সুতরাং মাসুর বিষয়ে তার যতো দুর্বলতাই থাকুক আর বেশিদিন এখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। অথচ মাসুকে এভাবে রেখে নিজের দেশে ফিরে যেতে যথেষ্ট কষ্ট হলো তাঁর। মাসুর ভাষায় ভদ্রলোকটি সৎ। মাসুর সঙ্গে পরিচয়ের অনতিপরেই তিনি মাসুকে স্ত্রীর কথা জানিয়েছিলেন। তবুও মাসু ভাসিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে। জার্মান ভদ্রলোক নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন তাকে, মাসুকে হয়তো তিনি অকারণে একটা অশান্তির মধ্যে ফেললেন এই ভেবে অনুতাপ করছিলেন, মাসু জবাব দিয়েছিলো অনুতাপ করবার কোনো কারণ নেই, কেননা মাসুর জীবনে এমন একটি বাধা আছে যার জন্য সেই জার্মান ভদ্রলাকে যদি কখনো তার পাণিপ্রার্থীও হতেন, মাসু নিজেই তার প্রতিবন্ধক হ'তো। মাসু শুধু তাকেই না, আরো একজনকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসার প্রকৃতিটা যে কী তা অবিশ্যি সে জানে না। শুধু এটা জানে জীবনে তার সুখী হবার অধিকার নেই।

এরপরে সেই ভদ্রলোকের চিঠির সুর আস্তে আস্তে অন্যরকম হ'য়ে আসছিলো, তিনি তাকে সেই আর একজন ভালোবাসার পাত্রটিকে বিয়ে করে সুখী হ'তে উপদেশ দিচ্ছিলেন।

মাসুর মনে কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে শতস্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো তখনো জ্বলজ্বল করছিলো, অথচ যে মুহূর্তে তোসিওর সঙ্গে অন্য একটি মেয়েকে যুক্ত হ'তে দেখলো, সব ভুলে গেল। যেন সর্বনাশ হ'য়ে গেল তার। পরীক্ষার আর বেশি বাকি ছিলো না, কিন্তু

পরীক্ষা দিল না। অসুস্থতার ভান ক'রে পড়ে রইল বিছানায়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান সে, তার উপরে যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, যতো বিরক্তই হোন, বিশেষ কিছু বলতেও পারেন না। বাবা তো মোটামুটি টোকিয়োতেই থাকেন, তবে বেশি দেখেন না, বোঝেনও না, যতো যন্ত্রণা মা'র। এই ক'রে-ক'রে আরো ছ'মাস কেটে গেল। তারপর একদিন শোনা গেল তোসিও বিয়ে করছে।

যেদিন খবরটা কানে পৌঁছালো, কাঁদতে-কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেললো মাসু। মাসুর মা রেগে গিয়ে বললেন, 'আর যদি তুমি বাড়াবাড়ি করো, আমি কালই তোমার বাবাকে আসতে টেলিগ্রাম করবো, তিনি এসে তোমাকে টোকিয়োতে নিয়ে যাবেন। আমি কিছুতেই তোমাকে আর এখানে রাখবো না।'

মার মনে মা রাগারাগি করতে লাগলেন, মাসুর মনে কাঁদতে লাগলো। শেষে একদিন নির্জনে তোসিওকে ফোন করলো সে। 'হ্যালো।'

'আমি মাসু।' বলতে গলা কাঁপলো তার।

'মা-সু।' ওপিঠের গলাও অকম্পিত শোনা গেলো না।

মাসু বললো, 'আমার অভিনন্দন।'

তোসিও বললো, 'আরিগাতো!'

'আশা করি খুব সুখে আছো।'

'হয়তো—'

'ভাবী স্ত্রীটি নিশ্চয়ই মনোমতো হয়েছে।'

'তোমার কি আর কোনো জরুরি কথা আছে?'

'এগুলি কি যথেষ্ট জরুরি নয়?'

'না।'

'আজকাল তবে কী ধরনের কথা অথবা কার কথা তোমার বিশেষ জরুরি বলে বোধহয়।

'মাসু, নিজেকে কোনো কারণেই ছোটো কোরো না।'

'এখন তো আমাকে তোমার ছোটোই মনে হবে।'

'কিছু মনে কোরো না, আমার ঘুম পেয়েছে,আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি।'

রেগে অস্থির হয়ে মাসু নিজেই ফোন রেখে দিল।

কিন্তু সেই রাগ তাকে আরো উত্তেজিত করলো, খানিকক্ষণ বিছানায় ছটফট ক'রে আবার টেলিফোন তুললো সে।

'শোনো।'

'বলো।'

'এই তোমার মুখেই আমি অনেক বড় বড় কথা শুনেছিলাম।'

'আমাকে তুমি যতো অভদ্র ভাবো, হয়তো আমি ততোটা নই। বড়াই করা আমার স্বভাব নয়।'

'কেবল চুল-দাড়ি রেখে, ময়লা জামা কাপড় পরে, পরীক্ষা না দিয়ে বিরহের বিজ্ঞাপন আঁটো, এই তো?'

তোসিও অভদ্র নয়, সেটা তো নিশ্চয়ই। মাসুও যে অভদ্র এমন কথা মাসু কখনো ভাবেনি। কিন্তু কী যে তার মনের ভাব তোসিও সম্পর্কে তা সে এখনো এতো বছর পরেও

বুঝতে পারে না। সেই সময়ে তার যেন কোনো জ্ঞানগম্যি ছিলো না, ভদ্রতা অভদ্রতার কোনো প্রশ্নই উঠলো না মনে। তোসিও তার, একান্ত তার, সেই দাবিতে যদি কেউ প্রতিবন্ধক হয় যে কোনো উপায়ে উচ্ছেদ করতেই হবে তাকে।

কিন্তু সব বিষয়েই তোসিও সংযত শান্ত। মাসু যখন তার চোখের সামনে অন্যের সঙ্গে নির্লজ্জের মতো প্রেম করে বেড়িয়েছে কই, তখন তো তোসিও এমন করেনি। অথচ তোসিও যতো কষ্ট হয়েছে, ততো কষ্ট কি মাসুর কখনোই হতে পারে? নিজের মনের দৈন্য দেখে লজ্জিত হওয়া উচিত ছিলো মাসুর, কিন্তু হ'লো না। তোসিওর জবাব শোনবার জন্যে শক্ত হাতে ফোন ধরে রইলো।

একটু দেরি ক'রে যেন বেদনায় বিদীর্ণ হ'য়ে তোসিওর গলা ভেসে এলো, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর।'

'আর তুমি?'

'হতে পারলে ভালো হতো।'

'তোমার নিজের ধারণায় তুমি যতো বড়ো, ততো বড়ো তুমি নও।'

'আমার ক্লান্ত লাগছে, আমাকে দয়া করো একটু, ফোনটা তুমি ছেড়ে দাও।'

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে শুধু একটা কথা জানিয়ে দি, তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক দুনিয়ায় দু'টি নেই।'

ঘটাং করে ফোন রেখে বিছানায় শুয়ে চোখের তপ্ত জলে বালিশ ভেজাতে লাগলো মাসু। তেইশ বছরের মাসু তেরো বছরের বালিকার চেয়েও অবুঝ হ'য়ে গেল।

খুব আশ্চর্য, পরেরদিন ব্রেকফাস্ট ক'রে মা যখন দোকানে বসতে গেলেন, আর তাকে যখন গৃহকর্মের জন্য উঠতেই হলো, মন খারাপ করে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলো তোসিও তাদের লতাঘেরা বাঁশের গেটটি খুলে ভিতরে এলো। দেখিনি ভাব ধ'রে অন্যদিকে তাকিয়েছিলো মাসু, তোসিও বললো, 'আমাকে ডেকেছো?'

মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়েই মাসু চোখ সরিয়ে বললো, 'না।'

'তবে যে তোমার মা আমাকে আসতে বললেন।'

'ও, মা বলেছেন তাই এসেছো। নিজে থেকে আসোনি।'

হেসে ফেললো তোসিও।

মাসু বললো, 'খুব আনন্দ হয়েছে না? হাসি আর চাপতে পারছো না।'

'আনন্দই বটে। কিন্তু কী হয়েছে তোমার? শুনলাম কান্নাকাটি করছো, খাচ্ছো না, কেন? মিঃ কেলনার কি চিঠিপত্র লিখছেন না অনেকদিন?'

তোসিওর মুখে মিঃ কেলনারের নাম উচ্চারণ হ'তে শুনে চমকে উঠলো মাসু। তার মুখ লাল হয়ে উঠলো, এ রকম নামধাম সবই তোসিওর জানা আছে সে কথাটা জানতো না সে। মুখে তার কথা ফুটলো না।

তোসিও বললো, 'তোমার মার একটা ভুল ধারণা হয়েছে এসব কান্নাকাটির মধ্যে আমার হয়তো একটা পার্ট আছে, সেটা সে কতো মিথ্যে কিছুতেই বলতে পারলাম না তাঁকে সে কথা। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, কথা দিয়েছি ব'লেই এলাম। ভেবো না কোনো সুযোগ নেবার উদ্দেশ্য আছে আমার।'

মাসু একেবারে চুপ।

'কিন্তু দুঃখ বেদনা কিছু-না-কিছু সকলেরই আছে' ঈষৎ উত্তেজিত তোসিও

অন্যমনস্কভাবে একটা চন্দ্রমল্লিকার কুড়ি ছিঁড়ে ফেললো, 'যার-যারটা তার-তার কাছে সব সময়েই অন্যের চেয়ে বেশি মনে হয়, তার সবচেয়ে আজ এইটাই আমার কাছে বেশি মর্মান্তিক লাগছে যে, তোমার এই বেদনার জন্য তোমার মা শেষ পর্যন্ত আমাকে দায়ী মনে করলেন।'

মাসু পাথরের মতো স্থির।

'কিন্তু যাক সে কথা' তোসিওর দীর্ঘশ্বাসটা চাপা রইলো না। 'তুমি ভেবো না, সেই ভদ্রলোক ভালো আছেন। আমাদের স্কুলে আমার এক বিদেশিনী বন্ধু আছেন, তিনি জাতিতে আমেরিকান, জার্মান ভদ্রলোকটিকে তিনি খুব ভালো ক'রেই চেনেন। ভদ্রলোকটির স্ত্রী এঁর মামাতো বোন, ভদ্রলোকটি নিজে জার্মান হ'লেও বিয়ে করেছেন একটি আমেরিকান মেয়েকে। ভদ্রলোক যখন এখানে ব'সে তোমাকে মনে রেখে স্ত্রীকে ভুলে থেকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, তিনি তখন আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটা কী।

আমার বন্ধু শুধু লিখে দিলেন, 'ভাবনার কিছু নেই। আমার কাছে তিনি তোমার কথা শুনেছিলেন, মন খুলে শুধু এই বন্ধুটির কাছেই কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সব আমি বলে ফেলেছিলাম। হাজার হোক আমিও তো মানুষের অতিরিক্ত কিছু নই।'

মাসু দুঃখে লজ্জায় মিশে রইলো মাটিতে। তার কোনো কথা শোনার জন্য অপেক্ষা না ক'রে তোসিও বিদায় নিল।

এরপরে তোসিওর সঙ্গে আর মাসুর দেখা হয়নি। তোসিও আবার ফিরে গিয়েছিলো নিউইয়র্কে। এই চার বছরের মধ্যে আর আসেনি সে। তার বাবা-মা মধ্যে মধ্যে উড়ে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসেন। ডক্টরেট হ'য়ে সে সেখানকার কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্র পড়াচ্ছে।

গল্প শেষ করে মাসু বিশীর্ণ রেখায় হাসলো, বললো, 'সুতরাং আমার কি আর বিয়ের প্রশ্ন আছে, না বয়স আছে।'

আমি বললাম, 'দুটোই আছে।'

'কী উপায়ে ?' হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে কথায় ঠাট্টার সুর আনলো মাসু। বললাম 'সম্বন্ধ ক'রে। পাত্র হবেন তোসিও হায়াসি, কন্যা আমাদের মাৎসুমোতো।'

'তারপর।' মাসু কৌতুকে চোখ নাচালো। আমি তেমনি গম্ভীর থেকে বললাম, 'প্রস্তাবটা স্বয়ং কন্যাকেই পাঠাতে হবে পাত্রের কাছে, পাত্র গ্রহণ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে মা বাবারা বিয়ে দেবেন এবং সেই বিয়ের দিনই তারা পরস্পরকে দেখবে তার আগে নয়।'

'আর পাত্র যদি রাজি না হয় ?'

'মনে হচ্ছে, সেটা সম্ভাবনার পরপারে।'

'এতো বিশ্বাস।'

'নিজের মনকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো না।'

মাৎসুমোতো অর্থপূর্ণভাবে হেসে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'গাড়ি এসে গেছে, চলো।'

পরেরদিন সকাল দশটায় কিয়োটো শহর ছেড়েছিলাম, এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে এসে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে মাসু বললো, 'তুমিই আমার আসল বন্ধু।' এই বলে চুমু খেলো। আমি সজল চোখে প্লেনে উঠতে-উঠতে ভাবলাম আমার কথাটা কি তবে মাসুর মনে ধরেছে ? কী জানি।

মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি

একটি পার্টি দিলেন মিসেস পালিত। ছেলে লম্বা-লম্বা ডিগ্রি নিয়ে কৃতী হয়ে ফিরে এসেছে বিলেত থেকে, আসলে সেটাই ঘোষণা করা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া পাঁচটি মেয়ের তিনটিই তো এখনো অবিবাহিত। বাছা-বাছা অতিথির অভ্যর্থনায় তারও একটা সুরাহা হতে পারে। অবিশ্যি এসব তাঁর একান্তই মনের কথা। বাইরের কথা হচ্ছে তিনি এত অতিথিবৎসল যে বছরে এ রকম দুটো চারটে সম্মিলনী বা পার্টি না দিলে তাঁর ভালো লাগে না।

মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করেই পার্টিটা স্থির করেছিলেন, ছেলের কর্ণগোচর হলো অনেক পরে। একেবারে সেইদিন সকালবেলায় চায়ের টেবিলে। টোস্টে কামড় দিয়ে সে বললো, 'বাজে।'

বোনেরা বলল, 'বাজে কেন?'

'সময় নষ্ট।'

'আহা! কত কাজেই যেন ব্যস্ত সারাদিন!'

'কাজের মধ্যে তো বই মুখে নিয়ে বসে থাকা।'

'আর আমাদের পেছনে লাগা।'

নয়নেন্দু ঈষৎ সহাস্যে বোনেদের কথা শুনতে-শুনতে টোস্টটি শেষ করলো।

মিসেস পালিত উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। তিনি আজ বড় অস্থির, এদের কথায় যোগ দেবার তাঁর সময় নেই। তাঁর বাড়ির পার্টি শহরে বিখ্যাত। রুচিতে বুদ্ধিতে শালীনতায় তিনি অদ্বিতীয়ার স্থান দখল করে আছেন এ-সব ব্যাপারে। তার মর্যাদা যদি আজ পরিপূর্ণ মাত্রায় রাখতে না পারেন, তা হলে মানীর অপমান বজ্রাঘাততুল্য হবে। যেতে যেতে একটি ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করলেন ছেলের দিকে। এই ছেলের এক-একটা কথায়, এক-একটা ভঙ্গিতে তাঁর মৃত স্বামীকেই মনে পড়ে যায়। তাঁরও পছন্দ-অপছন্দ ঠিক এমনি বেযাড়া ছিলো।

মস্ত বাড়ি। একতলায় সিঁড়ির দু'ধারের ছোট-ছোট ফ্ল্যাট—তিনশো তিনশো করে ভাড়া দিয়েছেন। তাও মনে খুঁতখুঁত। তাঁর ধারণা তিনটি ঘরের জন্য তিনশো টাকা অতি অল্প। সামনের দিকে সব দোকান, পিছনের অনেকখানি ঘাসের জমিতে দুটি পাকা গ্যারেজ। একটিতে তাঁর গাড়ি, আরেকটিতে একঘর রেফিউজি। ভাড়া পঁয়তিরিশ। সুবিধেমতো সেই জমিতে আর-একটি বাড়ি তোলার ইচ্ছে আছে ছেলের বিয়ে দিয়ে। দোতলা তেতলা নিয়ে তিনি নিজে। তেতলায় অবশ্য মাত্রই দুখানা ঘর এবং সে-দুখানা সম্পূর্ণভাবেই তাঁর ছেলের দখলে। ফিরে এসে বইপত্র নিয়ে নয়নেন্দু সেই নিরিবিলিতে বাসা নিয়েছে।

ছেলের জন্য কয়েকটি পাত্রী মিসেস পালিত অনেক আগেই মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। কেবল ছেলে ঠিক কাকে গ্রহণযোগ্য মনে করবে সেটুকু জানলেই তিনি কাজে হাত দিতে পারেন। তারা তো আসবেই, তা ছাড়া আরো গুটিপাঁচেক বন্ধু বা আলাপিত পরিবারকে ডাকলেন তিনি। কলকাতার সেরা ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম তারা। চারটি যুবককেও

লিস্টের মধ্যে রাখলেন। তাদের একজন পাঞ্জাবি, অন্যজন সিন্ধি। লক্ষপতি। সব মিলিয়ে হিসেব করে দেখা গেল মোট তেত্রিশজন অতিথির কম হবে না।

টেবিল ছেড়ে উঠে এসে মিসেস পালিত বড় ড্রইংরুমের তালা খুললেন। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া প্রায় বন্ধই থাকে এ-ঘরটি। প্রশস্ত হল। পঞ্চাশজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলেও ভিড় মনে হয় না। কালো পাথরের তেলতেলে চকচকে মসৃণ মেঝে, তাকালে মুখ দেখা যায়। মাঝখানে সাদা মারবেলের কুড়িপাপড়ির একটি জলপদ্ম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে, বারান্দা পেরিয়ে মস্ত দুটি প্রবেশপথ আঙুর কাঠের কাজ-করা চারটি বিরাট পাল্লায় আবদ্ধ হয়ে আছে।

সেই পাল্লা টানতেই বার্নিশের একটা গুমোট গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। লোকজন এসে পটাপট তেরোটা জানালা খুলে দিল। আর মুহূর্তে সকালবেলার সমস্ত আকাশটা যেন লুটিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। মিসেস পালিত ঘরে ঢুকলেন। ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলেন ঠিক মাঝখানে, তারপর সাদা পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ। চারটি নাতিপুষ্ট, হলদে-কালো মেশানো মোজেইক করা থামের উপর দাঁড়-করানো এই হলটির আদ্যোপান্ত বারে-বারে তাকিয়ে দেখলেন, হঠাৎ একটি ছায়া পড়লো মুখে। মনে পড়লো বড় মেয়ের বিয়ের আগে যে পার্টি দিয়েছিলেন সেটা হয়েছিল তাঁর প্রকাণ্ড ছাদে, সবুজ গালিচা পেতে, উপরে চাঁদ রঙের সাটিনের শামিয়ানা খাটিয়ে। কিন্তু মেজ মেয়ের বিয়ের আগের পার্টিটা ঠিক এই ঘরে, এই ফার্নিচারেই হয়েছিলো। মাত্র দু'বছর আগের কথা, কারোই মনের না-থাকার বিষয় নয়। তাছাড়া সেবারও যাঁদের-যাঁদের ডেকেছিলেন, দু'একজন বাদে এবারও তো প্রায় তাঁরাই আসছেন। অবিশ্যি বাড়তিও আছেন কয়েকজন। তবু—

মিসেস পালিত দ্বিধান্বিত হ'লেন। এমন কেউ নেই যার সঙ্গে একটু পরামর্শ করেন, ছেলেটি তো বলতে গেলে দুনিয়াছাড়া, মেয়েগুলো অবিশ্যি ভালো, কিন্তু তারা এত ছেলেমানুষ যে সব কিছুতেই নাচা ছাড়া আর কোনো কিছুই তাদের দিয়ে হয় না।

লোকজন—যারা ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিলো, তারা অপেক্ষামান হ'য়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো মিসেস পালিতের মুখের দিকে তাকিয়ে—আর তাদের সেই উৎসুক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মিসেস পালিত আবার ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এলেন বাইরে, ফুলতোলা মখমলের নরম চটিতে নিঃশব্দে সিঁড়ি নামতে লাগলেন শাদা ঠাণ্ডা সিমেন্টের রেলিংয়ে হাত রেখে।

গার্ডেন পার্টি করলে কেমন হয়? নিচে ঘাসের জমির উপর দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন। সুন্দর চৌকো মাঠ। ওপাশের গ্যারেজের চারপাশটা একটু নোংরা বটে কিন্তু এরা এই গ্যারেজের রেফিউজিরা, চমৎকার রেখেছে জায়গা। মনে-মনে তাদের করুণার সঙ্গে একটু ধন্যবাদ দিলেন। দেয়াল বেয়ে কেমন সুন্দর অপরাজিতার লতা তুলেছে এই তিন মাসের বসবাসে। ঘরের দু' পাশে নানা রঙের ফুল গাছ। পিছনের সরু জমিটুকুতে লাউ কুমড়োর আর টোম্যাটোর কচি ক্ষেত।

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁধানো প্লিন্থ। গাড়ি ঢোকবার মতো বড় একটি একপাল্লার ভাঁজ-করা কব্জির দরজা, পাশে প্রায় পাখির খাঁচার মতো সরু শিকের সরু জানালা। এই একটিমাত্র ঘর। আলাদা রান্নাঘর নেই, কল নেই, বাথরুম পর্যন্ত নেই। বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটু পিছন দিকে একটু দূরে গিয়ে, অবিশ্যি সব ব্যবস্থাই আছে। চাকরদের জন্য ওটা।

তা রেফিউজি হয়ে অত সুখ আর কোথায় পাবে ? এই যে পাচ্ছে এই যথেষ্ট। কত লোক তো' ফুটপাতে।

মিসেস পালিত অমায়িক মানুষ। দেশহিতৈষণায় আগ্রহ আছে তাঁর। তা নৈলে বলা মাত্রই এই এতবড় মাঠওলা গ্যারেজটা তিনি পঁয়ত্রিশ টাকায় দিয়ে দিলেন ? ভিতরে ইলেক্‌ট্রিকের আলো পর্যন্ত আছে।

কৌতূহল হ'লো। দরজার সাদা কাজ করা পর্দার কাছে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো নখ ভর দিয়ে তিনি অতি সন্তর্পণে একটু চেষ্টা করলেন ভিতরটা দেখতে, আর সেইটুকুমাত্র আভাসেই মাথায় আঁচল তুলে মালতীর মা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। রোগা ছিপছিপে চেহারা, টানা-টানা কালো চোখ, পরনে মিলের আধময়লা শাড়ি, হাতে হলুদের রং। বোধহয় রান্না করছিলেন। মৃদু হেসে মিসেস পালিতের কাছে এসে দাঁড়ালেন।—'কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ, মা—'একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ধরা পড়ে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাটিয়ে নিলেন—'আজ আমার বাড়িতে দু'চারজন অতিথি আসছেন বিকেলবেলা, ভাবছি তোমাদের এই উঠোনেই—'

'আমাদের আর উঠোন কী।'

'তোমাদের বই কী, তোমাদেরই তো। তোমাদের অনুমতি ছাড়া কিছু আমি করতে পারি না এখানে।'

ভদ্রমহিলার মধুর ব্যবহারে গলে গেলেন মালতীর মা।

মিসেস পালিত গলায় আরো মধু ঢাললেন, 'তোমার মেয়ে ? মেয়েটি কই ? সেও যেন আসে আজ। এই ওদের সঙ্গে একটু—মানে—'

'আপনি আসুন না ভেতরে।' পর্দার কোণটা তুলে মালতীর মা অনুনয় করলেন। তারই মধ্যে ভিতরটা পলকে দেখে নিলেন মিসেস পালিত। আয়নার মতো তকতকে মেঝে, নোনাধরা ঐ দিকের দেয়ালে একটি বড় তক্তপোষে মা-মেয়ের বিছানা পরিষ্কার ক'রে সুজনিতে ঢাকা। মাথার কাছে ছোট টেবিলে বই গোছানো, কাচের গ্লাসে ফুল। বসবার জন্য কয়েকটি মোড়া। এ-পাশে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর রঙিন ঢাকনা দিয়ে তার উপরে প্রসাধনের টুকিটাকি। হেলানো আয়না, ওষুধের শিশি, পাউডারের টিন, পাফ, ফিতে কাঁটা—আর একেবারে এই দেয়ালে অর্থাৎ দরজার বাঁ কোণে গনগনে তোলা উনুনে ডালের কড়াই চাপানো। পাশে একটি ছোট পিঁড়ির উপর ব'সে দেয়ালে ঠেশান দিয়ে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে মালতী।

মিসেস পালিত মনে মনে তারিফ না-ক'রে পারলেন না। এই ঘরকে এবং মাত্রই একখানা ঘরকে এ-রকম রাখায় বাহাদুরি আছে। বাঙালদেশের মেয়েগুলো রোগা হ'লে কী হবে, কাজের খুব। হেসে বললেন, 'আজ আমার মরবার সময় নেই। বসবো, নিশ্চয়ই বসবো এসে আর একদিন।' তারপর মালতীর দিকে তাকিয়ে—'যেও। কেমন ?' মালতী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।

মেয়েদের এসে বললেন, 'তোমরা এবার একটু গা হাত পা নাড়ো। বুড়ো হয়েছি, আমি আর ক'দিন ? কেমন ক'রে পার্টি-টার্টি দিতে হয় শিখে নাও। আজ বাগান হবে।'

'বাগানে ?'

'হ্যাঁ। গ্যারেজের মাঠে। গার্ডেন পার্টি। আমি এক্ষুনি ডেকোরেটরদের ফোন ক'রে দিচ্ছি, তারা এলে কোথায় কী হবে সব তোমরা দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।' বলেই তিনি হাঁপাতে

হাঁপাতে তেতলায় এলেন ছেলের কাছে। ছেলেকে নিয়েই তাঁর ভাবনা। তার না আছে হাল, না আছে চাল। না বুদ্ধি, না বিবেচনা। আসলে যদি ভালো ক'রে ভেবে দেখেন তা হ'লে এই পার্টির পনেরো আনাই তো তাঁর ছেলে। সম্প্রতি তার বিয়ের কথাটাই মিসেস পালিত বেশি ক'রে ভাবছেন। নিজে বুড়ো হয়েছেন, দু'দিন পরে মেয়েরা পরের ঘরে চলে যাবে, ঠিকমতো হাল ধরবার মানুষ চাই। ছেলে যদি একটা মেম বিয়ে ক'রে আনতো খুশি হতেন তিনি। তারও তার যোগ্যতায় কুলোলো না।

অথচ ওর কিসের অভাব ? বাপ দাদা তিনপুরুষের অঢেল টাকার একলা মালিক সে। লেখাপড়ায় তুখোড়, চেহারা ভালো, বংশমর্যাদায় কৌলীন্যের দাবি রাখে। ইচ্ছে করলে যে-কোনো মেয়েকে ও তুড়ি দিয়ে ঘরে আনতে পারে। কিন্তু কেউ তার মনোমত নয়, কাউকেই তার পছন্দ হয় না। বোকা।

তেতলায় এসে আজ বিকেলের চাল-চলন বিষয়ে একটু উপদেশ দিলেন, বেশভূষা নিয়েও বললেন কিছু, তারপর আবার নিচে এসে ফোন তুললেন তাড়াতাড়ি। প্রথমে নিউ মার্কেট, ফুলের দোকান, তারপর ফেরাজিনি আর ফারপো। তারপর ডেকোরেটর। ডেকোরেটরদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর অনেকক্ষণ লাগলো। এত অল্প সময়ের নোটিসে কাজ করতে চাইছে না তারা। শেষে অনেক বলা-কওয়ার পর এক্সট্রা চার্জের কথা বলে রফা করলেন। না-হয় বেশি কিছু খরচই হ'লো, তবু তো ব্যাপারটা অভিনব হবে। বাড়ির পেছনের এত বড় লনটা চোখে পড়বে সকলের।

এদিকের মেয়েরা সমস্তটা সকাল শাড়ি ব্লাউজের গবেষণাতেই কাটিয়ে দিলো। সমস্তটা দুপুর একবারের জন্যও সূর্যের মুখ দেখলো না (পাছে ত্বকের মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়), সারাক্ষণ মাথায় জল ছিটিয়ে ক্লিপ এঁটে রুমাল বেঁধে রাখলো চুলে, তারপর এক টিপ ঘুমিয়ে নিয়ে (বিউটি স্লিপ), তিনটে বাজতেই তিন বোন ঘরের দরজা বন্ধ করলো।

প্রায় চারটের সময় মিসেস পালিত নিচে গিয়ে শেষ বারের মতো পরিদর্শন ক'রে এলেন। ঠিক হয়েছে। হুবহু যেমনটি চেয়েছিলেন। ঘাসের রঙে মিশিয়ে সবুজ কাচের টেবিলে আর সবুজ গোল চেয়ারে ছোট-ছোট এক-একটি গ্রুপ একেবারে আলো ক'রে আছে মাঠটি। মাঝে-মাঝে কাজ-করা চিনেমাটির টবে পাম গাছ, ফার্ন। প্রত্যেক টেবিলের উপর নেপালি পাথর সেট-করা উজ্জ্বল লালচে তামার ছোট-ছোট কলসিতে লম্বা ডাঁটির চার ডজন ক'রে সাদা সতেজ রজনীগন্ধা। বাঁশের ফ্রেমে সিল্কের ঝালর-কাটা শামিয়ানা খাটানো হয়েছে মাথার উপর, আর তা ফুটো করে এমন সুন্দরভাবে কাট গ্লাসের বারোটি ঝাড় আলো বসানো হয়েছে বাঁশের সঙ্গে এঁটে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় শামিয়ানা থেকেই ঝুলে পড়েছে আলোগুলো, যেন এ-রকম করে একটি ঝুলন্ত ছবিই এঁকে রেখেছে কেউ। দোতলা থেকে দুদিকের দুটি ফ্ল্যাট কেটে সোজা সিঁড়ি নেমে এসেছে লনে। সেই সিঁড়িতে লাল টুকটুকে গালিচা মুড়ে দেওয়া হলো। বড় ড্রইংরুমটিও আজ খোলা, সেটিও সাজানো হয়েছে নতুন করে। কী জানি কখন কোন অতিথি হঠাৎ গিয়ে উপরে ওঠেন।

সমস্ত লনটা ফিরে-ফিরে দেখতে দেখতে ভারি তৃপ্তি বোধ করলেন মিসেস পালিত। চমৎকার দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস এ-বুদ্ধিটা তাঁর মাথায় এসেছিলো। নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে গিয়ে একটু দূরে লতায় ঘেরা প্রায় কবিকুঞ্জের মত বন্ধ দরজা, বন্ধ জানলা গ্যারেজটির দিকে চোখ পড়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। ওদিকে একটা পার্টিশনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিলো তো। এটা তো এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। কতক্ষণ না বেরিয়ে থাকবে ওরা ! অবিশ্যি

ওরা আটকে থাকবে বলে তাঁর চিন্তা নয়—অতিথিদের চোখে তো তিনি কাঁকর ফুটতে দিতে পারেন না। যা বুদ্ধি আর যা লজ্জা এসব রেফিউজিদের, কে জানে তখন কী হালে এসে বাইরে দাঁড়ায়।

অথচ কী-ই বা করা যায় এটুকু সময়ের মধ্যে। হাতের ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলেন চারটা বাজতে তিন। অতিথেরা আসবেন পাঁচটায়। এক্ষুনি তাঁর স্নানে ঢোকা দরকার। ন্‌নাঃ, আর পারেন না, একা-একা। কত দিক সামলাবেন ?

শেষ পর্যন্ত উপর থেকে ছোট ড্রইংরুমের জাপানি ছবি-আঁকা, অতি মূল্যবান, অতি যত্নের, অতিশয় সুদৃশ্য লাল টুকটুকে পার্টিশনটি আনিয়ে ও-জায়গাটা আড়ালে করলেন একটু।

অতিথিরা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটাতেই এলেন। ততক্ষণে মিসেস পালিত স্নান সেরে, ঘি রঙের সাচ্চা গরদের থান সামনে আঁচল দিয়ে পরে, কনুই পর্যন্ত থ্রি কোয়ার্টার হাতের দুধ-সাদা শিফনের ব্লাউজ গায়ে, আসল কুমীরের চামড়ার চটি পায়ে, কোমরে তিনকোনা-ভাঁজ রুমাল গুঁজে প্রস্তুত। বুড়ো হয়েছেন, তবু এখনো তিনি সুন্দরী। তাঁর রং হাতির পুরোনো দাঁতের মতো হলদেটে, মসৃণ আর নীরস। মেয়েরা একজনও সেই রং পায়নি। কিম্বা পেয়েছিলো, নকল রংয়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে।

তিন বোনে তখন একটু ঘরোয়া খাবার খেয়ে আবার শেষবারের মতো আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মুহূর্তে সরগরম হয়ে উঠলো লনটা। দেখতে দেখতে বাড়ির সামনের রাস্তা গাড়িতে ভরে গেল। মিসেস পালিত একটি স্বর্গীয় হাসির আভা ছড়িয়ে দিলেন মুখে। গলার স্বর আরো নরম করলেন, কথা আরো ধীর। তকমা-আঁটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা বয় বেয়ারাগুলো যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। মিসেস পালিতের তিনটি মেয়ে রং-করা মুখে, কার্ল-করা চুলে প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগলো।

আর সবচেয়ে যেটাতে খুশি হলেন মিসেস পালিত নয়নেন্দুও ঠিক-ঠিক সময়ে তাঁর নতুন কিনে দেওয়া শান্তিপুরি ধুতির লম্বা কোঁচা লুটিয়ে, নতুন তৈরি করানো পাটভাঙা পাঞ্জাবি গায়ে, সাদা পায়ে লাল টুকটুকে নতুন বিদ্যাসাগরী চটি পরে নেমে এলো নিচে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করলো হাসিমুখে, একটু-আধটু ঠাট্টাও করলো সমবয়সীদের সঙ্গে, মেয়েদের সাজসজ্জার স্তুতি করলো খানিকক্ষণ—একেবারে যথাযোগ্য। জানে, সবই জানে। এত বিদ্বান ছেলে তাঁর, আর এইটুকু জানবে না ? খুশিতে ভরে উঠলেন মিসেস পালিত।

মাপা কথা, মাপা হাসি, ঘাড় কাত করে অহেতুক বিনয়, শাড়ির ঝলক, স্যুটের ভাঁজ, রঙিন টাই, সুগন্ধি রুমাল, খাটো চুল, লম্বা চুল, গয়না, না-গয়না, জর্জেট, লিনেন, শিফন, পাম বীচ, শান্তিপুরী, ফরাসডাঙা, মুক্তোর মালা, হিরের কলার, সোনার বালা, প্রবাল ফুল—বিদ্যুতের মতো ঝলসাতে লাগলো সব। মিসেস পালিত এমন একটি জায়গায় বসলেন, যেখান থেকে সকলের তদারক করতে পারেন, সকলকেই দেখতে পান। যুবক-যুবতীরা নিজেদের নিজেদের সঙ্গী বুঝে, সুবিধে বুঝে ঠিক-ঠিক জায়গায় বসলো।

মিসেস পালিত মুখ থেকে চোখ সরাতে লাগলেন। এসেছে, সবাই এসেছে। গরজ

কি কেবল তাঁরই। তাঁর ঘরেও কি অন্যদের কোন গরজ সঞ্চিত নেই ? মেয়েরা তাঁর সুন্দরী, যথোপযুক্ত শিক্ষাও তিনি দিয়েছেন, আর এ-কথা কে না জানে যে প্রত্যেক মেয়ের পেছনে বেশ মোটা অঙ্কই ঢালবেন তিনি।

আর নয়নেন্দু ! সে তো যে-কোনো কন্যা বা তার পিতা মাতারই মহাকাম্য। কিন্তু একমাত্র ছেলে তাঁর, তার জন্য অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। জীবনে যত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, এইবার হবে তার চরম পরীক্ষা। যে-কটিকে ডেকেছেন, তার যে-কোনোটিই পছন্দ করুক না নয়নেন্দু, তাইতেই তিনি রাজি।

পাটি জমে উঠলো। ধন্য ধন্য রব উঠলো মিসেস পালিতের উদ্দেশে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো যে এমন সুন্দর সম্মিলনী সত্যিই আর কোথাও হয় না। এমন চা, এমন উৎকৃষ্ট খাবার,আরামের এমন সুসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, এমন সুসজ্জিত সভা—মিসেস পালিত ভদ্রতার মাত্রা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিলেন। সাদা নরম মাখনের মতো হাতে নিজেই পরিবেশনে প্রবৃত্ত হলেন। আর এক পশলা ফারপোর স্যান্ডউইচ আর ফেরাজিনির প্যাটি বিতরণ করতে করতে নরম গলায় বললেন, 'এ কিন্তু আমার মেয়েদের তৈরি, ফেললে শুনবো না।' আর মেয়েরা মার কথায় আরো অনেকবারের অভ্যাসমতো অতিথিদের সপ্রংশ দৃষ্টির তলায় নিজেদের একেবারে বিনয়ের অবতার ক'রে রাখলো, রং-করা গালে লজ্জার এমন একটি আভা ছড়াতে সচেষ্ট হ'লো যে সাধ্য কী তারা ফারপোর স্যান্ডউইচকে আর ফারপো মনে করে।

মিসেস পালিত বর্ষার ভরা নদীর মতো সুখে ছলছল করতে লাগলেন।

গ্যারেজের ঘরের মধ্যে সারাদিন সেদ্ধ হ'য়ে সন্ধে নামলে একটুখানি দরজা খুললেন মালতীর মা। পাটিশনটা দিয়ে বাঁচিয়েছেন ভদ্রমহিলা। মানুষটি সত্যি ভালো। তা নইলে এতখানি বিবেচনা ? তাদের অসুবিধে হ'তে পারে ভেবেই তো এই ব্যবস্থা।

মালতী এখনো ফেরেনি স্কুল পড়িয়ে। আজ একেবারে টিউশনিটি সেরেই ফিরবে। পাটিশনের ওপারের কলহাস্য শুনতে শুনতে হঠাৎ মেয়ের জন্য মনটা যেন কেমন ভারি হ'য়ে উঠলো। বেচারা ! ঢাকা ছাড়ার পরে ফূর্তি কী, আনন্দ কী, হাসি কী, বিশ্রাম কী, কিছুরই আর চিহ্ন নেই জীবনে। উনিশ বছরের মেয়ে, খাওয়া পরার ধান্ধাতেই সারাদিন অস্থির। আজ পাঁচদিনের মধ্যে তাঁর স্বামীরও কোনো চিঠি নেই। বাড়ির ব্যবস্থার জন্য এখনো ঢাকাতেই প'ড়ে আছেন তিনি। কেমন আছেন তাই বা কে জানে।

হঠাৎ দপ করে একসঙ্গে বারোটা ঝাড় জ্বলে উঠে দিন হয়ে গেল ওপাশে। মালতীর মার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। চমকে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। আর তার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ক্লান্ত ম্লান বিষণ্ণ মালতী ঘরে এসে ঢুকলো। মার মতোই ছিপছিপে চেহারা, মুখশ্রী মধুর। মার চাইতে আর একটু পুষ্ট, আর একটু ফর্সা।

মুখে হাতে একটু জল ছিটিয়ে কাপড় জামা না ছেড়েই লম্বা চুল মেলে দিয়ে টান হ'লো বিছানায়।

'শিগ্‌গির চা দাও, মা।'

'আজ একটু তাড়াতাড়ি এলেই পারতিস।' কেট্‌লিতে জল ভরতে-ভরতে মালতীর মা জবাব দিলেন।

'কেন ?'

'সকালবেলা ব'লে গেলেন যে ভদ্রমহিলা।'

'ও।' মালতী পাশ ফিরলো।

'না যাওয়াটা অন্যায় হবে। হাজার হোক, বুড়োমানুষ, নিজে নেমে এসে বলেছিলেন।'

'আমাকে বলতেই নেমেছিলেন নাকি?'

'যে কারণেই নামুন না, আমার দরজায় এসেছিলেন তোকে বলতেই।'

'কী ভাগ্য!' উঠে বসলো মালতী! 'ঈশ, চুলগুলো এখনো ভিজে আছে।'

'একবার না হয় ঘুরেই আয় না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমার কথা উনি একবারও ভাবছেন না।'

'যদি না-ই ভাবেন তা হ'লে আর বলবেন কেন?'

'ঐ একটু—'

'তুই সবই বুঝিস!'

'সব বুঝি না মা, কিন্তু তোমার চেয়ে একটু বেশি বুঝি।' মালতী হেসে মাকে চটিয়ে দিয়ে একটা বই খুললো। 'তার চেয়ে এটা শেষ করি, কাজ দেবে।'

'এত অসামাজিকতা ভালো না,' প্যানপ্যান করতে-করতে উনুনে হাওয়া দিতে লাগলেন মালতীর মা।

আর একটু শুয়ে থেকে বইটা হাতে নিয়েই বাইরে এলো মালতী। শামিয়ানা ঢাকা পার্টির উজ্জ্বল আলো শেডের তলা দিয়ে পার্টিশন ডিঙিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের মতো পিছলে পড়েছে তাদের দরজার সামনে। সুন্দর হাওয়া। মালতী ঘর থেকে একটা মোড়া এনে একটু কোণ ঘেঁষে বসলো তার বই নিয়ে। চমৎকার পড়া যাচ্ছে ঐ আলোতেই।

পাঁচটা থেকে সাড়ে-ছ'টা। পুরো দেড় ঘণ্টা। হাসি, ঠাট্টা, গান, গল্প, খাওয়া, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মুখ মেরামত, প্রত্যেকটি নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে খাটো ব্লাউজের তলায় চার আঙুল পেট দেখানো, কাঁধ থেকে মিনিটে একবার ক'রে বুকের আঁচল গড়িয়ে পড়া, খেলার খবর, সিনেমার তারকা, ঘোড়দৌড়ের বাজি, শেয়ার মার্কেট, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ির নাম, শাড়ির নাম, বাড়ির প্ল্যান, জমির দাম, রাজা উজির জওহরলাল দিল্লি বুশ মার্কিন সব, সব হ'লো।

এর পরে উশখুশ করলো নয়নেন্দু। এই ঠাসা জমজমাট আসরে একটানা একটা সুখের স্রোতে কিছুতেই নিজেকে আর বেশিক্ষণ খাপ খাওয়াতে পারলো না সে। এখানে কী বলবে? কী করবে? কী জানে? তার জ্ঞানের পরিধি এদের চেয়ে ঢের, ঢের কম। সে বোকা। মিসেস পালিতের অযোগ্য পুত্র সে। তাই সুযোগ বুঝে একবার চট ক'রে উঠে পড়লো।

নতুন ধুতির পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের কোঁচা সামলে, মার্কোভিচের টিন হাতে নিয়ে পার্টিশনের এ পিঠে একটু আড়ালে এসে সহজ হ'য়ে আড়মোড়া ভাঙলো এবার। আরাম ক'রে সিগারেট ধরালো একটি, তারপর জ্বলন্ত কাঠির টুকরোটি ছুঁড়ে দিয়েই থমকে গেল। ছি ছি!

চমকে শাড়ি থেকে নিভন্ত কাঠিটা ঝেড়ে কোণ থেকে উঠে দাঁড়ালো মালতী। নয়নেন্দু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।

এই মুহূর্তের কালোপাড় শাড়ি-পরা, লম্বা খোলা চুলের, কচি কলাপাতার মতো কমনীয় মুখের মেয়েটিকে আজই সে প্রথম দেখলো না। তার এই বিলেত-প্রত্যাগত পাঁচ মাসের

জীবনে বহুবার দেখেছে। যতবার দেখা সম্ভব হয়তো তার চেয়েও কিছু বেশিই দেখে থাকবে। সকালের মিঠে রোদ্দুরে চুল শুকোতে দেখেছে, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ঝুঁকে প'ড়ে বই পড়তে দেখেছে একমনে, বালতি-বালতি জল এনে বাগান ভিজোতে দেখেছে, দরজার সাদা পর্দা উড়লে ঘরের মধ্যে কাজে বিব্রত দেখেছে—কিন্তু মুখোমুখি সাক্ষাৎ এই প্রথম।

'আমি একেবারে দেখতে পাইনি।' ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে হাতজোড় করলো সে।

'কী হয়েছে তাতে ?' মালতী হাসলো একটু।

নয়নেন্দু হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। 'অবিশ্যি এ উপলক্ষে যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল সেটাই মস্ত ভাগ্য।'

মালতী আবার একটু হেসে নিচু হ'য়ে মোড়াটা এগিয়ে দিল। 'বসুন না।'

'আপনি ? আপনি বসবেন না ?'

নয়নেন্দু যে সত্যি-সত্যিই বসবে এটা হয়তো ভাবেনি মালতী। একটু তাকিয়ে আর-একটা মোড়া নিয়ে এলো ঘর থেকে। 'সুন্দর জায়গাটা', নিজের বাড়িকে যেন নতুন ক'রে দেখছে এমন ভাবে চারদিকে তাকালো নয়নেন্দু। 'গাছে ফুল ফুটিয়ে, দেয়ালে লতা তুলে ঘরটাকে আপনি দেখছি জাতে তুলে ফেলেছেন।'

'আর উপায় কী।'

'আপনার ঘরের পর্দা উড়লে কিন্তু ভেতরে তাকিয়ে আমার ভারি লোভ হয় যেতে।'

'আমার ভাগ্য।'

'কী বই ওটা ?'

মালতী হাত বাড়িয়ে বইটা দিল।

'ও, ক্যাথারিন ম্যাসফিল্ড ? চমৎকার লেখেন ভদ্রমহিলা, মেয়েদের মধ্যে—'

'লেখকদের মধ্যে বলুন—'

'সরি !' হাসলো নয়নেন্দু—'আমরা প্রায়ই ভুল বলি। মার্জনা করুন। আর কার লেখা আপনার ভালো লাগে ?'

'কার আর পড়েছি। বইই জোটে না।' একটু থেমে—'এটা আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে জোর ক'রে নিয়ে এলাম একদিনের জন্য, তার দাদার বই।'

'কী আপনি পড়তে চান বলুন ?'

'যা পাই।'

'তাহ'লে আসুন না একদিন আমার তেতলায়। অনেক বই আছে। অবিশ্যি আমি যে-রকম পরিচ্ছন্ন মানুষ, তাতে কোনো ভদ্রমহিলাকে যেতে বলা দস্তুরমতো বেয়াদবি। বিশেষ ক'রে আপনি তো টিকতেই পারবেন না সেখানে—'

বইটা সে ফেরত দিল মালতীকে, তারপর সিগারেটের টিনের ঢাকনা খুলে মৃদু হেসে বললো, 'অনুমতি করেন তো—'

'আপনি খান না, কী আশ্চর্য !'

'আপনার অসুবিধে হবে না ?'

'অসুবিধে হবে কেন ? বাঃ।'

নয়নেন্দু কৌটো থেকে সাগ্রহে একটি সিগারেট তুলে ধরালো—'নিশ্চয়ই আপনার নাম জিজ্ঞেস করলে খুব অন্যায় হবে না ?'

'নিশ্চয়ই না।' একটু হাসলো· 'আমার নাম মালতী।'

'মালতী ! কী আশ্চর্য ! আপনাকে দেখে-দেখে অনেকদিন আমার নাম আমি ভেবেছি মনে-মনে, কিন্তু এ-নামটি তো বার করতে পারিনি।'

একটু লাল হ'য়ে মালতী বললো, 'নামের সঙ্গে প্রায়ই মানুষের মিল থাকে না। মা-বাবারা বড়ো দুর্বল কিনা তাঁদের সন্তান সম্বন্ধে।'

'কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে সংসারে', নয়নেন্দু মালতীর মুখে চোখ স্থির করলো। 'তা নইলে আপনার মা-বাবা এমন একটা আশ্চর্য সঠিক নাম কেমন ক'রে খুঁজে পেলেন বলুন তো ?' গোল ক'রে ধোঁয়া ছাড়লো সে আকাশে। 'চমৎকার নাম।'

ওপাশে, একটু দূরে, পার্টি ভেঙেছে ততক্ষণে। মিসেস পালিত আবক্ষ আনত হ'য়ে সহাস্যে ফটক পর্যন্ত বিদায় দিতে গেলেন অতিথিদের। কোলাহল ক্ষীণ হ'য়ে এলো।

মালতী বললো, 'আপনাদের পার্টি আশা করি ভালোই হ'লো ?'

'হলো।'

'আপনার মা আমাকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু আজ আমার টিউশনি ছিলো ব'লে বড্ড দেরি হ'য়ে গেল বাড়ি ফিরতে—'

'ও—'

নয়নেন্দুর উদাস ভঙ্গিতে হঠাৎ কোথায় আত্মসম্মানে হুল ফুটলো মালতীর। একটু শক্ত হ'য়ে গিয়ে বললো, 'অবিশ্যি অতিথি হিসেবে আমি নেহাতই নগণ্য, তবু একটা কৈফিয়ত দিতে হয়—আমার মা বলেন সেটাই ভদ্রতা।'

'ভালোই করেছেন না গিয়ে', সিগারেটের ছাই ঝাড়লো নয়নেন্দু। 'এ-সব কেন যে মানুষের ভালো লাগে!' তাকিয়ে-তাকিয়ে একটুখানি নীলরঙা ধোঁয়া দেখলো—'ওটা একেবারেই আমার মা বোনেদের ডিপার্টমেন্ট। ওরা কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন কি করেননি তাই আমি জানিনে।'

মালতি চুপ ক'রে রইলো।

'মাঝখান থেকে আমার বিকেলটাই নষ্ট হ'লো। চা-টা পর্যন্ত ভালো ক'রে খাওয়া হ'লো না।'

'কেন ?'

'চা কখনো ওরকম ক'রে খাওয়া যায় ? ওপরে গিয়ে আর-কিছু করি বা না করি এক কাপ চা খাবো ভালো ক'রে।'

'বোঝা গেল চায়ের একনিষ্ঠ প্রেমিক।'

'ভীষণ।'

'যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনার বর্ণিত অতি লোভনীয় আমার মালঞ্চে একবার আসুন না, চা খাওয়াই আপনাকে।'

'নিশ্চয়ই ! সেই কখন পাঁচটার সময়ে একবার—' তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো নয়নেন্দু।

মালতী ঘরে এনে বসালো যত্ন ক'রে। পরিচয় করিয়ে দিল মার সঙ্গে। মালতীর মা এক কেটলি জল ফুটিয়ে, মেয়ের আশায় ব'সে থেকে থেকে কখন শুকিয়ে ফেলেছিলেন।

বড়ো-বড়ো চোখে লাজুক মুখে হেসে অস্ফুটে তার খুশি নিবেদন ক'রে আবার বসিয়ে দিলেন কেটলিটা।

বেডকভার ঢাকা বিছানার উপরেই আরাম ক'রে বসলো নয়নেন্দু, মালতী ছাই ফেলতে একটি পরিষ্কার হেজলিনের কৌটো এনে দিল। 'এই নিন আপনার অ্যাশ-ট্রে।' মালতীর মা একটু দূরে বসে যেন নিজেই হাওয়া খাচ্ছেন এমনভাবে তালপাতার পাখাটি নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'বড্ড গরম, না ?'

অভ্যস্ত হাতে টুকটাক কাজ করতে লাগলো মালতী। সোনার মতো তামার থালার উপরে তিনটি শৌখিন কাপ প্লেট সাজালো—পদ্মকাটা ছোটো থালায় আলুভাজা, চিঁড়েভাজা, ডিমের কুচি, দেয়ালের র‍্যাকে রাখা বিস্কুটের টিন থেকে কয়েকটি নারকোল সন্দেশ পেতলের রেকাবিতে। তারপর পাঁচ মিনিটে পটভর্তি চমৎকার ধোঁয়া-ওঠা চা নিয়ে হাজির হ'লো নয়নেন্দুর কাছে।

সামান্য একটু অনুরোধ উপরোধ, তারপর তক্তপোষের উপরেই তোয়ালে বিছিয়ে তিনজন মানুষের ছোটো টি-পার্টিটুকুও বেশ জমে উঠলো ঐ ঘরে।

এতক্ষণ মালতী কেন চা না খেয়েই গল্প করছিলো বসে বসে, তাই নিয়ে একটু ঝগড়া করলো নয়নেন্দু, দুটো সন্দেশ নিয়ে প্রায় একটি ছোটোখাটো বিপ্লব হ'য়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ কোন সালে প্রথম ইওরোপে যান সে-বিষয়ে একটা মতভেদ হ'লো মস্ত ; ছাই জ'মে উঠলো হেজলিনের শিশিতে।

এদিকে মিসেস পালিত অতিথিদের বিদায় দিয়ে তখুনি উপরে যেতে পারলেন না। বাড়তি খাবারগুলো ট্রে-তে সাজালেন। পাতের খাবারগুলোও তুলিয়ে রাখলেন চুপড়িতে। দামী-দামী সব কাচের বাসন একটা-একটা ক'রে গুনে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। ডেকোরেটরদের লরি আসবে সাড়ে-আটটায়, চেয়ারগুলো স্তূপ করিয়ে রাখালেন এক ধারে। বাকি রইলো পার্টিশনটা। পার্টিশনটার কথা মনে হ'তেই তাঁর মালতীকে মনে পড়লো। মেয়েটা আসেনি। আহা। রেফিউজি। এলে যা-হোক একটু ভালো মন্দ খেতে পারতো। যা ওদের কষ্ট। এমন কত খাবার ফেলা যায় তার ঘরে, নেহাত না-চাইলে দেওয়াটা হয়তো ভালো দেখাবে না তা নইলে মেয়েদের পুরোনো জামা কাপড়ই কি কম নাকি তাঁর ?

আজ মিসেস পালিতের সকলের জন্যই সমান মমতা, সমান দৃষ্টি। আজকের দিনের মতো এমন একটি সুসম্পূর্ণ নিটোল সুখের দিন আর এসেছে নাকি তাঁর জীবনে ? জীবনের শেষ কাজ শেষ সাধ মেটাবার আজ চরম মুহূর্ত তাঁর। সবই ভালো, সব ভালো।

মনে-মনে একটু হাসলেন, এতদিনে তাহ'লে পুত্রের মন মজলো ? বলতে গেলে প্রায় সব সময়টাই তো বসেছিলো পার্টিতে, নিশ্চয় নেহাতই কোনো বিশেষ প্রয়োজনে উঠে যেতে হয়েছিলো, তাই। লনের চারদিকটায় একবার তাকালেন। মিস্টার নস্কর ঠিকই বলেছেন, 'মেয়ের জন্য যদি তাঁকে একটি বাড়ি তুলেই দিতে হয়, সেটা যেন এই বাড়ির এই লনেই তুলতে পারেন। তিনি। কী যে বলেন এঁরা।'

পারলে অবিশ্যি এদের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থাপন করবেন মিসেস পালিত। সমাজের চূড়োয় আজ বসে আছে এই নস্কর পরিবার। ক'টা রাজার ঘরে এদের মতো অর্থবিত্ত।

ঝিকে দিয়ে সকলের ঘরেই কিছু-কিছু মিষ্টি বিতরণ করালেন। দারোয়ান, ড্রাইভার,

উড়ে মালি, মালতীর মা—কাউকেই বাদ দিলেন না। আহা, সবাই তো তার বাড়ির মানুষ বিয়ে না হোক, তার ভূমিকা তো বটে! মিষ্টি মুখ করুক সবাই।

সব শেষ ক'রে প্রশান্ত মনে দোতলার সিঁড়িতে পা দিলেন তিনি। কিন্তু দু' সিঁড়ি উঠেই থামতে হ'লো তাঁকে। আজ মালতীর ঘরের পর্দাটা গুটোনো, যা কোনোদিন তিনি দেখেননি। বোধহয় এই পার্টিশনটা দিয়ে একটু আব্রু হয়েছে বলেই এটা করেছে। বাইরে কি ফেলতে এলেন মালতীর মা। ভেতরে মুখোমুখি বসে আছে মালতী আর নয়নেন্দু। মাঝখানে চায়ের বাসন ছড়ানো।

খোকা! খোকা ওখানে করছে কী? ওখানে—ওখানে তার কী আছে? মিসেস পালিত যেন হতভম্ব হ'য়ে গেলেন খানিকক্ষণের জন্য। তারপর কালো কার ঝোলানো চশমাটি বার করলেন বুকের ভেতর থেকে। অপলক তাকিয়ে রইলেন তিনি ছেলের সুশ্রী সুখী আনন্দে উজ্জ্বল মুখখানার দিকে। মনে করতে পারলেন না শৈশব পার হবার পরে আর কোনোদিন নয়নেন্দুকে এতটা উদ্ভাসিত তিনি দেখেছেন কি না।

ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলেন উপরে। বড় ড্রইংরুমে হুল্লোড় করছে তিন বোনে, তখনো তাদের ফূর্তির রেশ কাটেনি। ঝি-চাকররা ঘুরছে ফিরছে, বয় বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে লঘু পায়ে, ঘরে বাইরে সর্বত্র সব চারশো-পাঁচশো পাওয়ারের আলো জ্বলে দিন হ'য়ে আছে বাড়িটা। লম্বা বারান্দাটা পার হ'য়ে নিজের ঘরে আসতে আসতে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়লেন মিসেস পালিত।

খাবার আর ফুলের গন্ধে বমি-বমি করতে লাগলো, আলোর উজ্জ্বলতায় মাথা ধরে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন না একরাশি টাকা খরচ করে একটা পার্টি দিয়ে কী এমন উৎসব লেগে গেল আজ তার বাড়িতে, এত খুশি হবার আজ কী পেল তাঁর বাড়ির সবাই। বিশ্রী! বিশ্রী! সব বিশ্রী! সব তিক্ত, ব্যর্থ! বর্বরের মত কেবল হৈ-হুল্লোড়ই ভালোবাসে কেন ওরা? আস্তে দরজাটি ভেজিয়ে, আলো নিবিয়ে নিজের ঘরটি অন্ধকার ক'রে দিলেন, তারপর প্রকাণ্ড মেহগনি খাটের নরম বিছানায় নরম বালিশে মুখ লুকিয়ে নিজেকে একেবারে মুছে দিতে চাইলেন এ সংসার থেকে।

সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য

একদা কতিপয় যুবক যুবতী দল বেঁধে একটি বাস ভাড়া করে কলকাতার সন্নিকটবর্তী কোনো স্থানে কোন নদীর ধারে পিকনিক করতে গেল।

ফাল্গুন মাসের শেষ, এই ধরনের বনভোজনের পক্ষে সময়টি চমৎকার, ভ্রমণের পক্ষেও চমৎকার। দিনটিও ছিল চমৎকার। সুন্দর ছায়া ছায়া রোদ, মন কেমন করা হাওয়া, আকাশ গভীর নীল। একসঙ্গে তারা সতেরো জন ছিলো। ইচ্ছে ছিলো আঠারো জন হোক, ন-জন ছেলে, ন-জন মেয়ে। ঠিকও তা-ই ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে এলো না। তার টনসিল ফুলেছে।

ফুলুক গে। তখনকার মতো একটু হতাশ হতাশ ভাব হলেও বাস ছাড়তে না ছাড়তেই ফূর্তির বন্যায় সব ভেসে গেলো। গান ধরলো, 'আমরা নতুন যৌবনেরি দূত।'

হাওয়া কেটে কেটে দুর্ধর্ষ স্পিডে বাস চলছে, সব-উদিত নতুন সূর্য দারুণ ফোকাস ফেলেছে সকলের চোখে মুখে মাথায়, চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে, বুশসার্টের কলার উড়ছে, বেলপ্যান্ট ফতফত্ করছে, দুর্জয় আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছে শরীর মন।

ঘণ্টাখানেক চলবার পরে স্থির হলো জায়গা। হুগলি নদীর ধারেই কোনো এক বর্ধিষ্ণু শহরের কাছাকাছি।

কাছাকাছি কিন্তু কাছে নয়। কিছু হাঁটলেই লোকালয় কিন্তু এই স্থান জনহীন। এখানে নদীতীরে বিশাল একটি বটবৃক্ষ অশ্বত্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের স্নিগ্ধ ছায়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করেছে, তলায় চওড়া বাঁধানো বেদি তেলের মতো চকচকে, অদূরে বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। বোধ হয় কোনো জমিদারবাড়ি। দেয়াল ঘেঁষে এরিকা পামের সারি, ঘাসে-ভরা জঙ্গুলে বাগানে ইটালিয়ান মার্বেলের নারীমূর্তি, পাথরের পদ্মকাটা ফোয়ারা, মোরাম বিছানো পথ, লোহার মস্ত ফটক—জমিদার বাড়ি সুলভ সব বাহুল্যই সেখানে বিদ্যমান। বোধ হয় এককালে তারাই এই বট অশত্থের বিবাহ দিয়ে বেদি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন এখানে।

দলটা গিয়ে ওখানে প্রথমে ঐ বাড়িটাতেই চড়াও হতে চেয়েছিলো, পারেনি। দেখা গেল ফটকের দুইধারে দুটি পাকা কুঠুরিতে দু'টি পরিবার বাস করে। তাদের একজন দারোয়ান, একজন জমাদার। বাড়িটি ভগ্ন হলেও বাসের অনুপযোগী নয়। বাড়ির মালিক খবর পাঠিয়েছেন শীঘ্রই এসে বাস করবেন তিনি।

সেই খবর পেয়ে থেকেই যাকে তাকে ঢুকতে না দেবার জন্যও তালা পড়েছে ফটকে, বারো মাস বসে থাকা জমাদার তৈরি হচ্ছে সাফসুফ করার জন্যেও। মালীর খোঁজ পড়েছে, দারোয়ান গোঁফে তা দিয়ে আবার সদম্ভে পাহারা দিচ্ছে বাড়ি।

মল্লিকা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলো, 'ঈশ্! কী সুন্দর বাড়িটা, কিন্তু কী চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

মধুশ্রী বললো, 'আহারে, এই বাড়িটা যদি আমার শ্বশুরবাড়ি হতো।'

প্রবাল বললো, 'চলো চলো, আর ভাব দিতে হবে না। ভাঙা বাড়িতে অনেক সাপ থাকে, আমাকে ঢুকতে দিলেও আমি ঢুকতাম না।'

কলরব করতে করতে টুপটাপ একের পিঠে অন্যে কথা বলতে বলতে নির্জন নদীতীর মুখর করে দলটা এদিকে এগিয়ে এলো, এই বটের নিবিড় ছায়ায়। তারপর তারা যে সারাদিনটা ধরে কী করলো আর কী করলো না কিছুরই কোনো ঠিকানা রইলো না।

নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি থেকে শুরু করে, মারামারি, চুল টানাটানি, লুকোচুরি খেলা, দৌড়ের প্রতিযোগিতা, রাজনীতির তর্ক কিছুই বাদ গেলো না। তারই মধ্যে আশি বার চা হলো, কাঠকুটো কুড়িয়ে রান্না হলো, অতিভোজনের কম্পিটিশন হলো, বাসন ধোয়া নিয়ে ঠ্যালাঠেলি হলো, ইত্যাদি করতে করতে যখন সন্ধ্যা আগত হলো, তখন মালপত্র নিয়ে আবার ফিরতি বাসে উঠে গান ধরলো, 'আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।'

দলের মধ্যে মল্লিকা আর প্রবাল অনেক কালের বন্ধু। ওরা দুজনেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, একসঙ্গে এগারো ক্লাস পাস করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ভর্তি হয়, একাদিক্রমে ছ-বছর কাটিয়ে এম-এ পাস করে এখন গবেষণা করছে। দুজনেই ইতিহাসের ছাত্র।

দিন কয়েক বাদে মল্লিকা বললো, 'এই প্রবাল, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে ?'

প্রবাল বললো, 'কোথায় ?'

'চলো না বেরুই।'

'জায়গার নামটা তো বলবে ?'

'জানি না যে—'

'জানো না তো যাবে কেন ?'

'চিনি বলে।'

'জানো না কিন্তু চেনো ?'

'হ্যাঁ। চলো না।'

এরপরেও অনেকক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে তবে রাজি করানো গেল প্রবালকে। আসলে একটা বেরুনো তো, প্রস্তাবটা খুব অমনঃপুত নয়। এই বয়সে এই বন্ধুত্বয় এসব তো খুবই ভালো লাগে। অবশ্য ওদের মধ্যে কোনো প্রেমের ব্যাপার নেই, তবু তো স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্ব, তার স্বাদ একটু অন্যরকম। আরো দু-চারজনকে জোটাবে কি না তাও ভাবছিলো, প্রবাল দেখল মল্লিকা তেমন সায় নেই।

পথে আসতে আসতে বললো, 'আমরা সেদিন কোথায় পিকনিক করতে গিয়েছিলাম তোমার মনে আছে, প্রবাল ?'

'কেন ?'

'আমি সেখানেই যেতে চাই।'

'কেন ?'

'ঐ বাড়িটা দেখবো।'

'কোন বাড়িটা ?'

'ভাঙা জমিদারবাড়িটা।'

'এ আবার কী শখ ?'

'হেসো না, কিন্তু সেই থেকে ঐ বাড়িটা ছাড়া আর আমি কিছু ভাবতে পারছি না।'

'এতো সুন্দর লেগেছে?'

'না, সুন্দরের জন্য নয়।'

'তবে?'

'বাড়িটা ভীষণ চেনা।'

'কখনো এসেছিলে?'

'ককখনো না।'

'তবে।'

'সেটাই মজা! অথচ বাড়িটা আমার কাছে ছবির মতো স্পষ্ট।'

'আসলে জমিদার বাড়ি ফাড়ি কিছু না, মোদ্দা কথা, নিশ্চয়ই কোনো বড়োলোকের অভিশপ্ত বাগান বাড়ি।'

'হয়তো তাই। কিন্তু আমি তো কখনো এখানে আসিনি। আমার জন্ম শুনেছি ঢাকা, আর কর্ম তো জানোই—'

'ঢাকার কথা তোমার কিছু মনে আছে?'

'একেবারে না।'

'আচ্ছা বাড়িটার বিষয়ে তোমার কী মনে পড়েছে বলো তো?'

'ছাত্র তো ইতিহাসের, সাইকোলজির ঢং দিচ্ছ কেন?'

'তুমি তো বলছো, বাড়িটা চেনা বলো না কটা ঘর।'

'কতো চেনা লাগে শুনবে? বাড়িটা দেখতে দোতলা, কিন্তু আমি মনে মনে দেখি তেতলা। সামনের দিকে সবটাই ছাদ, কিন্তু পিছনে কয়েক স্টেপ উঁচুতে বিশাল একটা হল ঘর আছে!'

'সেটা প্রমাণ করতে এই পণ্ডশ্রম করার কী দরকার? ধরে নাও আছে। থাকুক। থাকতে দাও। হলোটা কী?'

'তুমি বুঝবে না।'

'সত্যি বুঝছি না। এতো এক পাগলের প্রস্তাব।'

'তাহলে যাবে না?'

'আবার রাগ করছো? বেড়াতে যেতে চাও চলো, ঐ বাজে চিন্তাটা ছেড়ে—'

'ঐ চিন্তাই যে আমাকে পেয়ে বসেছে।'

'ধ্যেৎ, ওটা আবার একটা চিন্তা। তার চেয়ে বরং চলো গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি। ময়দানে ফুচকা খাবো, মুড়মুড়ে মুড়ি ভাজা—'

এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এসে প্রবাল ফট্ করে নেমে পড়লো, মল্লিকাকেও টেনে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি। ছুট ছুট ছুট।

এই অসময়ে এমন বৃষ্টি কে ভেবেছিলো? দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার ধারে এসে মাথা বাঁচাবার চেষ্টায় এদিক ওদিক তাকালো। তারপরেই হাসলো। এই হাসি বয়সের ধর্ম। সবেতেই মজা, সবেতেই হাসি। তারপরেই প্রবালকে হতচকিত করে মল্লিকা আর্তনাদ করে উঠলো, 'আমার ভয় করছে, ভয় করছে—'

ভয়! কিসের ভয়? প্রবাল তড়িৎ বেগে একটু পিছনে পড়ে যাওয়া মল্লিকার দিকে ফিরে তাকালো। দেখলো রাস্তার উপরেই সে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে মৃগী রোগীর মতো। চোখের দৃষ্টি বিহ্বল।

দেখতে দেখতে ঐ বৃষ্টিতেই লোক জমে উঠেছিলো, কিন্তু তখুনি মল্লিকা আবার স্বাভাবিক ভাবে উঠে দাঁড়ালো।

সে আশৈশব মাতৃহীন। পিতার মনোযোগেই প্রতিপালিত। বলা যায় প্রবালের মা-ই তার মা। মল্লিকার বাবা আর প্রবালের বাবা কোনো এক সময়ে বোধ হয় সহপাঠী ছিলেন, দুজনের দেশই পূর্ববাংলায়। মল্লিকার বাবা আসেন দেশ বিভাগের কিছু পরে, প্রবালের বাবা বহুকাল প্রবাসী। মল্লিকাকে খুব ছোটো থেকেই, হয়তো বা মাতৃহীন বলেই শান্তিনিকেতনে বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়েছিলেন তারা বাবা। তিনি নিজে থাকতেন তাঁর চাকুরিস্থলে, কটকে।

প্রবালের বাবাই মল্লিকার লোকাল গার্জিয়ান ছিলেন, ছুটিতে সে বাড়িটাই ছিলো মল্লিকার বাড়ি। বাবা মাঝে মাঝে আসতেন। কখনো লম্বা ছুটি নিয়ে এসে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন মেয়ের সঙ্গে।

কাছে নিয়ে এলেন, একেবারে কলেজে পড়াতে। চেষ্টা চরিত্র করে নিজের চাকরিও কলকাতাতেই স্থায়ী করে নিয়েছেনে ততোদিনে। এবার প্রবাল হস্টেলে মল্লিকা বাড়িতে। এবার প্রবালের লোক্যাল গার্জিয়ান মল্লিকার বাবা।

ভবানীপুরের কোনো এক গলিতে একটি পুরোনো ফ্ল্যাটে তাদের বাড়ি। প্রবাল ট্যাক্সি করে তাকে সেখানেই নিয়ে এলো। মন খারাপ হয়ে গেছে তার। মল্লিকা লজ্জিত।

ঘটনার এটাই সূত্রপাত, তারপরেই দেখা গেল সে ক্রমশই কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছে। ভালো থাকতে থাকতে হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। সেটা যে কখন তাকে আক্রমণ করবে কিছুই স্থির নেই, হতে পারে পথে ঘাটে অথবা সিনেমা থিয়েটার বা বন্ধুর বাড়ি, আবার নিজের বাড়িতেও একা ঘরে হতে পারে।

সুখরঞ্জনবাবু, অর্থাৎ মল্লিকার বাবা, মেয়ের এই অবস্থা দেখে বলাই বাহুল্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ডাক্তার এলো, কবিরাজ এলো, হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি কিছুই বাদ রইলো না। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে অনেকের পরামর্শে এক তুখোড় তরুণ মনস্তত্ত্ববিদের চেম্বারে নিয়ে এলেন। যুবকটির ডিগ্রির ল্যাজ অনেক লম্বা, বিদেশে থেকেই পড়াশুনো করেছে, ফিরেছে অল্প দিন, খ্যাতি হয়েছে সেই তুলনায় খুব বেশি। নাম ডক্টর অনিন্দ্য চৌধুরী।

এম এ পাস করে মল্লিকা গবেষণা করছিলো, কাজ প্রায় সাঙ্গ করেও এনেছিলো, তারই মধ্যে এই অবস্থা। দেখতে দেখতে দেড় দুমাসে একেবারে পাল্টে গেল সব। এখন বেশির ভাগ সময়েই এক অদ্ভুত ভয়ের জগতে সে বাস করে, চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একেবারেই মেলামেশা করে না, সকলের প্রতিই তার অবিশ্বাস। কেবল একা থাকে, আর মাঝে মাঝেই শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে এমন চেঁচিয়ে ওঠে যে লোক জড়ো হয়ে যায়। বাঙালি মেয়ের তুলনায় অত্যন্ত বেশি ফর্সা গায়ের রং মলিন হয়ে গেছে, আয়ত চোখের কুচকুচে বুদ্ধিদীপ্ত তারাদুটি নিষ্প্রভ। ঈষৎ সজল বাঁকা ঠোঁট রঙহীন।

অনিন্দ্য চৌধুরী নামের এই খ্যাতিমান মনস্তত্ত্ববিদটির কাছে আসায়ও তার ঘোরতর আপত্তি ছিলো। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েই নিয়ে আসা হলো। প্রবাল এলো সঙ্গে। ঐ প্রবালকেই যা একটু বিশ্বাস। সুখরঞ্জনও এলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে। সন্ত্রস্ত পায়ে মল্লিকা যখন ভয়ে ভয়ে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলো, বৈশাখের লম্বা বেলা তখন যাই যাই। পশ্চিমের জানালা দিয়ে সূর্যাস্তের লাল আভা টেবিলে এসে আলো বিকিরণ করেছে। সেই আলো ডাক্তারের মাথায় চুলেও উপচে পড়েছে। তাকিয়ে মল্লিকার ভয় যেন একটু কমলো। বসলো চুপ চাপ শান্তভাবে।

অনিন্দ্য চৌধুরী সাধারণভাবেই শুরু করলো আলাপ।

'আপনি তো ইতিহাসে ডক্টরেট করছেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার শরীর খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'আমি কে আপনি তা নিশ্চয় জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন এসেছেন, তা-ও জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'আসতে চাননি কেন?'

'আমি কখনো কখনো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারি না।'

'এখন পারছেন?'

'অতি কষ্টে।'

'অতি কষ্টে কেন?'

'একটা ভয়ের ঢেউ সব সময়েই আমাকে ঘিরে থাকে।'

'আমি সারিয়ে দেব।'

'সারিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে বলুন কেন আমার এমন হলো? কেন আমি সব সময়ে এসব দেখি।'

'কী দেখেন?'

'স্বপ্ন নয়, সব জেগে জেগে দেখি। যখন দেখি আমার আর জ্ঞান থাকে না।'

'হ্যালিউসিনেশন।'

'যখন ভালো থাকি তখনও যেন সেই কষ্ট হাতুড়ি পিটতে থাকে বুকের মধ্যে।'

'ভয়ের ছবিটা আপনি কখন দেখেন?'

'কিছুই ঠিক নেই। তখন আমার বিন্দুতে সিন্ধু হয়। ছোট্ট একটা আওয়াজও ভয়ঙ্কর বজ্রের মতো মনে হতে থাকে। আমি তখনি বুঝতে পারি আসছে, আসছে—'

'কী আসছে?'

'সেই সব—'

'কী?'

'ঝড় বৃষ্টি নদী মৃত্যু হত্যা—উঃ—' মল্লিকা মাথা টিপে ধরলো।

'আপনি ছেলেবেলায় কোথায় ছিলেন?'

'আমি পাঁচ বছর বয়েস থেকে বোর্ডিংয়ে, তার আগের স্মৃতি বাবার সঙ্গে কটকে। অবশ্য কটকের কথা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, বলা যায় শোনা কথা।'

'বাবা সেখানে কী করতেন ?'

'ব্যাঙ্কে কাজ করতেন।'

'তখন মা ছিলেন ?'

'না। মাকে আমি দেখিনি, কিন্তু—কিন্তু—'

'কী।'

'তাঁকে আমি দেখতেই পাই, আমি বুঝতে পারি তিনি আমার মা।' এইখানে গলা কাঁপলো থর থর করে।

'তিনি যখন মারা যান আপনি তখন কতোটুকু ?'

'শুনেছি তিন বছরেরও কম।'

'কী হয়ে মারা যান তিনি ?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'আপনার জন্ম কোথায় জানেন ?'

'ঢাকা।'

'এই ভয়ের ছবি, আপনি প্রথম কবে দেখলেন মনে আছে ?'

'কিছুদিন আগেও ছিলো, এখন ক্রমশই সব ঝাপসা হয়ে আসছে। যে ছবিটা সব সময়েই খুব স্পষ্ট হয়ে লেগে থাকে চোখে, সেটা হচ্ছে একটা মস্ত বাড়ি।'

'তারপর ?'

'তারপর ? তারপর ?' এইখানে কপাল ঘেমে উঠলো, চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেল, সংযত হবার চেষ্টা করেও একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।

ডাক্তার তাকে তার নিজস্ব নার্সিং হোমে ভর্তি করে নিল। কেসটা খুব অভিনব বলে বোধ হলো।

দিন দশেক কেটে গেল। এর মধ্যে কথা বলে বলে মল্লিকার হৃদয় থেকে অনেক ছবিই নিস্কাষিত করতে পারলো অনিন্দ্য। ভয়ের ছবিগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে এমন একটি লোমহর্ষক ঘটনার গন্ধ পেলো যার জন্য ডাক্তারি বিভাগে না এসে গোয়েন্দা বিভাগে যাওয়াই শ্রেয় ছিলো বলে মনে হলো তার।

সুখরঞ্জনবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তো বলেছিলেন, আপনারা দেশ বিভাগের পরেই ঢাকা থেকে আসেন।'

'তখন আপনার মেয়ের বয়েস দু'বছর দশ মাস—ধরা যাক তিন বছর ছিলো, তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এসে প্রথমে কোনো ধনী বন্ধুর গৃহে অতিথি হন এবং তাঁরই চেষ্টায় কটকের চাকরিটা তখুনি পেয়ে যান হাতে হাতে—তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'বন্ধুটি কেমন ?'

'অতি সজ্জন, অতি চমৎকার।'

'তাঁর সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ হয় ?'

'বালিচকের জমিদার তিনি, অবশ্য বরাবরই কলকাতা প্রবাসী।'

ডাক্তারের ভুরু কুঁচকে গেল, 'বালিচকের জমিদার! কন্দর্পকান্তি রায়চৌধুরী?'

'চেনেন?'

'না, না, বলুন।' নড়েচড়ে বসলো সে।

'আমি তখন সেখানে স্কুল-মাস্টার ছিলাম, স্কুলটা ওঁদেরই। পরে ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দিই।'

'সেই সময়েই দেখাশুনো হতো?'

'হ্যাঁ। উনি কলকাতা প্রবাসী হলেও বছরে দু একবার গ্রামে আসতেন। আমাদের বাড়িতেও আসতেন। ব্যবহারে কখনো বোঝা যেতো না, ধনে দৌলতে আমি ওঁর সমকক্ষ নই। এবং ওঁর অধীনস্থ একজন মাস্টার মাত্র। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ ছিলো, অর্থাৎ বলা যায় উনি আমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু।'

'আপনি যখন প্রথম কটক যান আপনার স্ত্রী-কন্যা কোথায় ছিলেন? আপনার সঙ্গেই চলে গিয়েছিলেন?'

'না। আমি তো তখনো চাকরি পাইনি, ওনার চিঠি নিয়ে চলে গেছি। ঐ চিঠিতেই অবশ্য কাজ হলো। তারপর চাকরি পেয়ে জয়েন করে, বাড়ি ঠিক করে সাত দিন বাদেই আমি ফিরে এলাম ওদের নিয়ে যেতে।'

'তারপর?'

'এসে শুনলাম আমার স্ত্রী একদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে মেয়ে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু ফেরেননি।'

'আমাকে ঘটনাটা একটু বিশদভাবে বলবেন? আমি টুকে নেবো। দেখুন, এসব রোগীকে ভালো করা মানে অন্ধকার মাঠে একটি হারানো ছুঁচ খুঁজে বার করা। মনের তলা থেকে সব কিছু তুলে এনে খুলে না দেখানো পর্যন্ত এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা থেকে এঁরা কখনোই মুক্তি পান না। আপনার মেয়ে আমাকে তাঁর হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভাসের যে সব ভয়াবহ ছবির বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভীষণ। তাতে এতো দিনে ঘোর উন্মাদ হয়ে যাওয়াও কিছু অসম্ভব ছিলো না। সেই হিসেবে বলা যায় ওঁর মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল। চৈতন্যের এই প্রাবল্যেই অচৈতন্যের ধাক্কাগুলো বারে বারে প্রতিহত করতে সাহায্য করছে। উনি কোনো নদীর ধারে কোনো অট্টালিকার একটি নিখুঁত ছবি দেখতে পান, এবং সমস্ত ঘটনাই সে বাড়িকে কেন্দ্র করে। এরকম কোনো বাড়িতে কি আপনি কখনো ওকে নিয়ে গিয়েছেন?'

'না তো।'

'ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে কটক, কটক থেকে শান্তিনিকেতন—এই হচ্ছে ওঁর দেশভ্রমণের সম্পূর্ণ তালিকা, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'আচ্ছা ঐ ভদ্রলোক এখন কোথায় থাকেন?'

'কে?'

'আপনার সেই ধনী বন্ধু? কন্দর্পকান্তি রায়চৌধুরী?'

'যদ্দূর জানি, দিল্লী।'

'তাঁর কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই?' কলকাতার বাড়ি কি ওঁর নিজের বাড়ি ছিলো না?'

'ছিলো। পরে উনি বিক্রি করে ফ্যালেন।'

'আপনি কটক থেকে ফিরে এসে কী শুনলেন আবার বলবেন?'

'আমি যেদিন স্ত্রী কন্যাকে রেখে কটক গেলাম উনিও সেদিন দিল্লী গেলেন। আমি ফিরে আসার দুদিন আগে উনি ফিরেছেন, ফিরে এসে আমার মতোই দেখেন সুজাতা নিখোঁজ। তখন তিনি সারা শহর তোলপাড় করে শেষে মিসিং স্কোয়াড থেকে উদ্ধার করলেন মেয়েকে, কিন্তু মাকে পাওয়া গেল না। তাঁর অনুমান গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে।'

'উনি যখন দিল্লীতে যান, বাড়িতে আপনার স্ত্রী কন্যা ছাড়া আর কে ছিলো?'

'ছিলো তো অনেকেই, তবে সবই বাইরের। উনি রাজনীতির লোক, তার উপরে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কারবার, তাদেরই আধিপত্য সেখানে। কে আর কাকে খেয়াল করে?'

'বিবাহ করেননি?'

'করেছিলেন। জমিদারের ছেলে, কোন বাল্য বয়সে ঢাকঢোল বাজিয়ে বাজি বন্দুক ছুটিয়ে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর কী কারণে জানি না সে বিয়ে টেকেনি। মনে হয় অভিভাবক অভিভাবকেই মনোমালিন্য, সেসব দিনের গ্রাম্য ব্যাপার আর কি। উনি তারপর থেকেই বলা যায় দেশান্তরী। দেশান্তরীও, দেশের কাজ নিয়েও মত্ত—

'ওঁর ঠিকানাটা সংগ্রহ করে দিতে পারেন? কদ্দিন দেখা হয় না?'

'ঐ সেই সময় থেকেই। ধরুন কুড়ি একুশ বছর। উনি যে কোথায়, কিছুই জানি না। কাগজে ওঁর নামটাম অনেক দিন দেখি না। রাজনীতির উত্থান পতন এই রকমই।'

'ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। এসব ছবির উনি হয়তো কিছু হদিস দিতে পারেন।'

'কিন্তু এ ছবি তো ও নতুন বলছে, মাস কয়েক আগেও তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিলো।'

'কোন অকস্মাৎ আঘাতেই এর উদ্ভব। তার রুটটাই আমি উপড়ে দিতে চাই।'

'ঠিক আছে, ভদ্রলোক কোথায় আছেন অবশ্যই খোঁজ করবো। যদ্দূর মনে হয়, দিল্লীতেই সেট্‌ল করেছেন।'

আরো কিছু দিন কাটল। এর মধ্যে সুখরঞ্জনবাবু দু'চারজন পুরোনো চেনা মানুষের বাড়ি ঘোরাঘুরি করলেন। সেই ধনী ব্যক্তিটির ঠিকানা বার করা বেশি কঠিন হলো না। এখনো অনেকেই চেনে তাঁকে অনেকেই জানে। সুখরঞ্জনবাবু বহুদিন কটকবাসী থাকায় সংশ্রবচ্যুত হয়ে পড়েছেন সব কিছু থেকে। নইলে রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে এই যোদ্ধাটিকে হারিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। তবে শোনা গেল, এবার তিনি অবসর জীবন যাপনে বদ্ধপরিকর হয়ে কিছুকাল যাবৎ কলকাতা ফিরে এসেছেন দিল্লী থেকে। আসলে অবসর তিনি আগেই নিয়েছেন, কেননা, এখন ঠিক দিল্লী থেকেও আসছেন না, আসছেন হরিদ্বার থেকে। পুরোনো বালিগঞ্জে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। এতোকাল বাদে আবার সুখরঞ্জনবাবু ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। কতো পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। কতো পুরোনো স্মৃতি। সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে কতো সুখ, কতো রোমাঞ্চ! কন্যা নিয়ে কতো বাৎসল্য! হায়! কোথায় গেল সে সব দিন। কোথায় গেল সে সব সুখ।

দেখা হতে দু-জনের চোখেই জল এসে গেল। ভদ্রলোক বয়সের চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন, সারা দেহে ব্যাধির মন্দির। ঈশ্বর তাঁকে কেন নিচ্ছেন না। এই দুঃখে চোখের

জল সশব্দ রোদনে পর্যবসিত হলো। বললেন, সুখরঞ্জন, আমার অনেক পাপ আছে, সেই পাপের জন্যই তিনি আমাকে স্পর্শ করছেন না। তুমি আমাকে নিয়ে চলো তোমার ডাক্তারের কাছে।'

সুখরঞ্জন বললেন, 'কিন্তু আপনার এই অবস্থায়—'

'তাতে কিছু হবে না। আমি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যা চাই তা হচ্ছে তোমার কন্যার স্বাভাবিকত্ব। ডাক্তার যদি বলে থাকেন, রহস্য উন্মোচিত হলেই তার অবচেতন তার চেতনাকে আর আঘাত করতে পারবে না তা হলে সেই রহস্য অবশ্যই আমি উন্মোচিত করবো।'

সুখরঞ্জন অতি দুঃখে হাসলেন, 'উন্মোচনের যতটুকু শক্তি আমার নিজের আছে, আপনার তো আর তার চেয়ে বেশি কিছু নেই।'

'না, তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, সুখরঞ্জন, তোমার জীবন আমার দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিলো। আমার এখানে না উঠলে—'

'এটা আপনি কী বলছেন। আমার স্ত্রী নাবালিকা ছিলেন না, তিনি আমার এবং আপনার অনুপস্থিতিতেই হারিয়ে যান। এরকম যানবাহন কণ্টকিত শহরে চলাফেরা তো তাঁর অভ্যাস ছিলো না। অথচ এসে থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, কে তাঁর মাসতুতো ভাই আছে ভবানীপুরে, সেখানে যাবেন। ঠিকানাও ছিলো সঙ্গে। আমি ভেবেছিলাম একদিন যাবো, হয়ে ওঠেনি। মনে হয় একাই সেখানে যাবার চেষ্টা করে এভাবে আমাদের সকলকে কষ্ট দিলেন। এই মেয়েকেও কি আমি আপনার প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্থ-শ্রম মনোযোগ এ সবের বিনিময় ছাড়া কখনো খুঁজে বার করতে পারতাম ? কিন্তু আজ—আজ আবার কেন এমন হলো ! হা ভগবান !' দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

তারিখ ঠিক হলো সাক্ষাৎকারের। নির্দিষ্ট দিনে চেম্বারে এসে অপেক্ষাগৃহে বসলেন বালিচকের জমিদার কন্দর্পকান্তি রায়চৌধুরী। ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বললেন, 'খ্রীস্টান ধর্মে আছে পুরোহিতের কাছে সমস্ত স্বীকার করলে তিনি তাকে ত্রাণ করেন, তুমি আমার পুরোহিত হও, আমাকে এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।'

তীক্ষ্ণ মেধাবী ডাক্তার তির্যক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাড়িটা আমি দেখে এসেছি, বোধ হয় আপনারই বাড়ি সেটা।'

কন্দর্পকান্তি মাথা নিচু করে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আমি বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে গিয়েছিলাম। কয়েকটা প্রশ্ন করবো, আপনি তার যথাযথ জবাব দিন।'

'তোমায় প্রশ্ন করতে হবে না, আমি আমার প্রাণের দায়েই সমস্ত ঘটনার সঠিক বিবৃতি দেব। কিন্তু তার আগে একটি বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আমি মিটিয়ে নিতে চাই।'

'বলুন।'

'একটি তিন বছরের শিশুর স্মৃতি কতো দূর পর্যন্ত যেতে পারে।'

স্মৃতি মুছে যায় না, স্মৃতি থাকে। মাথা খুলে দেখা গেলে স্মৃতির মৃত্যু নেই। কারেণ্ট থাকলে একটি বৈদ্যুতিক তার ছোঁওয়ালেই যেমন নির্দিষ্ট কক্ষে আলো চমকে ওঠে, এ-ও তেমনি। আমরা যা ভুলে যাই তা জমা হয়ে থাকে সেই অতল অন্ধকারে, দৈবাৎ কোনো ভয়ঙ্কর ধাক্কায় যদি কখনো তা উৎক্ষিপ্ত হয় তবে সেই উৎক্ষেপ সহ্য করা কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য স্মৃতির চরিত্রভেদেই এসব ঘটে থাকে।

আমরা মনের গভীরে নেমে ডুবুরির মতো সেই কারণটাকে খুঁজি। মস্ত দেহে একটি

বিষাক্ত ফোঁড়া যেমন প্রাণহানিকর হতে পারে, ঐ স্মৃতির স্বরূপটি খুঁজে বার করতে না পারলেও তেমনই হানিকর হয়ে ওঠে।

কন্দর্পকান্তি মুমূর্ষু ভঙ্গিতে চেয়ারে মাথা এলিয়ে রেখে বললেন, 'তা হলে শোনো'।

'বলুন।'

'এই মেয়ে যে সব ভীষণ দৃশ্যের উদ্ভাস দেখতে দেখতে প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে সব স্মৃতি তার পূর্বজন্মের নয়, এই জন্মেরই। এবং তা আগুনের মতো সত্য। জলের মতো সত্য। চন্দ্র সূর্যের মতো সত্য। একুশ বছর যাবৎ সেই স্মৃতি আমাকেও পিশাচের মতো তাড়া করে ফিরছে। আমি পাগল হইনি, তার কারণ—পাগলের জ্ঞান থাকে না আর জ্ঞান না থাকলে কষ্ট কোথায় ? ঈশ্বর তাই আমাকে জ্ঞান শূন্য করেননি। সজ্ঞানে শলাকাবিদ্ধ করছেন। আমার শয়নে সুখ নেই, স্বপনে সুখ নেই। আহারে বিহারে ধনে দৌলতে খ্যাতিতে সর্বত্রই আমার বৃশ্চিক দংশন। সর্বক্ষণ এক তীব্রত্রাসে শিহরিত হয়ে আমার দিন কাটে! আমি সেই দিনটির কথা ভাবি, যেদিন আমি আর সুখরঞ্জন একসঙ্গে কলকাতা থেকে বেরুচ্ছিলাম সে যাচ্ছিলো কটকে, আমি দিল্লী। জানো বোধ হয় আমার পৈত্রিক বিত্ত বেশ উল্লেখযোগ্য রকমই বেশি ছিলো। আমি একমাত্র সন্তান। সুতরাং আদরেই মানুষ। স্বেচ্ছাচারেও অভ্যস্ত। একটি সুন্দরী সমপর্যায়ের কন্যার সঙ্গে আমার যোল বছর বয়সে বিবাহ হয়। তেইশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে, পঁচিশ বছরে মা। বাবার মৃত্যুর পরেই হঠাৎ লায়েক হয়ে উঠি। এতো বড় সম্পত্তির একলা মালিক আমি, তখনি দেশ গাঁ ছেড়ে কলকাতা এসে মহানগরের স্বাদ গ্রহণে দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গিয়েছিলো, কূপমণ্ডুক হয়ে আর দেশে থাকবো না স্থির করেছিলাম। মায়ের মৃত্যুতে সব বাধাই চুকে গেল, স্ত্রীকে ত্যাগ করে সেই বাধাও অচিরেই চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমি স্বাধীনতার পূর্বযুগের আদর্শবাদী রাজনীতিক নই, তার পরের দলগত কোন্দলের অসার নেতা। আমি সিংহাসনে বসে গরিবদের দুঃখে অশ্রুপাত করতে করতে রাজভোগ খাই।

যদ্দিন পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়নি, বছরে এক-আধবার দেশে যেতে হয়েছে টাকা পয়সা আদায়ের জন্য। সেই সময়ে একবার গিয়ে আলাপ হলো সুখরঞ্জনের সঙ্গে, আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সে সেকেন্ড মাস্টার। সমাজসেবী, সৎ লোক, ইস্কুল মাস্টারিও তারই একটা অঙ্গ। পরে অবশ্য চলে গেল ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে।

এসব সমাজসেবা তখন প্রায় সব যুবকেরই প্রথম জীবনের আদর্শ প্রকাশ, সংসারে ঢুকলে অভাবের তাড়নায় তা তিরোহিত হতেও দেরি লাগতো না। পুজোর সময় গিয়েছিলাম, মণ্ডপে তার স্ত্রীকেও দেখলাম। যৌবনে পা দিতে দিতে আমার চরিত্রে অনেকগুলো দোষই খুব প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিলো। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা এসব বৃত্তি বেশ ভালোভাবেই জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো এবং পরবর্তী জীবনে রাজনীতির ক্ষেত্রে এর দ্বারাই আমি জমি চষেছিলাম। আমার খ্যাতি প্রতিপত্তির আসল ভিত্তিই ছিলো এইসব। তার আগে পর্যন্ত মনুষ্যত্ব নামক ছিটেফোঁটা কিছু অন্তত অবশিষ্ট ছিল মনের মধ্যে।

সুখরঞ্জনের স্ত্রীকে দেখে আমি তখনি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সৌন্দর্যের জন্য নয়, তার শিক্ষা সহবৎ আচরণ সবই আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। সুখরঞ্জনকেও ভালো লেগেছিলো। কিন্তু তার স্ত্রীর প্রতি মোহান্ধ না হলে ঠিক ঐ ধরনের বন্ধুতা সম্ভব হতো কি না জানি না। অন্তত তার বাড়ি বেড়াতে যেতাম না নিশ্চয়ই।

তবে এটা বলতে পারি আর যে দোষই থাকুক, স্ত্রীলোক সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি

তেমন দুর্ধর্ষ নই। পরের বউ-ঝিদের উপর নজর দেবো এমন দুর্মতি কখনোই হয়নি। সুজাতাকেও আমি তখন সেভাবে দেখিনি। তবে নেশা একটু ধরেছিলো। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা ফিরে আসি, তারপর অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে ভুলেও যাই। যখন আবার গেলাম তখন তারা ঢাকায়। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। সচ্ছল সংসার। সুখে আছে। আমি তাদের অতিথি হয়ে দশদিন কাটালাম, ইন্ধন বাড়লো। দেশ ভাগ হবে বুঝেছিলাম, তখনি কলকাতা চলে আসতে বলেছিলাম আমার সঙ্গে, তারা আসেনি। যখন এলো প্রায় সর্বহারা। আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। প্রথম খেপে তো আসেনি, এসেছিল দেশ ভাগ হবার বছর খানেক বাদে টিকতে না পেরে। ততোদিনে আমি কখন যেন এক লাফে রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠেছি। কিছু না করেই আলিপুরের মস্ত বাড়ির জোরে দাদা। সেখানে থেকেই খদ্দরের ধুতি চাদর পরে ময়দানে গিয়ে নেতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে সভা মাত করি। আমি রিফিউজিদের পক্ষই নিয়েছিলাম তখন কেননা খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হবার সেটাই ছিল সবচেয়ে সহজ উপায়। তাদের উসকানি দিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়ে রাখাই ছিলো আমার আসল কাজ। রাজনীতির এইসব ফন্দিফিকির ষড়যন্ত্র করতে করতে ছিলাম এক রকম, সুজাতাকে দেখে আবার আমার মাথা ঘুরে গেল।

সৎবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই সুখরঞ্জনের চাকরির চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যতোই করি যাই করি সুজাতার প্রতি আসক্তি আমাকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলো। আমার লোভ লেলিহান হয়ে উঠেছিলো। স্বামীর জন্য সুজাতার ব্যাকুলতা আমার একটুও ভালো লাগতো না। আমি ঈর্ষার কামড়ে ছটফট করতাম। দিল্লী যাবার দিন আমি ওদের চুম্বনরত অবস্থায় দেখে ফেলেছিলাম পর্দার ফাঁকে। সেদিন সুখরঞ্জন কটক যাচ্ছে বলে সুজাতার মন ভালো ছিলো না। তখনি হিংসার আগুন আমার সারা দেহে মনে ছড়িয়ে পড়লো। আমি সুখরঞ্জনকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলাম।

আমি যার প্রতিদ্বন্দ্বী হবো সে কি ঐ লোকটা? যার কানাকড়ি সম্বল নেই? জেদ চাপলো, আমি বদ্ধপরিকর হলাম একটা অন্যায় করতে। দিল্লী যাবো বলে বেরিয়েও সেদিন আমি দিল্লী না গিয়ে গেলাম আমার সদ্যক্রীত একটি বাগানবাড়িতে। বগুড়ার নবাব বংশোদ্ভূত একটি ধনী-ব্যক্তি আমার দেশের বাড়ির সঙ্গে এটি বিনিময় করেন। আঠারো বিঘা জমি সংবলিত ফলবাগিচা ফুলবাগিচা নিয়ে দোতলা বাড়িটি দেখার যোগ্য। দেখে তো এসেছো। ইটালিয়ান মার্বেলের নারীমূর্তি পদ্মমুখ সিংহমুখ ফোয়ারা ইত্যাদি ভাস্কর্যের সব উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাড়িটি সাজানো ছিল, সেই অবস্থাতেই নবাব হায়দার আলি সাহেব এই উদ্যানবাটিকা আমাকে হস্তান্তরিত করেন। সেই রাত্রে আমি সেই বাড়িতেই বাস করি।

বাড়িটির আসল সৌন্দর্য দোতলাটা সম্পূর্ণ সামনে রেখে, পিছনে কয়েক স্টেপ উপরে উঠে প্রায় তেতলায় জলসাঘরটি। আমি নিজেই সেই ঘরটিতে দাঁড়িয়ে সেদিন চমৎকৃত হয়ে গেলাম। আমরাও তো জমিদার, আমাদের অট্টালিকাও কম বিরাট নয়, কিন্তু মুসলমানদের মতো এই বিলাসিতার ধারণা আমাদের হিন্দু মগজে কোথাও নেই। আমি তখুনি ঠিক করলাম এইসব দেখিয়ে সুজাতাকে বশ করতে হবে। বাড়ি ফিরে গেলাম পরদিন বিকেলে। আমাকে দেখে সুজাতা অবাক হয়ে বললো, 'আপনি!' আমি বললাম, 'গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে ট্রাঙ্কল, জরুরী মিটিং, প্লেন ধরে ফিরে এলাম।'

'ঈশ্! কী মজা আপনাদের। আর এই যে আমরা চার দেওয়ালের মধ্যে বসে আছি তো আছিই।'

'যাবেন বেড়াতে ? চলুন নিয়ে যাই।'

'না না, এখন কোথায় যাবো ?'

'চলুন না। সুখরঞ্জন নেই, একা একা কী করবেন ? আমারও এই মুহূর্তে কাজ নেই কোনো, কলকাতা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনি আপনাকে।'

আরো একটু সাধতেই সে রাজি হয়ে সেজে এলো। আমি নিজেই ড্রাইভ করে তাকে আর তার মেয়েকে পাশে বসিয়ে শহর পার হলাম। সে অবাক হয়ে বললো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?' আমি বললাম, 'শহরের বাইরে একটা বাড়ি কিনেছি প্রথমে সেটা দেখবেন চলুন। সে সরল বিশ্বাসে হাওয়া খেতে খেতে খুশি মনে চলে এলো সেই বাগানবাড়িতে গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে একেবারে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ালাম। ঘরে ঢুকেই মস্ত দরজাটা লক করে দিয়ে তাকে নিয়ে উঠে এলাম দোতলায়। হঠাৎ সে ভয় পেয়ে বললো, 'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন।'

'আমার হৃদয়ে !' এই বলে আমি সুখরঞ্জন কাল যেমন করে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেছিলো, তেমন করে চুম্বন করতে উদ্যত হলাম। সে ছিটকে দিকবিদিকহারা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলো।

পুঙখানুপুঙখ বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই, সে সব তুমি বুঝে নিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে তেতলার জলসাঘরে এনে বন্দী করলাম। আমার মতো একজন ছ' ফুট লম্বা মাংস ঘি দুধ খাওয়া সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পেরে ওঠা সুজাতার মতো নরম কোমল পেলব মেয়ের পক্ষে সম্ভবই নয়। সুতরাং সাময়িক ভাবে কামনায় উন্মত্ত দেহকে আমি অনেকক্ষণ ধরে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হলাম, এবং আমার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে সে এতোটাই শ্রান্ত হলো যে এক সময়ে লক্ষ করলাম তার জ্ঞান নেই।

সঙ্গে যে একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সে যে এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে দেখতে সমানে কাঁদছিলো, ঠেলছিলো, মারছিলো, কামড়াচ্ছিলো, সেটা অনুধাবন করার মতো চৈতন্য ছিলো না আমার। আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ধুতি আন্ড্যারওয়্যার কুড়িয়ে পরে নিলাম। সুজাতাকেও ঢেকে দিলাম। বাচ্চাটাকে চোখ পাকিয়ে বললাম, 'চুপ আর একবার কেঁদে উঠেছ কি গলা টিপে মেরে ফেলবো।'

ঘামছিলাম গল গল করে, সিঁড়ি নেমে দোতলার ছাতে এলাম। দেখলাম নক্ষত্রখচিত যে আকাশ দেখে ঘরে ঢুকেছিলাম, সে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছিলো।

বৃষ্টি নামলো। সেই বৃষ্টিতেই ছাদে আকাশের তলায় ভূতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মেয়ে বুকে নিয়ে সুজাতা কখন নেমে এসেছে, তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে। কোনদিকে যাচ্ছে তা জানে না। আমি গিয়ে আটকালাম, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'শয়তান' বলে মেয়েকে নামিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপর, খাবলে আমার বুকের মাংস ছিঁড়ে নিল। বুড়ো নখে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আমার টুঁটি চেপে ধরলো। একটা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর কবলে পড়ে প্রথমটায় আমি হকচকিয়ে গেলাম, তারপরেই ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে, বসে পড়ে তার পা জড়িয়ে ধরলাম, 'আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।'

যতোক্ষণ আমি কপাল কুটে কেঁদে এই কথা বলছিলাম, ততোক্ষণে সে গিয়ে কার্নিশের উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লো।

আকাশে তেমনই বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, মেঘ ডাকতে লাগলো, বৃষ্টি পড়তে লাগলো, বাচ্চাটা পরিত্রাহি কাঁদতে লাগলো, আমি দৌড়ে গিয়ে সুজাতাকে পাঁজা কোলে করে উপরে নিয়ে এলাম।

তখনো জীবিত ছিলো, মুখের দুই কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল। ঘড়িতে দেখলাম, একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। এবার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে আমার ভয়ের সিরসিরানি নামলো। কী করবো ভেবে পেলাম না। কৃত পাপের দিকে তাকিয়ে আমারও আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু তার বদলে সুজাতার মৃতদেহ নিয়ে আমি গঙ্গাতীরে এলাম, বুদ্ধি করে গলায় দুটো ইট বেঁধে দিয়ে টেনে টেনে গভীর জলে ডুবিয়ে দিলাম।

আর তারপর নিজেকে নির্দোষ সাজাতে যা যা বলেছি, করেছি সবই তোমার শোনা আছে। মিসিং স্কোয়াড থেকে মেয়ে উদ্ধার করেছি বলাটাও যতো মিথ্যা, তার মাকে দিল্লী থেকে ফিরে এসে দেখিনি বলাটাও ততোই মিথ্যা। তারপরেই আমি কলকাতা ছাড়ি, বাড়ি বিক্রি করি, জলসাঘরের সেই মর্মান্তিক ঘটনা ভুলে যাবার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখন এতোদিন বাদে সেই নদীতীরের বাড়িটিকে আবার দেখার জন্য সেখানে সেই ঘরেই প্রাণত্যাগ করবার বাসনায় ফিরে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমার একটি ছেলে আছে আমার বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভের, আমি তাকেও একবার দেখতে চাই, সম্ভব হলে তার মাকেও। শুনেছি আমার দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে অপমানবোধে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে তিনি আমাকে সম্পূর্ণ ভাবেই বর্জন করেছিলেন এবং ছেলেকে অতি যত্নে মানুষ করেছেন। জানি না তারা কোথায়, জানলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যেতাম।'

স্বীকৃতি শেষ করে কন্দর্পকান্তি দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তারের দিকে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসে বললেন, 'এখন আমাকে হাতকড়া পরাও, পুলিশে খবর দাও, আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে চাই।' বলতে বলতে চোখের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে উঠলো। ঠোঁটের উপর দাঁত আটকে গেল, হাতের মধ্যে হাত শক্ত হলো, চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের গহন মনের জট ছাড়ানোই অনিন্দ্যর কাজ, এই কর্মে পুরোমাত্রায় পারদর্শী বলেই সে বিখ্যাত। গল্পের অনেকটাই মল্লিকার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে টেনে বার করতে সক্ষম হয়েছিলো, কিন্তু বাকিটুকুর জন্য সে এই ব্যক্তির মুখে এই স্বীকারোক্তি শুনতে হবে তা কখনো ভাবেনি।

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকতে থাকতে প্রথমে লোকটাকে সত্যিই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে ইচ্ছে করলো, তারপর করুণা হলো, তারপর অদ্ভুত এক মমত্ববোধে আক্রান্ত হয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

যে পিতাকে সে জন্মাবধি কখনো দেখেনি, দেখার বাসনা হয়নি যে পিতা তার মাকে, তিন মাস গর্ভবতী অবস্থায় শুধু খেয়ালবশত অকারণে পরিত্যাগ করেছিলো, সে পিতাকে এ যাবৎকাল শুধু ঘৃণাই করে এসেছে, তার জন্যে এই মমত্ববোধে কাতর হলো কেন সেটা অনুধাবন করেও কম স্তম্ভিত হলো না।

চার মাস সাড়ে চার মাস যাবৎ মল্লিকা অনিন্দ্যর চিকিৎসাধীনে আছে। প্রথম দু মাস কিছুটা বাড়াবাড়ি অবস্থায় তাকে সব সময়েই নজরে রাখবার জন্য নার্সিং হোমেই রেখেছিলো। সেই অস্বাভাবিক অবস্থার সময়ে অবিরত তার উপর নির্ভর করতে করতে

মল্লিকা কখন যে অজানিতভাবেই তার অনুরাগী হয়ে উঠেছে বোধ হয় মল্লিকা নিজেও জানে না। চিকিৎসার অন্তর্গত বলে সস্নেহে সকৌতুকে সেই অবুঝ মনের সমস্ত আবদার অত্যাচার পালন করতে করতে অনিন্দ্যও যে কখন সম্পর্কের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে তাও বলা কঠিন। এখন মল্লিকা প্রায় পনেরো আনাই সুস্থ, তবুও যেটুকু অন্ধকার দলা পাকিয়ে আছে বুকের মধ্যে, সেটুকু উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যেই এই কন্দর্পকান্তি নামক ব্যক্তিটিকে সে আহ্বান করেছিলো। নাকি কিছুটা কৌতূহলও ছিলো জন্মদাতাটিকে একবার সশরীরে দেখবার ? কে জানে !

মল্লিকা এখন নার্সিং হোমে নেই, মাসে চারদিন সিটিংয়ে আসে। সুখরঞ্জনবাবু একদিন সাশ্রুনয়নে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার একটাই সন্তান, ওকে নিয়ে আমি সব দুঃখ ভুলে থেকেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওর জীবনও আমার মতোই অভিশপ্ত।'

অনিন্দ্য বলেছিলো, 'কেন ?'

সুখরঞ্জনবাবু ধরা গলায় বলেছিলেন, 'এতোদিন পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে, এবার আমি একটি পাত্রকে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছিলাম, বলেছিলাম, তুমি নিজে যখন কাউকে মনোনয়ন করলে না, আমার মনোনীতটিকে একবার বিবেচনা কর। ছেলেটিকে ও চেনে। তার মধ্যেই এই। এখন এই পাগল মেয়েকে বিয়ে করতে কি কেউ রাজি হবে ?'

অনিন্দ্য ভুরু কুঁচকে বললো, 'পাগল ! এ কী শব্দ আপনি ব্যবহার করছেন ? একটা সংঘাত চলছিলো মনের ভিতরে, সে তো এখন উচ্ছিন্নই প্রায়।'

তিনি বললেন, 'তুমি ডাক্তার, তুমি সবই বোঝো, কিন্তু সাধারণ লোকে তা বুঝবে না।'

এবার অনিন্দ্য তার মনের ছোট্ট একটি সংশয়ের দংশন উদগার করলো, 'কেন, প্রবালবাবু যথেষ্ট শিক্ষিত, যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তিনি পূর্বাপর সব জানেন—'

'প্রবাল ? প্রবালের সঙ্গে বিয়ে হবে কী ? ওরা তো বলতে গেলে পিঠোপিঠি ভাই বোনের মতো মানুষ হয়েছে ছোটো থেকে।'

তৎক্ষণাৎ অনিন্দ্যর হৃদয়ে একটা আরাম ছড়িয়ে পড়লো, খুশি মনে বললো, 'না না, ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না, ভাববার কোনোই কারণ নেই।'

সুখরঞ্জনবাবু একথার কী অর্থ করলেন কে জানে, তার নিজের মনে একটা অর্থ স্থির হয়ে রইলো। কিন্তু এই পিতার সন্তান হয়ে সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকা আর কি তার পক্ষে সম্ভব ? ঘটনাটা জানলে খুনীর পুত্র হিসেবে মল্লিকার তো তাকেই খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করবে। এমন হতেই বা বাধা কী যার প্রতি সে এতো দুর্বল, যাকে সে এই মুহূর্তে জগতের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বলে মনে করে, যখন জানবে সে-ই সবচেয়ে বড়ো শত্রু, সেই আঘাতে ঘোরতর উন্মাদ হয়েও যেতে পারে।

তবে সে কী করবে ? বলবে ? না, বলবে না ? বলবে ? না, বলবে না ? ভাবতে ভাবতে রাতগুলো তার বিনিদ্র হয়ে উঠলো, দিন অশান্ত হলো। এতোকাল এতো রোগীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসে শেষে সে নিজেই সেই অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলো।

যেদিন মল্লিকা আবার সিটিংয়ে এলো, হাসি মুখে 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা করেও বুকের মধ্যে প্রায় হাতুড়ির বাড়ি পড়লো যেন।

ডাক্তারসুলভ ভঙ্গিতে গলায় যথেষ্ট দায়িত্বের সুর এনে বললো, 'বলুন, কেমন আছেন ?'

মল্লিকা বললো, 'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'এই চলছে। কী করলেন এ কয়দিন?'

'একটা কাণ্ড হলো।'

'কী?'

'বাবার সেই বন্ধু, কন্দর্পকান্তি, তাঁকে দেখে আমি সেদিন প্রায় ফিট হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম।'

বুকটা ছাঁৎ করে উঠলে, ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললো, 'ভয় পেলেন? চেনা চেনা লাগলো?'

'ভীষণ। দুই অর্থেই ভীষণ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই যে সেদিন অসুস্থ হন, ভদ্রলোক তারপর নাকি আর বিছানা ছাড়তে পারেননি। বাবা বললেন, চল্, দেখে আসবি একবার, কখনো তো দেখিসনি, জানিস না তো কতো বড়ো বন্ধু আমার।'

অনিন্দ্য ঢোঁক গিললো।

'কিন্তু ঢুকেই আমি আঁতকে উঠলাম, আগের অবস্থা থাকলে সত্যিই একটা কাণ্ড করে ফেলতাম। তারপর ছল ছুতো করে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে, অভদ্রের মতো সোজা বাড়ি। বাড়ি এসেও ভয় কমে না। অথচ ভদ্রলোক কী সুন্দর দেখতে, আমাকে একজোড়া হীরের বালা পাঠিয়ে দিয়েছেন স্নেহের নিদর্শন হিসেবে। কী বলবো আপনাকে, সেই বালা দেখলে আমি সাপ দেখার চেয়েও বেশি আঁতকে উঠি। বাবা খুব দুঃখ পান। কিন্তু আমি কী করবো বলুন। আমি কিছুতেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না।'

অনিন্দ্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো, মাথার চুল টেনে টেনে এলোমেলো করে ফেললো, তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললো, 'আমি মনের ডাক্তার, মন নিয়েই আমার কারবার, সেই অরণ্যে কে কখন পথ হারায়, কেউ জানে না। সেই অরণ্য ঈশ্বরেরই তৈরি। তিনিই একমাত্র অধিপতি। ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া তাও তাঁর হাতে। আমরা পুতুল মাত্র। যদি সেই ব্যক্তি সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে যিনি শিক্ষা দেবার তিনিই যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, এখন ধুয়ে মুছিয়ে কোলে নেবার সময় এসেছে, আমি কেন, আর সেই পথ কণ্টকিত করবো?'

অবাক হয়ে মল্লিকা বললো, 'আপনি কি বলছেন?'

স্থির চোখে মল্লিকাকে দেখতে দেখতে অনিন্দ্য সচেতন হয়ে বললো, 'মানুষকে সুস্থ করে তোলাই আমার ধর্ম, কোনো কারণেই তাদের আমি কষ্ট দিতে পারি না।'

'জানি।'

'তাঁকেও নয় যিনি এ সমস্ত ঘটনার মূল কারণ।'

'কার কথা বলছেন?'

'আপনাদেরও নয়, যারা এক ধরনের শাস্তিতে পৌঁছে গেছেন।'

'আজ আপনাকে খুব অন্যমনস্ক লাগছে। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শুনুন, যে বাড়িটায় আপনারা পিকনিক করতে গিয়েছিলেন, এই কন্দর্পকান্তিই সেই বাড়ির মালিক।'

'অ্যাঁ।'

'আপনার বিভীষিকা সেই বাড়ি আর এই ভদ্রলোক থেকেই উদ্ভূত।'

'অ্যাঁ!'

'আপনার মার সেখানেই মৃত্যু ঘটে।'

'কী বললেন ?'

'আপনার বাবা কটক থেকে ফিরবার আগেই ইনি দিল্লী থেকে ফিরে এসেছিলে তা আপনি জানেন। সেই সময়ে আপনার বাবার জন্য আপনার মার মন খুব খার দেখে উনি আপনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন। বললেন চলুন গঙ্গার ধারে একটি বা কিনেছি, আপনাকে দেখিয়ে আনি। বলে এই বাড়িতে নিয়ে এলেন। বেলাবেলিই গিয়েছিলে বেলাবেলিই ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ ভয়ানক ঝড় বাদল শুরু হওয়ায় আট পড়েন। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে আসে। যে তেতলার ঘরটিতে আপনি সমস্ত বিপ পুঞ্জীভূত দেখতে পান, সেই ঘরটিতেই ওঁরা বসেছিলেন। বিশাল একটি হল, যে রক আপনি বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক সেই রকম। বৃষ্টি আর থামে না, বাজ পড়তে থাকে, বিদ্ চমকাতে থাকে, ঘরে আলো নেই, আপনি ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকেন। তখন আপন মা বলেন চলুন ভিজেই চলে যাই। একেই পড়ে থাকা একটি অসংস্কৃত অট্টালিকা, ত উপরে বৃষ্টি বাদল অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে নিচে এসে দরজা খুলে উঠোনে নামতেই আপন মাকে সাপে কাটে। তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক তাকে পাঁজাকোলে করে তুলে ঘরের মধ্যে নি গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে শক্ত করে বেঁধে দেন জায়গাটা যাতে বিষ ছড়াতে না পারে। তারপ উপায়ন্তরহীন হয়ে ঐ একা অন্ধকারেই আপনাদের রেখে গাড়ি নিয়ে আশেপাশের শহ ডাক্তার খুঁজতে বেরোন, বলাই বাহুল্য ঐ ঝড়ে জলে কাউকেই পাওয়া যায় না। তখ ফিরে এসে আবার পাঁজা কোলে করে গাড়িতে তুলে, নিকটতম হাসপাতালে নিয়ে আসে আপনি সমানেই কাঁদছিলেন, ঐ ভদ্রলোককেই ঘাতক ভেবে আঁচড়াচ্ছিলেন কামড়াচ্ছিলে কিন্তু তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালে আনতে আনতেই বিষ সারা শরীরে ছড়ি পড়ে, ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। যখন হাসপাতালে আপনার মাকে নিয়ে উ উদ্‌ভ্রান্ত আপনি যে ঐ অন্ধকার গাড়িতে একলাই বসে থাকলেন ব্যস্ততার মধ্যে ওঁর সে খেয়ালই ছিলো না। তখনই হয়তো কোনোরকমে দরজা খুলে নেমে যান, অথবা ভু উনিই দরজা খুলে রেখে গিয়েছিলেন, এসে দেখেন আপনি নেই।'

একদমে এতোখানি বলে, চুপ করলো অনিন্দ্য। মল্লিকার ভয়ার্ত মনের ছবির স মিলিয়ে এই মিথ্যা গল্পটি তৎক্ষণাৎ তৈরি করে বলতে তার পরিশ্রম বোধ হচ্ছিলো। কি উপায় কী ? ডাক্তারের প্রথম কর্তব্য সকলকে সুস্থ রাখা, সেই কর্তব্য পালনে এই মিথ অবশ্যই ঈশ্বর ক্ষমা করবেন।

শুনতে শুনতে হাতের ভাঁজে মাথা রেখে মল্লিকা তার জ্ঞানত না দেখা মায়ের জ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। শেষ হয়ে আসা জ্বলন্ত সিগারেট থেকে নতুন একটা ধরি অনিন্দ্য ততোক্ষণে গল্পের উপসংহারটা ভেবে নিয়ে আবার বললো, আপনাকে উনি প্রাণ হয়ে উদ্ধার করলেন বটে কিন্তু আপনার মাকে আর কোথায় পাবেন ? দুঃখে লজ্জ অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে এই মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। এমনও বললেন যে, হাসপাতা হাসপাতালে খবর নিয়ে তিনি বুঝেছেন, এটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়, কেননা ত আইডেনটিফাই করতে না পারলেও একটি মৃতদেহকে দেখে সব মিলিয়ে তাঁর মনে হয়েছি সেই দেহ আপনার মায়েরই।

মল্লিকার কান্না এই সময়ে আরো উদ্বেল হলো। হোক। হওয়াই ভালো, কান্নাই মন ধোবার একমাত্র ওষুধ।

এই সময়ে ফোন বেজে উঠলো। সুখরঞ্জনবাবু বললেন, 'এইমাত্র কন্দর্পকান্তি রায়চৌধুরী মারা গেলেন, আমি সেখান থেকেই বলছি। মল্লিকাকে বলে দেবেন, আমার ফিরতে অনেক দেরি হবে।'

ফোন রেখে অনিন্দ্য বললো, 'শুনুন, আপনার বাবা ফোন করলেন।'

'বাবা!' মুখ তুললো মল্লিকা। সুন্দরী মেয়ে কেঁদে আরো সুন্দর হয়েছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো অনিন্দ্যর। নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'আপনার বাবার বন্ধুটির প্রতি নিশ্চয়ই আপনার যথেষ্ট রাগ হচ্ছে?'

মল্লিকা জবাব দিল না।

এতো মিথ্যা যে বলতে পারে সে নিশ্চয়ই শাস্তির যোগ্য। ক্ষমার অযোগ্য। এবার স্তিমিত গলায় মল্লিকা বললো, 'ওঁর আর কী হাত ছিলো! মিথ্যে বলে আমাদের তো কোনো ক্ষতি করতে চাননি, নিজের দুঃখ লজ্জা শোকের উপর চাপা দেবার একটা ভুল চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। হয়তো সেজন্যই কলকাতা ছাড়েন। তবে সত্য কথা বললেও বাবার একই প্রতিক্রিয়া হতো। নাও হতে পারতো। হয়তো তিনি বন্ধুকেই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করতেন, এবং করতেই পারেন। মিথ্যে তো নয় কথাটা? তারপর বন্ধু বিচ্ছেদ হতো। কে জানে বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটানোর জন্যই এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন কি না।'

'তাই তো। আমার কোনো রাগ নেই ওঁর উপরে, কোনো ঘৃণা নেই। আমার ভয়ের কারণ আমি জেনেছি, আর ভয়ও নেই আমার, আমি আজই একবার ওঁর কাছে যাবো। আমার করুণা হচ্ছে, মমতা হচ্ছে।'

'যাবেন? চলুন।'

'আপনি, আপনিও যাবেন?'

'আপনার বাবা ফোনে জানালেন এইমাত্র মারা গেলেন ভদ্রলোক। যাই দেখে আসি একবার। হাজার হোক পিতা তো? মুখাগ্নিটা করেই আসি!'

মল্লিকা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, 'কী বললেন?'

অনিন্দ্যও উঠলো, 'তাঁর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। মৃতকে আর কী শাস্তি দিতে পারেন? সেই প্রতিহিংসা আপনি আমার উপরে চরিতার্থ করুন।'

মল্লিকা কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

অনিন্দ্য ঘুরে এলো এদিকে, মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'এই অপরাধে যদি আমাকে ত্যাগ করেন, জানবেন তার চেয়ে চরম প্রতিশোধ আমার পক্ষে আর কিছুই নেবার নেই আপনার। খুন করলেও নয়।'

এবার চোখ তুলে তাকালো মল্লিকা। সে চোখে প্রেম প্রণয় ভালোবাসা নির্ভরতা কিছুরই কোনো অভাব ছিলো না। অস্ফুটে বললো, 'চলুন।'

নিঃশ্বাস ফেলে অনিন্দ্য হাত ধরে বললো, 'চলো।'

প্রথম সিঁড়ি

আমরা সেই সময়টায় চুঁচুড়া শহরে বাস করছিলুম। বাবা চাকরি থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে ব্যবসায় বড়লোক হবার বাসনায় এর ওর তার পরামর্শ গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সরল মানুষ, সৎ মানুষ এবং জাগতিক চাতুর্য বিষয়ে বিশেষভাবে অজ্ঞ। সুতরাং বলাই বাহুল্য কিছুকালের মধ্যেই নিজের সমস্ত অর্থ সমূলে অর্পণ করে ভয়ংকরভাবে প্রতারিত হয়ে ব্যাজার মুখে দিনাতিপাত করছিলেন।

চুঁচুড়ায় আমরা আমাদের পিসিমার বাড়িতে ছিলুম। মা আর পিসিমা গলায় গলায় বন্ধু, আর আমি পিসিমার নয়নমণি। একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য সকল আদরই একা আমার উপর বর্ষিত হওয়ায় আমার দিন বড়ো সুখে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো।

পিসিমার বাড়িটি বেশ বড়ো ছিলো। যদ্দূর মনে পড়ে ঘরের সংখ্যা পাঁচ-ছ'খানার কম নয়। এবং সব ঘরেই পিসিমার পুষ্যি। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং সকলের সন্তানই তাঁর সন্তান। ভাগে ছিলো, ভাসুর-পো ছিলো, মা ডাকা একটি ছাত্র ছিলো, আর ছিলাম আমরা। সেই ভরা বাড়িতে সবাই মিলে-মিশে খুব আনন্দে কালাতিপাত করে যাচ্ছিলো।

শুধু একজন মানুষই পিসিমার আশ্রিত না হয়ে বাইরে থেকে এসে হৈ-হল্লা করে মাতিয়ে রেখে চলে যেতেন, তিনি আমার মামা। মামা হস্টেলে থাকতেন কলকাতায়, বি এস-সি পড়তেন। শনি-রবি তো আমাদের সঙ্গেই কাটতো, অন্যান্য দিনও তাঁর উপস্থিতি বাদ যেতো না। মামার ধরন-ধারণ বড় সরব এবং নিষ্ঠুর ছিলো। কথায় কথায় আমাকে গাঁট্টা মারতেন মাথায়, আমি যেসব কুকুরছানা বেড়ালছানাকে আদর করতুম সে-সবগুলোকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে কষ্ট দিয়ে মজা দেখতেন, আমাকেও কতো সময় দুহাতে ঝুলিয়ে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে 'ফেলি ফেলি' বলে ভয় দেখাতেন। পিসিমা রাগ করতেন তাই নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে 'আয় ঠাকুরঝি তোকেও তোর মেয়ের সঙ্গে কুয়োর ফেলে দি' বলে সারাবাড়ি ছুটোছুটি করতেন তার সঙ্গে। এই ঠাকুরঝি ডাকটা আমার মায়ের থেকে পাওয়া। মা ডাকতেন বলে মামাও ডাকতেন।

মা রাশভারি মানুষ। রং টকটকে ফর্সা, চোখ টানা টানা, রাগ করে তাকালে লাল দেখাতো। যথেষ্ট মোটাও ছিলেন। অতিষ্ঠ হলে মামার নাম ধরে খাদের গলায় একটা ডাক দিলেই মামা ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন।

আমার বয়েস তখন দশ-এগারো হবে। খুব রোগা ছিলুম, ছোট্ট একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতুম, পড়তুম একটা মিশনারি স্কুলে। পড়াশুনো কিছু না, ঐ গান গান করে সবাই পাগল করে খেতো আমাকে। গান আমার দু'চক্ষের বিষ ছিলো। গানের নামে আমার পিছনের জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকার বাঞ্ছা হতো। ঐ জঙ্গলটা আমার কাছে এক পরম রহস্য ছিলো। পিসিমা বলতেন, 'ওটা অপদেবতার বাসভূমি। কোনো মানুষ সেখানে যেতে পারে না, গেলেই সাপ হয়ে যায়।' গানের নামে আমি সাপ হতেও রাজি ছিলুম

মামা যে আমাকে দুহাতে ধরে কুয়োর ঝুলতেন অথবা বেড়ালবছানা কুকুরছানাকে কষ্ট দিয়ে ছোটো বুকটা ভেঙে দিতেন সেটাও গানের জন্যই। গান করতে না চাইলেই ঐ শাস্তি।

সেই মামার একদিন বিয়ে ঠিক হলো। নীলফামারি থেকে আমার মার বাবার এক লম্বা চিঠি এলো সেই সুখবর বহন করে। মা আনন্দে থইথই করতে লাগলেন। আর আমি তো বটেই।

মামাবাড়ি.বলতে যদি শুধু মামাকেই বোঝায় তাঁকে তো রোজই দেখছি। কিন্তু দিদিমা দাদামশায় নামের মানুষ দুটিকে কখনো দেখিনি। ডগমগ হয়ে মাকে বিরক্ত করতে লাগলাম, 'কবে যাবো, কবে যাবো।' মা বললেন, 'যাবেই তো, অস্থির হচ্ছো কেন? বিয়ের দেরি আছে।' আমার কি দেরি সয়? আমি তবু বিরক্ত করি। এই করতে করতেই একদিন সময় হয়ে এলো। মা ট্রাঙ্ক বাক্স গুছোলেন; উপহার সামগ্রী কিনলেন, সর্বশেষে দেখি আমার সেই পুঁচকে হারমোনিয়ামটিও যাচ্ছে সঙ্গে। সব সুখে কলসি কলসি জল ঢেলে দিলো কে। চোখের জল মুছতে লাগলাম দরজার কোণে দাঁড়িয়ে।

এতোখানি বয়স পর্যন্তও দাদামশায় দিদিমাকে না দেখার একটা কারণ ছিলো। মাকে কখনো তাঁর পিত্রালয়ে যেতে দেখিনি। অন্তত জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে পর থেকে নয়। আসলে আমার মায়ের নিজের মা ছিলেন না। দাদামশায় বেশি বয়সে যাঁকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি আমার মায়ের বয়সীই এক মহিলা। হয়তো সেই কারণেই অভিমান ছিলো।

কিন্তু ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে দেখা গেলো ঘন ঘন পত্রবিনিময় হচ্ছে, মায়ের বাবা বলতে গেলে মায়ের উপরই অনেক কিছুর ভার দিয়ে দিয়েছেন। আর মায়ের সৎ-মা লিখেছিলেন, তুমি এসে না দাঁড়ালে সবই বন্ধ হয়ে যাবে।' এরপর আর কথা কী?

চুঁচুড়া থেকে নীলফামারি কেমন করে যে গিয়েছিলুম তা মনে নেই। পৌঁছেছিলুম সকালে। আমার একজনই মামা। মামা আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমরা বাবার সঙ্গে গেলাম। পৌঁছে দেখি একজন পিয়নকে নিয়ে মামা দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনে। আমার দাদামশায় সেখানকার পোস্টমাস্টার ছিলেন। সুতরাং ব্যক্তিগত কাজকর্মে মাঝে মাঝেই ডাক-পিওনেরা ব্যবহৃত হতো।

মা নেমেই বললেন, 'কী রে, বৌ দেখলি, সুন্দর তো?'

মামা বললেন, 'সে তুমিই দেখবে। আমি আমার যা প্রয়োজন তা পেয়ে যাচ্ছি। ভাবী শ্বশুরটির অর্থবল আছে।'

এসব কথার তাৎপর্য আমার বোধের মধ্যে থাকবার কথা নয়। বৌ সুন্দর কি অসুন্দর তার সঙ্গে তার বাবার ধনরত্নের প্রশ্ন কী? পরে অবশ্য বুঝেছিলুম মামা শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাচ্ছেন এবং যতো টাকা আমার দাদামশায়ের দাবি ছিলো সবই মামার শ্বশুর সানন্দে দিচ্ছেন।

ঘোড়ার গাড়িতে মাল চাপিয়ে আমরা স্টেশন ছাড়িয়ে রাস্তায় এলুম। দুপাশে লোকালয়ের চেয়ে ক্ষেতখামারই বেশি। লোকজনেরা মাতলা মাথায় দিয়ে কাজ করছে রোদে বসে। কেমন ফসল ফসল গন্ধ বেরিয়েছে, মামা বললেন, 'বাহেরা খুব কৃষিবিদ্যায় পটু।' আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'বাহে কী মামা?'

মামা বললেন, 'এখানকার দেহাতি লোকদের বাহে বলে।'

আমাদের গাড়োয়ান দেখলুম প্রচণ্ড জোরে একটা গান ধরেছে, 'দক্ষিণ ধারের চালাতে

তিনটে কদু ফলেছে, দাও বাহে কদু পাড়ায়ে দাও।' গানটার সুরে ভারি মজুর ছিলো। গলার স্বর কেমন ছড়ানো ছড়ানো মত। সুরটা আমার গলায়ও তক্ষুনি উঠে এলো।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বিয়ে বাড়ি বেশ সরগরম। গাড়ি থামতেই কতো লোক এগিয়ে এলো। মা কাউকে বললেন, 'ওমা মেজকাকা কবে এলেন?' কাউকে বললেন, 'ছোটোকাকারও এসেছেন দেখছি।' 'এ কী, বিন্দিমাসি তুমি?'

আমি স্বভাবতই মুখচোরা আর লাজুক ছিলাম। আমার বাবাও তাই। সুতরাং কতোটুকু সময়ের জন্য আমার আর আমার বাবার অবস্থা বেশ করুণ হয়ে উঠেছিলো। তারপরেই জামাই-আদর শুরু হলো। আমি তখনও মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। এক ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এসে হাত ধরে টান দিলেন, 'এই বুঝি তোমার গাইয়ে মেয়ে, যমুনা? এসো এসো তোমাকে দেখি।'

ভদ্রমহিলা এইমাত্র স্নান করে এসেছেন বোঝা গেলো, গা থেকে সাবান আর মাথা থেকে তেল মিশিয়ে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরুচ্ছিলো। আমাকে কাছে নিয়ে তিনি আদর করলেন। ইতিমধ্যে পোস্টাপিসের ভিতর থেকে এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে খুশি গলায় বললেন, 'তোরা এসে গেছিস? আয় আয়, কেমন আছিস সব? প্রফুল্ল ভালো আছে তো? যমুনা দেখছি আরো মোটা হয়েছিস। মেয়ে কই তোর?'

দাদামশায়ের পোস্টাপিস আর বাড়ি একই সঙ্গে ছিলো। সদর আর অন্দর। পোস্টাপিশের দালানের পেছনেই অন্দরের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেই পোস্টাপিশের সামনে পড়ে যেতে হয়। বুঝলাম উনিই আমার দাদামশায় আর যিনি আমায় কাছে টেনে নিলেন তিনিই আমার দিদিমা।

জিনিসপত্র নামানো হলো। আমরা সব ভিতর-বাড়িতে চলে গেলাম। বাড়িটা বড না, কিন্তু লোকে লোকারণ্য। বিয়ে উপলক্ষে বহু আত্মীয়-পরিজন এসে ভিড় করেছে। আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর রাখা আছে দেখলাম। সে ঘরেও ভিড়। আমার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছিলো। এরই মধ্যে কে একজন প্রস্তাব করলেন, 'খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে নাও তারপরে তোমার মেয়ের গান শুনবো যমুনা।'

বলাই বাহুল্য আমার আত্মা তখন চুঁচুড়ায় আমার পিসিমার জন্য কেঁদে উঠছিলো। ইচ্ছে করছিলো ছুটে পালিয়ে যাই। আমার এই দুঃখ শুধু আমার পিসিমাই বুঝতেন। সব সময় তিনি বলতেন, 'মেয়েটাকে আর জ্বালাস না তো। যখন-তখন কেবল গান। অতই সোজা কিনা?' আর এই কথা শুনে আমার মামা বলতেন, 'দাঁড়া ঠাকুরঝি, তোকে আর তোর মেয়েকে আজ একসঙ্গে কুয়োয় ফেলি।'

ভাগ্য ভালো, গান আর আমাকে সেদিন গাইতে হলো না। আমার মা গিয়েছেন এতদিন বাদে, দিদিমা প্রাণপাত করে যত্ন করছেন মাকে, বিয়ের সমস্ত কর্তৃত্বের ভার তুলে দিচ্ছেন সৎ-মেয়ের মাথায়, বলছেন, 'বাড়ির বড়মেয়ে—সবই তো তোমার কাজ। তুমি ছাড়া কে করবে? পাকা দেখা এখনো বাকি, তুমি আগে আশীর্বাদ করবে তবে তো সব। এখন পরামর্শ দাও কী দিয়ে কী করি।'

দিদিমার কথা শুনে মায়ের অভিমান নিমিষে অন্তর্হিত। দুপুরে সভা বসলো সকলের। অনেক কচকচি হলো। দেখলাম সভানেত্রীর আসনটিও যেমন মাকে দেওয়া হয়েছে, সেই আসনের মান রেখে মাও তেমনি যথেষ্ট দার্ঢ্যের সঙ্গে আপন অভিমত ঘোষণা করছেন।

সবাই বলছিলেন, তাঁরা অর্থাৎ মালখানগরের বসুরা এতো বড় কুলীন যে ভাবী বধূর পিতা নগেন নন্দী যতো বড়োলোকই হোন না কেন ব্যবসাবাণিজ্য করে, মেয়েকে যখন জাতে ওঠাচ্ছেন তখন তাঁকে ঘুড়ির সুতো আরো কিছুটা বেশি ছাড়তে হবে। নগদে তিনি যা দিচ্ছেন দিন, অমুক বাবদ আরো কিছু বাড়াতে হবে, তমুক বাবদ তো দেয়াই উচিত। তা ছাড়া এ-ও-তা।

আমার বাবা চুপচাপ এককোণে বসেছিলেন। শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বাইরে চলে গেলেন।

বিয়ের মাত্র দুদিন আগে আমরা গিয়েছিলাম। বাবার কাজ ছিলো বলে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো আমাদের। পরের দিন মেয়ের বাড়ি থেকে অধিবাস এলো। রাজ্যের লোক দাঁড়িয়ে গেলো সেই দৃশ্য দেখতে। আমার অনভিজ্ঞ ছোটো বয়সের ছোটো চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসছিলো দেখতে দেখতে। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, ময়দা, গরম মশলা—বোধ হয় সংবৎসরের ভোজ্যবস্তু নিয়ে আসছিলো বাহেরা বাঁকে বাঁকে করে। তারপরে এলো মিষ্টি। রসগোল্লা, পান্তুয়া, প্রাণহরা, ক্ষীরের চপ, ছানার অমৃতি, মিহিদানা, সীতাভোগ—এমন কোনো নাম নেই যা ওরা দেননি। আর সাইজ কী! তারপরে এলো নারকোলের খাবার। কতরকম জিনিস যে তৈরি করেছে তা দিয়ে এখন মনে করলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বেলা দশটা থেকে প্রায় একটা পর্যন্ত শুধু এইসব এলো। উঠোনে আর জায়গা হচ্ছিলো না। পাশের বাড়ির দুটো ঘর নেওয়া হয়েছিলো চেয়ে। বাড়ির লোকজনেরা সেখানে নিয়ে গিয়ে জমা করতে লাগলো। আমার মা, আমার দিদিমারা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা—যারা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ফর্দ মিলিয়ে জিনিস নিচ্ছিলেন আমি মধ্যে মধ্যে তাদের মুখে বেশ অসন্তোষ দেখছিলাম। কেউ কেউ বলছিলেন ঘিটা ততো খাঁটি নয়, আধমণ তেলের কথা বলা হয়েছিলো, যা দেখছি পনেরো সের আছে কি না সন্দেহ। মিষ্টির সাইজগুলো বলা যায় মাঝারি। আর কিসমিস কত কম দিয়েছে দেখেছো ? বলা হয়েছিলো গোবিন্দভোগ চাল পাঠাবেন, এ তো দেখছি বেশ মোটা।

আমি এই সময় আমার বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জানি না কেন। কিন্তু অজানিতভাবেই আমি আর আমার বাবা সেই সময় একাত্ম বোধ করেছিলাম। আমার ছোটো মন কেমন করছিলো ! আমার বোধ আমাকে ব্যথিত করছিলো। বাবা মাকে নিচুগলায় বলছিলেন, 'এসব কী করছো ?' মা বাবার কথায় কান দিচ্ছিলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল পরের দিন। মামীকে আমার এতো ভালো লাগলো, এতো সুন্দর লাগলো যে বলতে পারি না। সবাই কিন্তু বলছিলো, 'মামীর রং কালো, মামীর নাক বোঁচা—' এইসব কথা শুনে আমার কান্না পাচ্ছিলো। আমার মা শুধু বললেন, 'এমন লাবণ্য আর দেখেছো নাকি ? আর চোখ ? কী সুন্দর বড় বড় চোখ। অল্পবয়সী ভাই এর বৌকে মা আমার মতই ভালবাসছিলেন সেদিন।

বাপের বাড়িতে মামীর একটা বিচ্ছিরি নাম ছিলো, সেটার বদল হলো শুভরাত্রির দিন। মা-ই বদলালেন, বললেন, 'সুকৃতি একটা কী বিশ্রী নাম। ওর নাম থাক সুষমা।' সুষমাও বেশ পুরোনো নাম, তবু মা বলেছেন এর উপর আর কথা কী। মা অবশ্য কারণ হিসেবে ঐ একই কথা বললেন।

মামী আসার পরে বাড়িটাতে আর ফূর্তি ধরছিলো না। আমি একদণ্ড মামীর কাছ ছাড়া

হচ্ছিলাম না। মামীর গায়ের সুগন্ধ আমায় পাগল-পাগল করছিলো। জুঁইফুলের গন্ধ, সেন্টের গন্ধ, মাথার তেলের গন্ধ, স্নো-পাউডারের গন্ধ, নতুন কাপড়ের গন্ধ—সব মিলিয়ে কী যে মাদকতা অনুভব করছিলাম বলা যায় না। আর গায়ে কী গয়না। বাপরে বাপ। এটাই আমার বড় খারাপ লাগছিলো। আমি দেখছিলাম মামীর খুব কষ্ট হচ্ছে গয়নার চাপে। কিন্তু কিচ্ছুটি বলার উপায় নেই। কতো লোক আসছে বৌ দেখতে, গয়নাও তো দেখতে হবে।'

মেয়ের বাড়ির সবাইয়ের নেমন্তন্ন ছিলো সেদিন। দুপুরের নেমন্তন্ন। আমি দেখছিলুম বাপের বাড়ির লোকদের জন্য মামীর কী ব্যাকুল আগ্রহ। বোনেরা তাড়াতাড়িই এলো। দিদিকে ঘিরে বসলো তারা। আস্তে আস্তে আরো সবাই এসে গেলেন। কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠলো বাতাস। চিৎকার চেঁচামেচি, খাওয়া-দাওয়া, কুকুরের দল ঠেকানো, ভিখিরি বিদায়—এর মধ্যেই কে একজন বলে উঠলো, 'আরে আমাদের রাজপুত্রই দেখি আসছে না এখনো।'

রাজপুত্র! আমি খাচ্ছিলাম, আমার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠলো। তা হলে এই বিয়ে-বাড়িতে একজন রাজপুত্রও আসছে? সেই রাজপুত্র যারা রাজকন্যাদের ঘুম ভাঙায় সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে, তারপর ভালোবাসে, তারপর বিয়ে করে। একটি রাজকন্যার জন্য একটি রাজপুত্রকে যে কত কষ্ট করতে হয়, কত বিপদ-আপদ মাথায় নিয়ে চলতে হয়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র কত কিছু ডিঙোতে হয় তার অন্ত আছে? স্বয়ং সেই রাজপুত্র আসছে এখানে? এই বাড়িতে। আমার দাদামশায়ের বাড়িতে? আমি একেবারে স্তম্ভিত।

একটি কালোমত ছেলে, সবাই তাকে 'আকালু' বলে ডাকছিলো, সে বললো, 'রাজপুত্রের পোশাক পছন্দ হয়নি যে, আসবে কী করে।'

'সে তো বটেই।' মনে মনে ভাবলাম আমি। রাজা টাজাদের তো আর যেমন তেমন পোশাকে সেখানে যাওয়া চলে না।

কিন্তু কী রকম পোশাকে আসবে রাজপুত্র? আমি তাকে কেমন দেখবো? সে কোথায় বসবে? কোথায় দাঁড়াবে? বুকটা একেবারে ধক ধক করছিলো। দুর্বল দুর্বল লাগছিলো।

খাওয়া নিয়ে আমার ঝামেলা বরাবরই আমার মার একটা বিরক্তির কারণ ছিলো। সুতরাং আমি খেতে বসলে মা ঠিক হাজির থাকবেন সেখানে। সেদিনও ছিলেন। আমার অন্যমনস্ক ভাব দেখে বকলেন, 'আবার হাত থামাচ্ছিস কেন, আগে মাছটা খেয়ে নে।'

আমি একপলকে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। রাজপুত্র আসবে বলে সেখানে কোনোই ভাবান্তর ছিলো না। কেন? কেন নেই। কারোই তো নেই। সবাই তো বেশ স্বাভাবিক আছে, আমি কেন এমন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি শুধু শুধু।

রাজপুত্রের জন্য প্রাণটা আমার খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। আর কিছুতেই মন রইলো না। খেয়ে উঠে নূতন মামী ভুলে পোস্টাপিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। শুধু তো রাজপুত্রকে দেখলেই চলবে না, সে কেমন করে আসবে, লোক লস্কর, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদিতে সারাটা পথ কী রকম একটা অলৌকিক জগতে পরিণত হয়ে যাবে, সবই তো দেখতে হবে। কিন্তু হায়! এক লোক এলো গেলো, দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো, তবু রাজপুত্র এলো না। আসলে আমি আমার কল্পনার ঘোড়াকে বড় বেশি দৌড় করিয়েছিলাম, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে সে কথাটা বুঝেও বুঝতে ইচ্ছে করছিলো না। আমার কান্না পাচ্ছিলো।

এরপরে হতাশার চরমে পৌঁছে মাকে গিয়ে মনের কথা জানালাম। মা প্রথমটায় বুঝতে পারেননি, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী বলছিস তুই ?'

নাকি সুরে বললাম, 'তোমরা যে বললে রাজপুত্র আসবে, আসছে না কেন ?'

'রাজপুত্র আসবে ?' মা আকাশ থেকে পড়লেন। পাশেই একজন মামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি, আসলে তিনিই বলেছিলেন, 'রাজপুত্র আসছে না কেন ?'

হাসি দেখে আমি ক্রন্দনমুখী হলাম আর মা বললেন, 'ব্যাপারটা কী রে কালু ?'

'দেখাচ্ছি এক্ষুনি। আয় আমার সঙ্গে আয়, রাজপুত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে।' আমার হাতে ধরে টানলেন আমার সেই কালু নামের মামা। তারপর পাশের যে-বাড়িটায় দু'খানা ঘর ভাড়া নেয়া হয়েছিলো সেখানে গিয়ে হাঁকলেন 'এই অমল, এদিকে আয়, তোকে দেখার জন্য এই মেয়েটি ভীষণ কান্নাকাটি করছে।'

অমল নামের ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উঠে এলো, 'আমাকে দেখার জন্য কান্নাকাটি করছে ? কে ?'

'শ্রীমতী নাইটিঙ্গেল। এর গান শুনেছিস ?'

অমলকে দেখে আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। একটা সাধারণস্য সাধারণ ছেলে, সাদা ফ্যাটফেটে রং, অল্প অল্প গোঁফের রেখা গজিয়েছে, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, পায়ে স্যান্ডেল, একগাল হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে দেখতে চাইছো কেন, খুকি ?'

খুকি ! রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। তুই নিজে একটা জলজ্যান্ত খোকা, নেহাত বিয়ে-বাড়ি বলে হাফপ্যান্টের বদলে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বুড়োটে ভাব নিয়েছিস, মাকুন্দো মাকুন্দো মেয়েলি গাল আর তুই আমাকে খুকি বলছিস।

তেরিয়ে হয়ে বললাম, 'তোমাকে দেখতে চাইবো কেন ? তুমি আমার কে ?'

'তার আমি কী জানি ?' অমল দাঁত মিটকিয়ে হাসলো, 'কালুমামাই তো বললেন দেখার জন্য কান্নাকাটি করছো।'

কালুমামার হাত ছাড়িয়ে মাথা ঝেঁকে এক ছুটে চলে আসতে আসতে বললাম, 'তোমার মতো একটা পুঁচকে খোকাকে দেখতে আমার বয়ে গেছে।'

কালুমামা হাসতে হাসতে বলছিলেন, আরে তুই আসছিস না দেখে আমি বলেছিলাম, 'রাজপুত্র এখনো আসছে না কেন ? সেই শুনে ও ভেবেছে সত্যি বুঝি এক রাজপুত্র এসে হাজির হচ্ছে এ বাড়িতে। মেয়েটা বেজায় বোকা।'

'ও কে ?'

'যমুনাদির মেয়ে। গান শুনিস, অবাক হয়ে যাবি।'

অমল আসলে আমার সেই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে ভালো লাগা ভালোবাসার নতুন মামীর দেড় বছরের বড় ভাই। মামী ষোলো, অমলের সাড়ে-সতেরো। মামীর ভাই, সুতরাং আমারও নিশ্চয়ই কিছুটা প্রিয় হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু অমলটাকে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মার কাছে গিয়ে তক্ষুনি নালিশ করেছিলাম, 'ঐ সাদা ছেলেটা আমাকে খুকি বলেছে।' মা বলেছিলেন, 'এই অন্যায়ের কোনো ক্ষমা নেই। আমি এক্ষুনি ডেকে বকে দিচ্ছি।'

বকুন না বকুন কিছু যায় আসে না। ছেলেটা যে আমার দু'চক্ষের বিষ হলো তা আর গেলো না।

. বিয়ের পরে অনেক অনুষ্ঠান থাকে। সেইসব যে আমার কী ভালো লাগছিলো বলতে পারি না। আমি যেন সেইসব সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল খেলা। বিয়ের ঠিক বারো দিনের দিন মামা বিলেত রওনা হয়ে গেলেন। আর বারোদিনের বিবাহিত ষোলো বছরের মামীর কান্না দেখে আমারও চোখ মুখ ফুলে গেল। মামা গেলেন জার্মানিতে—এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। শুনলাম তিন বছর বাদে ফিরবেন।

নীলফামারি স্টেশন সেদিন মামার আত্মীয়-পরিচিতিদের ভিড়েই ভিড়াক্রান্ত ছিলো। বাপের বাড়ির লোক, শ্বশুরবাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী—বিলেত যাওয়া তো বড় সোজা কথা নয় তখন। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে যাচ্ছে যে লোকটা, সে কি একটা অমনি ব্যাপার ? বলাই বাহুল্য, তার মধ্যে ঐ ছেলেটাও গিয়েছিলো, ট্রেন ছেড়ে গেলে ছুটে ছুটে রুমাল উড়োচ্ছিলো খুব। আবার সেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলো।

এক সময় কী করে যে ওর সঙ্গে আমি মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম কে জানে। পাকা গলায় বললো, 'বেচারা। ব্যথা দিলাম নাকি ?'

আমার মামার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিলো তখন মামীর কান্না দেখে বুক ভেঙে যাচ্ছিলো, মায়ের হেঁচকির শব্দে ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিলো। ভুরু কুঁচকে ছিটকে সরে এলাম। কিন্তু ছেলেটা আমার হাত ধরে ফেললো। একটানে সরিয়ে আনলো এ পাশে, রেগে গিয়ে বললো, 'যদি লাইনে পড়ে যেতে কী হতো ?' তাকিয়ে দেখলাম ছিটকোতে গিয়ে ঠিক লাইনের কাছে চলে এসেছিলাম।

দশখানা ঘোড়ার গাড়ি চেপে তারপর বাড়ি ফিরলাম আমরা। মামার বিচ্ছেদে সবাই খুব শোকার্ত ছিলো। দেখলাম অমলটাই বেশ সরগরম করে রাখবার চেষ্টা করছে আবহাওয়াটা।

আমার দাদামশায়ের বাড়ি আর মামীর বাপের বাড়ি খুব কাছাকাছি ছিলো। দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট যাতায়াতও ছিলো। অমল এবং মামী কেউই এঁদের অপরিচিত তো নয়ই, বরং খুব ঘরোয়া। আমার দাদামশায় ওদের জ্যাঠামশায় আর দিদিমা ওদের জ্যাঠাইমা। বিয়ের পরেও মামী শ্বশুরকে আগের মতো জ্যাঠামশায় ডাকতেন, কিন্তু দিদিমাকে 'মা' বলতেন।

অমলটা এতো সর্দার যে বাড়ি এসেই স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে লেগে গেল। বললো, 'পাঁচটা বাজে চা না খেয়ে পারবো না জেঠিমা। এই সুকু প্যাঁ প্যাঁ করে কাঁদছিস কেন ? আয় না আমাকে সাহায্য করবি। এই খুকি, থুড়ি-টুশুরানী না ফুশুরানী, না কী যেন নাম তোমার, দ্যাখো না রসগোল্লার গামলাটা তোমার মা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, বার করে আনো না।'

রাগের চোটে বললাম, 'আমি তোমার মত চোর না, আমি তোমার মত অভদ্র না—'

'কেন ? চোরই বা হতে গেলাম কেন, অভদ্রতারই বা কী করলাম।'

'লুকোনো খাবার যারা খুঁজে বার করে তারা নিশ্চয়ই চোর। আর যারা একজন ক্লাশ সিক্সের মেয়েকে ঠিকমত নামে ডাকতে জানে না, তারাও নিশ্চয়ই অভদ্র।'

'ঈশ্‌শ্‌শ্‌ ! তাহলে তো খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। ঠিক আছে, মিষ্টির গামলা খুঁজে দরকার নেই, আর ভুল নামে ডাকার জন্যও ক্ষমা চাইছি। তাহলে বুলবুল ডাকবো—কেমন ?'

'আমার নাম মোটেও বুলবুল নয়।'

'বা রে, কালুমামা সেদিন নাইটিঙ্গেল বললেন না ?'

'আমার নাম রাধারানী। সবাই আমাকে রাধা বলে।'

'তাই নাকি ? অত সুন্দর নামটাকে আমি তুষুফুশু করে দিয়েছিলাম ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ— কী প্রায়শ্চিত্ত করলে তুমি খুশি হও বলো, আমি তাই করবো।'

আমি এতোতেও যখন মুখের ভার একটুও কমালাম না তখন কাছে এসে খুব ভাব দিয়ে বললো, 'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে বুলবুলই ডাকবো এবার থেকে। তোমার গান শুনে না, আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে, বুলবুল ছাড়া ভাবতেই পারছি না।'

এ-কথার পরে আমি ওকে রসগোল্লার গামলাটা খুঁজে দিয়েছিলাম। চা তৈরি করায় সাহায্য করেছিলাম এবং খুব বিশ্রী চা হয়েছিলো। সবাই বলছিলো, 'ওয়াক থু।' বলছিলো বটে কিন্তু মামা চলে যাবার বিচ্ছেদবেদনাটা অনেক লাঘবও হয়ে গিয়েছিলো অন্য ধরনের কথাবার্তা ইত্যাদিতে। দিদিমা অমলকে 'নিষ্কর্মার ধাড়ি, অপদার্থ' ইত্যাদি বলে নিজেই শেষে খুব ভালো চা খাওয়ালেন সকলকে।

পরের দিন থেকে বিয়ে বাড়ি আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছিলো। দুচার দিনের মধ্যেই নিঝুম। কে বলবে এই বাড়ি এই কদিন আগে কী মুখর ছিলো। আমার অনেক ধরনের বদস্বভাব আছে। যে কেউই বাড়ি থেকে যাক না কেন, কান্না আমার পাবেই। কাজেই কয়েকটা দিন ধরে আমাকে যথেষ্ট নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে হলো।

দিদিমা আমাদের সহজে ছাড়লেন না। বললেন, 'প্রফুল্ল তো এখন আবার তার পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাচ্ছে ঢাকায়, তোমরা থাকো, সে গিয়ে আগে বাড়িঘর ঠিক করুক, তারপর এসে নিয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তা মন্দ কথা নয়, এখন গেলে বরং তোমাদের অসুবিধেই হবে। কোনো আত্মীয়ের বাড়ি ছাড়া তো আর উঠতে পারবে না ? একটা পছন্দমত বাসা ঠিক করতে নিশ্চয়ই সময় লাগবে।'

দাদামশায়ও বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই ভালো। এসেছিস যখন কদিন থেকে যা।'

আমার বেশ থাকার ইচ্ছেই ছিলো, মামীকে ছেড়ে আসার কথা আমি ভাবতেই পারছিলাম না। আর মামীও কিছুতেই আমাদের ছাড়তে চাইছিলেন না। সুতরাং রয়ে গেলাম। কথা থাকলো, বাবা কাজে যোগ দিয়ে বাড়ি ঠিক করে তারপর এসে নিয়ে যাবেন আমাদের। কোথা থেকে অমল এসে বাগড়া দিয়ে বললো, 'না, না, জামাইবাবুকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, আমিই নিয়ে যাবো।'

দিদিমা এক ধমক দিলেন, 'তুই যাবি কী ? তোর পড়াশুনো নেই, ফাঁকিবাজ।'

অমল বললো, 'শোনো জেঠিমা, পড়াশুনো হলো একটা চিরন্তন ব্যাপার। এ-বছর পড়লাম তো ও-বছর পড়বো। ও-বছর না পড়লাম তো সে-বছর পড়বো। কিন্তু এই দিদিদের নিয়ে ঢাকায় যাবো এ সুখ আবার আমার জীবনে নাও আসতে পারে।' বলে আমার দিকে চোখ নাচালো। তারপর খুব বীভৎস সুরে বাহেদের মত গলায় বদ উচ্চারণে 'তবার আলো জ্বালাইতে চাই, নিবে যায় বারে বারে, আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।' এই গানটা গাইতে গাইতে চলে গেল। মামী বললেন, 'দাদাটা যে কী না—'

পড়াশুনোয় অমলের সত্যি মন ছিলো না। ওরা বড়লোক বাবা তিনটে মাস্টার রেখে কোনোরকমে সেকেন্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করিয়েছিলেন। তারপর ভর্তি হয়েছে রংপুরে

কলেজে, কামাই করে করে সীমা দিচ্ছে। বিশেষত এই বিয়ে উপলক্ষে যা করছে না তার তো কথাই নেই।

করুক। অমলের উপস্থিতি আমার দাদামশায়ের বাড়িতে দেখলাম বেশ একটা আনন্দের কারণ। দিদিমা অমলকে খুব ভালোবাসেন। অমলের বোন, আমার মামীকেও খুব ভালোবাসতেন, আর এখন তো বৌ-ই হয়েছেন। মামী এ-বাড়িতে বেশ মেয়ের মতই ছিলেন। দিদিমা ছিলেন নিঃসন্তান, সুতরাং কারো সঙ্গে ঈর্ষাদ্বেষের প্রশ্ন না-থাকায় সমস্ত কিছুই বেশ সুন্দরভাবে মিলেমিশে চলছিলো সংসার। দোষের মধ্যে এই, তিনি অসম্ভব সংগীতপ্রিয় ছিলেন। নিজের গলায় যদিও সুরের স-ও ছিলো না, তবু অন্যের গলার সুর লোভীর মতো ভালোবাসতেন। অর্থাৎ আমাকে জ্বালিয়ে খেতেন। দিদিমা খুব কর্মঠ ছিলেন। চমৎকার রান্না করতেন, লোকজন খাওয়াতে ভালোবাসতেন। আচার, আমসত্ত্ব, মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া, এসব তৈরি করে তাক ভর্তি করে রাখতেন। গানের জন্য সেই সব ঘুষ দিতেন আমাকে। গান করায় আপত্তি আমার ঘুষে পোষাতো না, আমি বলতাম, 'না, আমি আচার চাই না, আমি আমসত্ত্ব চাই না, কিছু চাই না—আমি গান করতে পারবো না।' অমলটা কোথা থেকে এসে বলতো, 'লক্ষীটি, তুমি না চাও, আমাকে এনে দাও। আমি ভীষণ আচার আমসত্ত্ব ভালোবাসি।'

আমি বলতাম, 'তুমি বাসো তো আমার কী? আমি কেন তোমার জন্য কষ্ট করতে যাবো।'

তখন ও আমার কানের কাছে মুখ এনে ভীষণ জোরে একটা 'কু' দিয়ে পালিয়ে যেতো। দূরে দাঁড়িয়ে বলতো, 'এরপর চিমটি কাটবো। আমি বুষে ফুঁশে ছুটে গিয়ে ওর হাতে কামড়ে দিতাম। কিন্তু ও তাতে একটুও বিচলিত হতো না। আসলে ওর স্বাস্থ্যটা এতো ভালো ছিলো যে সহজে কিছু হবার নয়। আর আমিও এমন কিছু সাংঘাতিক জোরে কামড়াতাম না যাতে একেবারে মাংসখণ্ড উপড়ে আসে। কিন্তু কামড়ানো উপলক্ষ করে ও আমাকে অনেকক্ষণ হারে ধরে আটকে রাখতো, বলতো, 'শাস্তি নাও, নড়তে পারবে না। প্রতিজ্ঞা কর, গান করবে, জেঠিমার কাছ থেকে আচার আমসত্ত্ব নেবে এবং আমাকে ভাগ দেবে।' আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টায় ঘেমে যেতাম, কেঁদে ফেলতাম। ওকে পাজি, রাক্ষস, হাঙর, কুমির, এসব অনেক কিছুই বলতাম, ওর তাতে কিছুই এসে যেতো না। আর এসব কাজ ও একটু বেশ আড়ালে-আড়ালেই করতো, তারপর আমি যখন 'মা, মা' বলে ভীষণ চ্যাঁচাতাম তখন ছেড়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগতো। ওর দাঁত খুব সুন্দর ছিলো, আমি দেখতে না পারলে কী হবে বাড়ির সবাই ভালোবাসতো ওকে। মা বলতেন, 'অমলটার মত এমন সুন্দর একটা ফুর্তিবাজ ছেলে কাছে থাকলে জীবনে আর কোনো দুঃখ থাকে না।'

ছোটোবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমার একটু পদ্য লেখার অভ্যেস ছিলো। রেগে গিয়ে কাঠ-পেন্সিল দিয়ে খুব বড় করে দেয়ালে লিখে রেখে এলাম।

শোনরে অমল নন্দী
তোর সকল ফন্দি
একদিন ক'রে দেব ফাঁস
দিদিমাকে বলে দেব
তুই আচার চুরি ক'রে খাস।

হাতের লেখাটা একটু অন্যরকম করে লিখেছিলাম, যাতে কেউ দেখতে পেলেও না
বে আমি লিখেছি। কিন্তু আমার এ চালাকি খাটলো না। সেই সবচেয়ে খারাপ ছেলে
মলটাই আবিষ্কার করে শুধু যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লাইনগুলোই পড়লো তাই নয়, দেয়াল
ষ্ট করেছি বলে কী নালিশ। মাকে বললো, 'ওকে শাসন করুন দিদি। একদিকে গুরুজনকে
পমান অন্যদিকে দেয়াল নষ্ট। আর একি যে সে দেয়াল, এ হলো গিয়ে পোস্টাপিসের
য়াল। আমি তো যা দেখছি, এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে। এইটুকু একটা মেয়েকে ধরে
য়ে গিয়ে যদি হাজতে রেখে দেয় সে কি ভালো হবে?'

সবাই মুখ টিপে হাসছিলো। আমি যুগপৎ লজ্জা এবং ভয়ে বেশি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।
ার ইচ্ছে করতে লাগলো অমলকে গিয়ে আঁচড়ে-কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আসি।
দিমা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাহলে অমল, কী করা যায়?'

'উপায় একটা আছে অবশ্য। অন্তত হাজত-বাসটা তো বন্ধ করা দরকার?'

'তা সেটা করো—অমন চুপচাপ থাকলে তো চলবে না?'

অনেক মাথা খাটিয়ে অমল বললো, 'এখন হলো গিয়ে আপনার বিকেল পাঁচটা,
ুন পুলিশ আসতে-আসতে আটটা কি সাড়ে-আটটা। আমরা বরং চা-টা খেয়ে বারান্দায়
টি পেতে গান শুনতে থাকি। পুলিশগুলো এসে গান শুনে আর কি কোনো ঝামেলা
রবে, আমার তো মনে হয় না। আমি দেখেছি পুলিশেরা ভীষণ গান ভালোবাসে।'

এই সময় আমি ছুটে গিয়ে অমলের পিঠে প্রচণ্ড জোরে একটা কিল মেরে বললাম,
থ্যুক!' বলেই দৌড়ে সেই দেয়ালের কাছে গিয়ে রাশি রাশি থুতু ছিটিয়ে ঘষে ঘষে
ছ ফেললাম লেখাটা। আমার মনে কিন্তু সত্যি-সত্যিই একটু পুলিশের ভয় হয়েছিলো
ন্তু গানের কথা বলতেই কোথা থেকে সাহস এসে গেল। অমলও এসেছিলো আমার
ছনে পিছনে চুলের বেণীটা ধরে টানছিলো আর বলছিলো, 'মুছলে কী হবে, আমি ঠিক
রিয়ে দেবো।'

ঝামটা মেরে বললাম, 'দিয়ো, আমার কচু হবে।'

'আর তারপর যখন ঘণ্ট করে খাবে পুলিশেরা, তখন? তখন তো এই অমলকেই
তে হবে বাঁচাবার জন্য।'

'ঘণ্ট করে যদি খায় তো খাবে, তোমার তাতে কী?'

'আহাহা কী একটা বললে। আমার নয়তো আবার কার কী? আমার বুলবুলি ঘণ্ট
ব আর আমি চুপ করে বসে থাকবো?'

'আমাকে বুলবুলি ডাকা আমি পছন্দ করি না।'

'তবে কী ডাকবো।'

'কেন?'

'ও, তাও তো বটে। তাহলে কি রানী বলে ডাকবো?'

'না, আমাকে সবাই রাধা বলে। হয় রাধা বলবে, নয় রাধারানী বলবে।'

'আমি রানী বলবো।'

—'কেন?'

'যেহেতু আমি রাজা।'

'কী রে আমার রাজা।'

'তাই দেখার জন্যই তো কেঁদে কেটে একশা হচ্ছিলে সেদিন।'

'মোটেও না। ককখনো না!'

'আচ্ছা, বুলবুল—'

'রাধা—'

'আচ্ছা রানী—'

'রাধা—'

'এই জানো, ছেলেবেলায় কে একজন আমার নাম কৃষ্ণ রেখেছিলো, অমলের বদলে তুমি আমায় কৃষ্ণ বলে ডাকো না কেন? তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে তোমাকে রাধা বলে ডাকতে পারি।'

একথা শুনে কেন যেন আমার কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো। আমার বয়স যাই হোক, রাধা আর কৃষ্ণের সম্পর্ক না জানার কথা নয়, বুঝতে পারলাম অমলটাকে আমি যত পাজি ভাবি ও তার চেয়েও পাজি। জবাব না দিয়ে চলে আসছিলাম, চট করে ধরে ফেলে চুমু খেয়ে দিলো।

কদিন বাদেই বাবার চিঠি এসে গেল, খুব ভালো বাড়ি পেয়েছেন। কাজে যোগ দিয়েছেন, এবার আমাদের নিতে আসছেন দু'চারদিনের মধ্যেই। অমল দাপাদাপি করতে লাগলো, 'ঈশ্। জামাইবাবুটা কী! আবার নিজে আসছেন। আমি বাবাকে কতো বলে কয়ে রাজি করিয়েছিলাম, কতো ভয়ানক জরুরি প্রয়োজন বলে বুঝিয়েছিলাম, নতুন কুটুম নইলে ভীষণ রাগ করবে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করেছিলাম, আমার সব প্ল্যান ভেস্তে দিল?'

আড়াল বুঝে আমাকে বললো, 'এই, আমি যাবো?'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'তুমি যাবে কি যাবে না তার আমি কী জানি?'

'তোমার কী ইচ্ছে।'

'আমার আবার ইচ্ছে কী?'

'বা রে, আমাকে ফেলে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?'

আমি এর কোনো জবাব দিলাম না। আমার কষ্ট-বাতিক সব সময়েই আমাকে এত কাঁদায় যে তার মধ্যে মাত্র একজনের বিচ্ছেদেই যে কী ইতরবিশেষ হবে সেকথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বাবার চিঠি পেয়ে থেকেই আমার মন খারাপ চলছিলো। তার মধ্যে বলাই বাহুল্য মামীই প্রধান কারণ। তারপর দিদিমা দাদামশায় এঁরা তো আছেনই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমল বললো, 'তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না, না?'

এখানেও আমি চুপ! এ-সব কথা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছিলো না। আমার বাঘার কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো। সেই মুহূর্তে বাঘাকেই আমি সবচেয়ে ভালোবেসেছিলাম। বাঘা দাদামশায়ের এক পথের কুকুর। তা হলে কী হবে—ও বাড়িতে বাঘার প্রতাপ অপ্রতিহত। বাঘার চেহারা প্রায় ভীমসেনের মত। সবাই বলতো এটা সরাইলা কুকুর। এখন যেমন ঘরে ঘরে অ্যালসেশান, তখন তো আর তা ছিল না। অ্যালসেশান নামই কেউ জানতো না। অথচ অ্যালসেশানের মতই বড় কুকুর কখনো কখনো দেখা যেতো। বোধ হয় সাহেবদের কুকুররা বেরিয়ে বাঙালি কুক্কুরীকে গ্রহণ করে এই সব বাচ্চার জন্ম দিত। এরা সরাইলা কুকুর নামেই পরিচিত ছিলো। বাঘা আমার ভক্ত হয়ে উঠতে দেরি করেনি। কাঁধে পা দিলে দাঁড়িয়ে উঠে সে যখন আমার মুখ চাটতো মা রাগে পাখার

বঁটি দিয়ে তাকে মারতে যেতেন। আমি তখন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতাম, 'নারে বাঘা, কেউ তোকে মারবে না। তবে আমি আছি কী করতে ? বাঘার পোকা বেছে দিতাম আমি, লোম আঁচড়ে দিতাম, গলা ধরে আদর করতাম। বলতে গেলে বাঘা আমার প্রাণ ছিলো। সেই বাঘার ভেবেই সে সময় আমি বেশি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ অমল কেন জানি রাগ করলো, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কোনোদিন কথা বলবো না। আমি দেখেছি আমার কোনো কথাই তোমার কানে ঢোকে না।' এই বলে চলে গেল।

তারপর একদিন সকালে বাবা এলেন। এসেই 'চলো চলো।' কী করবেন ছুটি তো নেই। মাত্র এক সপ্তাহের কড়ার। তা যেতেই তো দু'দিন। তার মানে মাঝে পাঁচদিন থাকা। সকলেরই মন খারাপ। মামীর তো সবচেয়ে বেশি। দিদিমা যে কতরকম রান্না করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। দাদু পোস্টাপিস ছেড়ে বারে বারেই চলে আসছিলেন কোয়ার্টারে। এর মধ্যে অমলই কেন জানি অনুপস্থিত। মামী বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবে ও-বাড়ি ? দাদাটার নাকি ফ্লু-মত হয়েছে।'

আমি তো একবাক্যেই রাজি। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, ফ্লু না হাতি। কে একটা মেয়ের সঙ্গে বসে পুরোদমে লুডো খেলছে। মামী বললেন, মেয়েটা ওদের পিসতুতো দাদার শালি।

হোক শালি। আমার যে কী ভয়ঙ্কর রাগ হলো বলতে পারি না। মুখটা হাড়ির মতো করেছিলাম, অমল হেসে বললো, 'খেলবে নাকি ?'

বললাম, 'না।'

'এসো না।'

'না।'

লুডোটা ঠেলে দিয়ে অন্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ এই পর্যন্ত থাক সীতু, আবার কাল।' দেখলাম সীতু নামের মেয়েটি আমার চেয়ে বেশ বড়। শাড়ি পরেছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা গড়ন—। মামী একটা চোখ ছোটো করে জনান্তিকে বললেন, 'কী রে দাদা, ভাবী বৌয়ের সঙ্গে দেখছি খুব প্রেম জমিয়েছিস।' অমল আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, 'যার সঙ্গে জমাতে চাই সে যে পাত্তা দেয় না।'

অমল বড়লোকের একমাত্র ছেলে, অমলের উপরে অনেকেরই বেশ নজর ছিলো। পিসতুতো বৌদি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বোনকে বেড়াবার অছিলায় আনিয়েছিলেন এখানে। অমলের মা-বাবা নিজেরাও মনে করছিলেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাড়িটা যতখানি খালি হয়ে গেছে, ছেলের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে তার কিছুটাও যদি ভরে নিতে পারেন।

আমার যে কী হলো সেদিন—কেন যে ঘুমন্ত শান্ত সরল মনটা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। গুম হয়েই বসে ছিলাম, এক সময় ফাঁক বুঝে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমার আর একদণ্ড অমলদের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। কিন্তু রাস্তায় এসেই বুঝতে পারলাম আমি যে রকম ভিতু মেয়ে তাতে এই অন্ধকারে একা একা বাড়ি ফেরা আর সমুদ্র সাঁতরে পার পাওয়া দুইই সমান। এখন কী করি ? মানের মাথা খেয়ে আবার ফিরে যাই, না দাঁড়িয়ে থাকি ? ভাবতে ভাবতে যখন পাগল হয়ে উঠেছি, পিছন থেকে এসে কে জাপটে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাগো বাবাগো বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম, সে বললো, 'চুপ চুপ। আমি অমল। পালিয়ে এসেছ কেন ?'

সাহস বেড়ে যেতেই রাগে অস্থির হয়ে বললাম, 'বেশ করেছি!'

অমল বললো, 'না, মোটেও বেশ করোনি। খুব খারাপ করেছো।'

'আমি খারাপ করি আর ভালো করি, তাতে তোমার কী?' 'তুমি লুডো খেলছিলে খেলো গে যাও।'

'কেন, লুডো খেলা কি দোষ?'

'আমি বলেছি দোষ?'

'তবে বকছো কেন?'

'ওমা গো আমি আবার বকলাম কোথায়? যে যার বৌয়ের সঙ্গে লুডো খেলবে, তাতে আমি কেন বকতে যাবো।'

'ও, তাহলে বৌয়ের সঙ্গে লুডো খেলাটাতেই তোমার আসল আপত্তি?'

'মোটেও না, কক্ষনো না।'

'মোটেও না, কক্ষনো না—' অমল আমাকে ভ্যাংচালো তারপর সেই বদস্বভাব ছেলেটা বেণী টেনে নিয়ে বললো, 'শিগগির চলো সব্বাই খুঁজছে।'

আমি বললাম, 'না।'

'তাহলে কি পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবো?'

এই সময় আমি একটা খুব পাকা কথা বললাম। বলেই কান গরম হয়ে গেল। বললাম, 'আমাকে কেন পাঁজাকোলা করবে নিজের বৌকে করোগে যাও।' বলামাত্রই অমল সত্যি আমাকে দুহাতে তুলে নিল কানের কাছে মুখ রেখে বললো, 'নিজের বৌকেই তাহলে নিই।'

আমি রোগা ছিলাম খুব, কিন্তু লম্বাও ছিলাম অনেকটা। বই পড়তে শিখেছিলাম ছোট থেকে। বুঝি না বুঝি, ছোটদের বড়দের সব বইই হাতের কাছে পেলে অক্ষর গিলতাম। মামার বিয়েতে সদ্য সদ্য অনেক শরৎচন্দ্র পড়া হয়ে গেছে। তার ফলেই কি সেদিন সেই রাত্রে আমার বুকের মধ্যে অমন একটা অজানা অদ্ভুত কাঁপুনি উঠেছিলো? আমার চোখ দিয়ে নিজে থেকেই জল বেরিয়ে এলো। আমি অন্ধকারেও তা গোপন করতে পারলাম না। কেননা অমলের বুকের গেঞ্জিটা দেখতে দেখতে ভিজে গেল।

তারপরে মাঝখানের দু'দিন, যে দুদিন আর আমরা নীলফামারিতে ছিলাম, সে দু'দিন বলতে গেলে, অমল সব সময়ই আমার মামাবাড়িতে কাটাতে লাগলো। আমি আর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারলাম না।

চলে আসবার আগের দিন সকালবেলা অমল নিভৃত হলো চেষ্টা করে। বললো, 'কালই তো চলে যাবে। খুব ভালো লাগছে, না?'

সেই রাত থেকে একলাফে এগারো বছরের মেয়ে আমি প্রায় চৌদ্দ বছরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার লজ্জা হয়েছিলো, সংকোচ হয়েছিলো, আর বুকের মধ্যে এমন একটা বোধ জন্মেছিলো, যার অনুভূতি পূর্বে কখনো ছিলো না। অমলের কথার জবাবে আমি এই কথাটাই বলতে চেষ্টা করলাম, 'তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে। বলতে পারলাম না। সেই নতুন লজ্জা আমাকে ঠোঁট ফাঁক করতে দিল না।

কিন্তু অমল ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বললো, 'যদি তুমি আমাকে একটু ইচ্ছেও দেখাতে, আমি ঠিক মা বাবাকে বুঝিয়ে চলে যেতাম তোমাদের সঙ্গে।'

আমি তখনো চুপ।

এরপর অমল আস্তে আস্তে চলে গেল।

যাবার দিন দিদিমা আমাদের খাইয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি। অনেক খাবারও দিলেন পথের জন্য। ঘোড়ার গাড়িতে ট্রাঙ্ক বাক্স তুলে দেবার সময় চোখ মুছতে লাগলেন। মামীর তো কান্নার বিরাম নেই। দাদামশায়ও কেমন অস্থির অস্থির ভাব করতে লাগলেন। মাও কাঁদছিলেন। আর বাঘাটা যা করছিলো তা বলার নয়। ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সমানে যে কতদূর ছুটলো তা ঠিক নেই। আর আমি সব বিষয়ে সকলের জন্য ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে, আমিই বসে থাকলাম শুকনো চোখে। আমি কাঁদতে চাইছিলাম, কান্না আসছিলো না।

কাঁদলাম স্টেশনে এসে। দেখলাম একটা পোস্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অমল, তাকে দেখামাত্রই আমার ভিতর থেকে একটা ফোঁপানি উঠে এলো। আমার গলায় প্রায় আওয়াজ বেরিয়ে আসতে চাইলো।

মা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওমা, এই তো অমল। তুমি কোথায় ছিলে? যাবার আগে আমরা সবাই তোমাকে খুঁজছিলাম।'

মৃদু হেসে অমল বললো, 'ভাবলাম স্টেশনে এসেই অপেক্ষা করি, ওখানে সবাই নিশ্চয়ই ব্যস্ত থাকবেন।'

অমল আমার দিকে তাকাচ্ছিলো না।

বাবা বললেন, 'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমিও আসবে আমাদের সঙ্গে। ঢাকা তো যাওনি কখনো, দেখে আসবে শহরটা।'

অমল সলজ্জ, 'যাবো নিশ্চয়ই কোনো একদিন। এখন তো কলেজ খোলা।' এইবার আড়চোখে আমাকে দেখলো, আমার কান্না দেখলো, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো।

আমরা ট্রেনে উঠলাম। তখনকার সেকেন্ড ক্লাস কামরা, খুব ফাঁকা ছিলো, প্রশস্ত ছিলো। মা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, বাবা নিচে নেমে কুলিদের বিদায় দিচ্ছিলেন। আমি আর অমল পাশাপাশি বসে ছিলাম চুপ করে। তারই মধ্যে হুইসিল বাজলো, নিচের যাত্রীরা দৌড়ে দৌড়ে উঠে এলো। বিদায়-দিতে-আসা পরিজনেরা দৌড়ে দৌড়ে নেমে গেলো, গাড়ি দুললো, বাবা এলেন, আর অমলও লাফিয়ে নামলো। আর সেই সময় আমি সব ভুলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে গিয়ে বলে উঠলাম, 'তুমি যেয়ো না অমল, তুমি যেয়ো না।' প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চলন্ত গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত অমলের চোখের জলে ঝাপসা গলা শোনা গেল, 'একটু আগে কেন বললে না?' আর প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে ছাড়তে গাড়ির চাকাও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলো, 'একটু আগে কেন বললে না, একটু আগে কেন বললে না।'

হঠাৎ অমল মরিয়া হয়ে হাত বাড়িয়ে ট্রেনের হাতলটা ধরতে চেষ্টা করলো আমি ঝুঁকে পড়ে সেই হাত ছুঁতে চেষ্টা করলাম, গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল। প্রতিধ্বনিও মিলিয়ে গেল। তখন চাকার শব্দ প্রচণ্ড হয়ে বলতে লাগলো, 'এ কিছু না, এ কিছু না, কত হবে কত যাবে, কত হবে কত যাবে।'

মাদমোয়াজেল গতিয়ে

প্যারিসের কতিপয় আধুনিক যুবক কবি লেফট ব্যাঙ্কের কোনো বিখ্যাত এক সাহিত্যিক মেজাজের গরিব হোটেলে আমাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিল। হোটেলটির প্রায় উল্টোদিকেরই কোনাকুনি একটি দোতলা বাড়িতে একদা 'র‍্যাবো আর ভেরলেন' বাস করতেন। সেকথা শুনে এবং সে বাড়ি দেখে আমরা রোমাঞ্চিত হলাম। মনে মনে ভাবছিলাম এই নিচু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তো কতদিন ওঁরা এই রাস্তা আর এই হোটেলের ভিড় দেখেছেন, এই রাস্তা কতবার এদের পায়ের ধুলোয় ধূসরিত হয়েছে, ভাবতে ভাবতে হৃদয় আবেগে ভরে উঠছিলো।

পার্টিটা সেদিন জমেওছিল খুব এবং মাদামোয়াজেল গতিয়ের সঙ্গে সেখানেই আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। তিনি প্যারিস শহরের একজন বিখ্যাত গায়িকা। তাঁর গলার গান সেই শহরের অনেকের হৃদয়েই বান ডাকায়। সেদিন তিনিও সেই হোটেলে তাঁর বন্ধুবান্ধবের ছোট্ট একটি দল নিয়ে খেতে এসে খুব হইহল্লা করছিলেন। এই দুটি দলেই সেদিন হোটেল কক্ষ প্রায় পূর্ণ ছিল, মুখর ছিল, এমন জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল সবাই যে মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশের বিয়েবাড়ি। সদ্য সদ্য ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে গিয়ে হাজির হয়েছি, ফিসফিস শুনতে শুনতে আর ফিসফিস করতে করতে ওষ্ঠাগত প্রাণে এই চ্যাঁচামেচি প্রায় মধু ঢাললো কানে।

এক সময়ে সেই কলরোল ছাপিয়ে মাদমোয়জেল গতিয়ের কিন্নরকণ্ঠ কেঁপে কেঁপে উচ্চগ্রামে উঠে স্থির হলো। চুপ হয়ে গেল সব ; তারপরেই বাহবা ধ্বনিতে ঘরের দেয়াল ফেটে যেতে লাগলো। তারপর তিনি আর একখানা গাইলেন। শেষ গানখানা গাওয়া হলো সমবেত স্বরে। বোঝা গেল শহরের জনপ্রিয় গান সেটি, সবাই জানে। আমাদের দলের যুবকেরাও তাতে গলা মেলালো।

হোটেলের ঘরটা লম্বায় চওড়ায় ষোল বাই বারোর বেশি না, প্লিনথ রাস্তার সঙ্গে মিশানো, আসবাবপত্র পুরোনো এবং সেকেলে, জানালা দরজার মোটা পর্দা আধময়লা, টেবিলে চেককাটা গোলাপী ঢাকনা, এখানে ওখানে ফুল আছে অনেক, সিলিংয়ের আলো ঝাপসা, দেয়াল ঘেঁষেই কাউন্টার, কাউন্টারে হাসিখুশি ম্যানেজার গিন্নি, পাশের দরজা দিয়ে রান্নাঘর দেখা যাচ্ছে, সুন্দরী যুবতী চারজন পরিচারিকা নীল রংয়ের আঁটো পোশাকে অপ্সরীর মতো আসছে যাচ্ছে দিচ্ছে হাসছে, আধো আধো ভাষায় কথা বলছে, চোখ টিপছে, গানের সঙ্গে মাথা নাড়ছে, আবহাওয়ায় ফুর্তির বন্যা। ফরাসিরা জাত বটে।

একটা হোটেলে এসে খেতে বসে স্ত্রী-পুরুষ মিলে এমন উদ্দাম, উচ্ছ্বাস, টেবিল চাপড়ে এমন জোর গলায় নাচ-গান বন্ধুত্ব আর অবিরল হাসি আমার মত একজন বাঙালি মেয়ের কাছে তো বটেই, পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভূখণ্ডেই বোধহয় অভাবনীয়। তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ আমার পাশের সঙ্গীটিকে স্থানচ্যুত করে মাদমোয়াজেল এসে

বসলেন। ভালো ভালো পানীয় বেশি বেশি খেয়ে খুব আনন্দের মেজাজে ছিলেন, চোখে মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে বললেন, 'ইনদিয়া ?'

আমি খুব খুশি হলাম, বললাম, 'পোশাক দেখেই ধরেছ নিশ্চয় ? মাদমোয়াজেল গতিয়ে চোখ পিটপিট করলেন, নরম গলায় হাসলেন, পরম ফরাসি সুরে ইংরিজিতে বললেন, 'ইনদিয়া আমার স্বপ্ন, সেখানকার সব আমি জানি।' আমি বললাম, 'তাই নাকি ?' এরপরে আলাপ আমাদের রাস্তা পেয়ে অনেক দূর পৌঁছলো। দুই দল এক হয়ে আরো জমে উঠলো আড্ডা। রাত বারোটা বাজলো সেখানে।

মাদমোয়াজেল গতিয়ে প্রস্তাব করলেন, এবার অন্য একটি কাফেতে গিয়ে কফিপান হোক, তারপর অন্য একটি কাফেতে গিয়ে আইসক্রিম হবে। এক বাক্যে সব রাজি। হই হই করতে করতে বেরিয়ে পড়লো সবাই, মাদমোয়াজেল আমাকে বগলদাবা করে ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে চললেন। ফরাসি মেয়েরা দেখতে হাল্কা, সেটা তাদের গড়নের গুণ, কিন্তু লম্বায় চওড়ায় সে তা বলে কম বড় নয়। আমার দেড়া। তার বিদেশী পায়ের সঙ্গে আমার বাঙালি পা কোনোখানেই মিলছিলো না, তাঁর ফ্রকের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আমার শাড়ি পাল্লা দিতে পারছিল না। তিনি হাঁটছিলেন আমি দৌড়োচ্ছিলাম। এক সময়ে বললাম, 'আমাকে ছাড়ো, আমি তোমার সঙ্গে পারছি না।' সে হেসে খুন।

সেই রাত্রে কফি পান করতে দেড়টা বেজেছিল, আইসক্রিম খেতে খেতে তিন। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। আবার থেমে যাচ্ছিল। জুন মাসের মাঝামাঝি বেশি ঠাণ্ডা ছিলো না, আকাশে চাঁদ উঠেছিল, দু'পাশ বাঁধানো স্যেন নদীতে তার ছায়া টলটল করছিল।

সময়টা গ্রীষ্মকাল। প্যারিস শহর ফুলে-পাতায় কুঞ্জবন হয়ে উঠেছে, লাল চেরিতে ঢেকে গেছে আকাশ। কাফেগুলো এতো রাত্তিরেও গিসগিস করছিল লোকে ; এখন আস্তে আস্তে জনবিরল হয়ে আসছে, এখানে ওখানে দু-চারজন প্রেমিক প্রেমিকা বিদায় বেলার গাঢ় আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদিতে নিমগ্ন, লাল-নীল আলোর বন্যায় ফোয়ারাগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

সরু নদীর এপারে ওপারে অসংখ্য চত্বর, অসংখ্য মর্মরমূর্তি। অসংখ্য বই আর ছবির দোকান। পৃথিবীর অন্যান্য শহরের সঙ্গে এই শহরের চেহারা ও চরিত্রের তফাত অত্যন্ত স্পষ্ট। এর এমন একটি খোলামেলা মাঠ-মাঠ ভঙ্গির গড়ন যে রাস্তাকে রাস্তা মনে হয় না, মনে হয় সারা শহরটাই যেন একটা বাগানবাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে সেতু পার হয়ে এপিঠে প্লাস দলা কঁকর্দে এসে সমস্ত দলটি থামলাম। এই বিশাল গোল বাঁধানো চত্বরটি থেকে বারো দিকের বারোটি রাস্তা চলে গেছে এদিকে ওদিকে, সাঁজেলিজে আলোতে ফুলেতে নতুন পাতার কলরোলে তত রাত্রেও সজীব। পৃথিবীর নন্দন কানন। এই নন্দন কাননই একদিন সারা পৃথিবীতে আলো ছড়িয়েছিল। আর ঠিক এই চত্বরেই একদিন ষোড়ষ লুইয়ের অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নী মারী আঁতোয়ানেৎকে দেশের ক্ষুধিত উদ্ধত জনগণ তার সাতমহলা রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে বার করে এনে সকলের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, উৎকট উল্লাসে ছিন্নভিন্ন করেছিল সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে ভরা চাঁদের কণা দিয়ে গড়া ফুলের মত পেলব দেহসৌষ্ঠব। মনে হলো পায়ের নীচে যেন সেই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করলাম। অদূরে জ্যোৎস্না ধোয়া বুর্বপ্রাসাদের চূড়োর দিকে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

দল ভাঙলো এইখানে। মাদমোয়াজেল জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনদিকে ?'

'বুলভার্ব মালশের্ব, হোটেল ফ্লারিডা।' 'মাদলীন গির্জের কাছে ?' বুঝেছি, চলো পৌঁছে

দিয়ে যাই।' পৌঁছে দেবার জন্য অন্য দু'জন যুবকও ছিলো, মাদমোয়াজেলও সঙ্গে এলেন। কথা রইলো এরপরে আবার কোথায় এবং কখন দেখা হবে সেটা তিনি ফোন করে জেনে নেবেন।

দিন তিনেক পরে এক সকালে ফোন করে তিনি নিজেই হাজির হলেন এসে। হাত ঝাঁকাঝাঁকি, চুমু খাওয়া-খাওয়ি খুব হলো একচোট। বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে খুব শুভক্ষণে দেখা হয়েছে, খুব মনে পড়েছে এ কয়দিন।' দিনের আলোয় দেখলুম ভদ্রমহিলার বয়েস খুব বেশি নয়, কিন্তু কোথায় যেন একটা বেদনার ছাপ পড়েছে, মুখখানা অত্যন্ত করুণ। বললেন, 'শোনো কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা গাড়ি পাওয়া গেলে, চলো একসঙ্গে কোথাও ঘুরে আসি।'

আমরা নেচে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

'চলো না ভের্সাইটা ঘুরে আসি।'—

'কাল গিয়েছিলাম।'

'ও, গিয়েছিলে?'

'সেই সঙ্গে শার্ত ক্যাথিড্রেলটাও দেখে এলুম।'

'শার্ত ক্যাথিড্রেল!' চোখ বুজলেন তিনি!—'কার সঙ্গে গিয়েছিলে?'

'তোমাদের ফরাসি সরকার আমাদের সঙ্গে খুব আতিথেয়তা করছেন। রবিবার বাদে প্রায় রোজই একটি গাড়ি, এবং সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে।'

'তাহলে তো খুব ভালো। কিন্তু আজ রবিবার, আজ তোমরা আমার।'

আমি বললাম, 'এবং তুমি আমাদের।'

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এবং আমরা পরস্পরের। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, যেখানে হয় ঘুরবো।'

পাগলের মত ঘুরেছিলাম সেদিন। সেদিনও দলটি আমাদের মন্দ ছিলো না, গাড়ির নির্দিষ্ট সময় উতরে গেলে তাকে বিদায় দিলেন মাদমোয়াজেল গতিয়ে। সেদিনও বাড়ি ফিরতে রাত তিনটে। জোর বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, সেদিনকার আড্ডাটা আরো জমাট হয়েছিল, ফেরবার পথে হাতে হাত ধরে মাদমোয়াজেল গান ধরলেন, 'খদো বাদু বদো বেতে, চাতিদিক ছাতো মেদে' অর্থাৎ খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে। এক বাঙালি বন্ধু নাকি শিখিয়েছিলেন অনেক আগে। উচ্চারণ শুনে হাসতে হাসতে মরি আর কি। কিন্তু সুরে কোথাও ভুল নেই, আর গলা! অতুলনীয়। রাত তিনটের রাস্তায় আমিও সুর মিলোলাম, পথচারীরা দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই গানের সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়ে উঠলো। দুজনে দুজনের শিক্ষাগুরু হলাম। দিন পাখির পালকের মতো হাল্কা হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

মাদমোয়াজেল গতিয়ে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একলা থাকেন। গান গেয়ে ভালোই উপার্জন করেন, সংসারের কাজ করেন নিজের হাতে। অবিশ্যি সে দেশের সব মেয়েই তাই করে, কিন্তু তিনি কর্মঠ, নিরলস। কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিয়ে করোনি কেন?' মাদমোয়াজেল হাসলেন, 'মাদাম হবো তেমন ভাগ্য বোধহয় আর হলো না এ জীবনে।'

'কতো লোকের হৃদয় ভেঙেছ সত্য করে বলো।'

মাথায় টোকা দিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন আমাদের গান জমলো না, হঠাৎ বললেন, 'চলো তোমাকে একটা নাইট ক্লাবে নিয়ে যাই, স্ট্রিপটিজ দেখেছ?'

'ভাবছি প্যারিস ছাড়বার আগে দেখবো একদিন। এমন অদ্ভুত ব্যাপার না দেখে কি পারি ?'

'আজই চলো না। কৌতূহলটা মিটে যাক।'

'বেশ তো, চলো না—'

আমি তখন বুঝিনি মাদমোয়াজেল হঠাৎ কেন আমাকে স্ট্রিপটিজ দেখাতে চাইলেন, পরে বুঝলাম। ফেরার পথে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হলো !'

আমি তাকিয়ে থেকে বললাম, 'টাকার জন্য কি সব সম্ভব ?'

মাদমোয়াজেল বললেন, 'সব। নইলে কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় তার দেহ থেকে এভাবে আবরণ উন্মোচন করতে পারে, বলো ?'

'এদের মা বাপ আছে ? বাড়িঘর বলে কিছু আছে ? নাকি এরা বহুবল্লভা। আলাদা একটা জাত ?'

মাদমোয়াজেলের চোখে করুণা ঝরে পড়লো। আস্তে বললেন, 'বেশি রাত হয়নি, চলো কাফেতে গিয়ে বসি। এদের মধ্যে কোনো একটি মেয়েকে আমি চিনতাম তার গল্প তোমাকে শোনাবো। তাহ'লেই বুঝবে এরা কী।'

কাফেতে বসে মাদমোয়াজেল ভ্যাঁদ'অর নিলেন, আমি কফি। তিনি গল্প বললেন।

একটি তরুণীর বাপ মারা গেল, মা পঙ্গু হলেন, ভাইবোন চারটি। প্রতিবেশীরা মেয়েটিকে একটা উলের দোকানে কাজ জুটিয়ে দিল। সামান্য মাইনে, লাঞ্চটা ফ্রি। প্রচুর খাটুনি ছিলো সেখানে। দোকানের পাড়াটা ভালো ছিল না, বিচিত্র স্বভাবের লোক আসতো, তার মধ্যে লোভী বুড়োরাই আসতো বেশি। তারা তাকে তাদের সঙ্গে ডেট করতে বলতো, পয়সার লোভ দেখাতো, মেয়েটির ঘেন্না করতো। এই করে করে যুবতী হলো সে। সংসারে সব মিলিয়ে মুখ তাকে নিয়ে ছ'টি, উপার্জন তার একলার। বলাই বাহুল্য, আধপেটাও চলতে চাইতো না। একদিন মরিয়া হয়ে দোকানের কাজটা সে ছেড়ে দিল। লেখাপড়া তো শেষ করার সুযোগ হয়নি যে তা ভাঙিয়ে খাবে, অন্য কাজ পাওয়া দায় হয়ে উঠলো আর সেই সঙ্গে এই চাকরি ছাড়লো বলে তার মা হৃদয়হীন হয়ে উঠলেন। এক উপায় ছিল চরিত্র ভাঙিয়ে খাওয়া, সেটা সে কিছুতেই পেরে উঠলো না। শেষে খোঁজ পেয়ে এক চিত্রকরের কাছে তার ছবির মডেল হতে গেল। প্রথম প্রথম গায়ের জামাকাপড় ছেড়ে একজনের চোখের সামনে দাঁড়াতে তার গ্লানির অবধি থাকতো না, শরীর শক্ত হয়ে যেতো, দু'টো হাত আড়াআড়ি হয়ে পড়ে থাকতে চাইতো বুকের উপর, ধমক খেতো, কিন্তু উপার্জন হতো অনেক বেশি। তাই পেশাটা ছাড়তে পারতো না। শেষে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিল। ক্রমে অভ্যেস হয়ে গেল। শেষে যেন কিছুই নয়, এমনিভাবে সে চটপট জামা কাপড় ছেড়ে দাঁড়াতে পারত চিত্রকরের চোখের তলায়। এমন কি সেই চিত্রকর যখন খুব মনোযোগ দিয়ে তার শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গ আঁকতেন দরকার হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন বা ছুঁতেন তখনো তার কোনো বিকার হতো না। পারিশ্রমিকটাই ছিলো লক্ষ্য। তার দেহ সুগঠিত ছিল, আস্তে আস্তে মডেল হিসেবে নাম হলো তার। একই সঙ্গে সে দু'তিন জনের কাছেও কাজ করতে যেতো। ঈভের সরলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, শুয়ে থাকতো, বসে থাকতো যা তাঁরা চাইতেন, তাই করত। কিন্তু ব্যক্তির তারতম্য থাকত সেখানে, লোভী চিত্রকরের সংখ্যাও কম ছিল না। এমনও কতদিন হয়েছে, আচমকা রং তুলি পেন্সিল ফেলে উঠে গেছে কেউ, কেউ সব ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে, কেউ

ইঙ্গিত করেছে, কেউ আহ্বান করেছে—মেয়েটি নিস্তরঙ্গ। তার বাড়িতে তখন অসুখে-বিসুখে ওষুধ গেছে, ভাইবোনেরা ছেঁড়া পোশাকের বদলে আস্ত পোশাক পরেছে, নিজের দু' একটা ভালো ফ্রক হয়েছে, খেয়ে পেট ভরেছে সকলের।

এই করতে করতে একদিন এক চিত্রকরকে ভালো লেগে গেল, তার স্পর্শে তার যৌবন জাগ্রত হয়ে উঠলো, পৃথিবীটাকে আর তত নীরস লাগল না, গলার গান আপনিই উচ্ছ্বিত হতে থাকলো। সেই চিত্রকরকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছিল, বলেছিল, 'এসো আমরা বিয়ে করি।' চিত্রকর হেসে উড়িয়ে দিল সে কথা। পরে টের পাওয়া গেল, প্রেমিকার অভাব নেই তার। বিভিন্ন শরীরে বিচরণ করতে ভালোবাসে সে। এ ব্যাপারে মেয়েটি ভয়ানক আঘাত পেল। ব্যর্থ প্রেমের প্রথম আঘাত। লাগল খুব। মনের দুঃখে ছেড়ে দিল ঐ লাইন।

আবার গ্রাসাচ্ছানের ভয়ঙ্কর তাগিদ, আবার ছেঁড়া নোংরা আর ক্ষুধা। আবার মায়ের অপরিসীম হৃদয়হীনতার বেদনা। ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে এক বন্ধুর সহায়তায় দু' মাসের মাথায় আবার একটা কাজ পেল সে। গাইতে পারত, মিষ্টি গলা ছিল, ছোট একটা নাইট ক্লাব চটুল গানের জন্য নিয়ে নিল তাকে। সেই ক্লাবে প্রথম রাত্রিটা গান হত, দশটার পরে বারোটা পর্যন্ত জ্যাজ বাজত, জ্যাজের তালে তালে একদল মেয়ে পিছন নাড়াতো, একদল মদ পরিবেশন করতে করতে চোখ মারতো, কুৎসিত ইঙ্গিত করত। বারোটার পরে স্ট্রিপটিজ। চলত সারারাত।

শুধু গান গেয়ে যা রোজগার হত তাতে কেবলমাত্র খাওয়াটুকুর সংস্থান হত বটে, অন্য আর কিছু চলত না। চিরদিন সংসার তার উপরই ঠেস দিয়ে চলেছে, সেটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সকলের, সকলে স্বার্থপর হয়ে গিয়েছিল, সবচেয়ে বেশি হয়েছিলেন তার মা। রোজগার কমে যাওয়ায় তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। শুয়ে শুয়েই তিনি তাকে গালিগালাজ করতে লাগলেন, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জোট হয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে লাগলেন। তখন সে মায়ের যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে বেশি উপার্জনের জন্য গানের পরে জ্যাজের সঙ্গে কোমর ঢুলোবার কাজটাও নিয়ে নিল। একটু আয় বাড়ল এবার। একটু সচ্ছলতার মুখও দেখল, খুশি হলো ভাইবোনেরা। মার মেজাজ প্রশমিত হল। তিনি মনে করতেন, মেয়ে তাদের খাওয়াতে পরাতে বাধ্য, কিন্তু মেয়ে কীভাবে কী করছে, নিজে কী খাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কোন পথে উপার্জন করছে এ সবে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আর সেই কারণেই রোজগার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাহিদাও বেড়ে গেল। সংসারটা তিনিই চালাতেন, তাঁর আদেশে নির্দেশেই সব হত। খরচ এমন বাড়িয়ে দিলেন যে, আবার টানাটানি শুরু হল। দারিদ্র্য। দারিদ্র্য। দারিদ্র্য। ঘেন্না করত মেয়েটির, নোংরা লাগল। সে সইতে পারত না অভাবের যন্ত্রণা। বাড়ি ফিরে জানালা দরজার পর্দাগুলোর দিকে তাকাত প্রথম, তারপর আসবাবপত্র, তারপর বিছানা বালিশ, ভাইবোনের পোশাক-আশাক, সমস্তটা মিলিয়ে একটা জঘন্যতার ছবি। কিছু বলার উপায় নেই, মা অমনি চিলের মত চেঁচিয়ে উঠবেন, বলবেন, যা আনছো তাতে এর বেশি হয় না। কিন্তু মেয়েটি জানত সব। আর কিছু না হোক, সবাই মিলে খাটলে ঘরবাড়ি অন্তত পরিস্কার রাখা যায়। শেষে মেয়েটির মনে সন্দেহ হল, মা লুকিয়ে টাকা জমাচ্ছেন।

মেয়েটি যখন যে কাজে গেছে, কোথাও ফাঁকি দেয়নি। তাছাড়া, আগেই বলেছি, তার ফিগার ভাল ছিল, বাইশ বছরের উদ্ধত যৌবন ছিল, জ্যাজের সঙ্গে তার কোমন

ঢুলিয়ে নাচার আকর্ষণে লোক জমতো। ম্যানেজার প্রস্তাব করলেন, বেশি রাত্তিরের কাজটা সে নিতে রাজি আছে কি না। শুনে তার কান লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু লজ্জা কী? জামা কাপড় সরিয়ে শরীর তো অনেক দেখিয়েছে। পুরো তিন বছর মডেলের কাজ করেছে সে। তবু কী লজ্জা। কী লজ্জা। কী অসম্মান। স্ট্রিপটিজের কাণ্ডকারখানা তো সে দেখেছে? যখন স্টেজে আসে, পোশাকের বস্তা হয়ে আসে। শরীরের এক ছিটে মাংস দেখতে পায় না কেউ। তারপর ধীরে ধীরে দর্শকদের লুব্ধ করে করে বাসনা কামনায় জর্জরিত করতে করতে একটি একটি করে উন্মোচিত করতে থাকে দেহ। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ দেখাতে গিয়ে কৃত্রিম লজ্জার অভিনয়টাই সবচেয়ে জঘন্য।

বাড়ি গিয়ে মেয়েটি চুপ করে পড়ে রইল বিছানায়।

ম্যানেজার বললেন, 'কী, রাজি?'

মেয়েটি সোজা বললো, 'না।'

'কেন? কী দোষ? অভ্যেস করলেই হয়ে যাবে। তুমি মডেল হতে, শরীর কি দেখেনি কেউ? বরং মডেলের অসুবিধে বেশি, ভয় থাকে, কোন চিত্রকর কেমন হবে বলা যায় না, তারা ছবি আঁকার নামে তোমাকে লাঞ্ছনা করতে পারে। কেননা, ওটা ব্যক্তিগত। এখানে তা পারবে না। সময় নাও—মাথা ঠিক করে ভাবো গিয়ে বাড়িতে। এতে তোমার প্রচুর উপার্জন হবে, ভালো মত খেয়ে পরে সুখে থাকবে, অমন সুন্দর গলা, গান শিখতে পারবে পয়সা খরচ করে, শুনেছি কিছু কিছু আঁকো, তাও শিখতে পারবে। প্রথমে তোমাকে বেশিক্ষণ কাজ করতে হবে না, একবার শুধু স্টেজে গিয়ে শরীরটা দেখাতে না দেখাতেই ছুটি করে দেবো। মনে তোমার যদি কোনো কালি না থাকে তাহলেই হলো। রাতের গ্লানি তোমার কি আর দিনের বেলায় মনে থাকবে?'

কথাগুলো মনে ধরলো। সত্যি তো, এতো আর সে জোচ্চুরি করছে না। যে সব লোভী পুরুষ ডেট করে পয়সা দিতে চায়, এবং যে-সব মেয়ে বোকা ঠকিয়ে ভালোবাসার ছলনায় সেটা আদায় করে, এ কি তার চেয়ে খারাপ? এর মধ্যে কোথায় মিথ্যে আছে? কোথায় হীনতা? কে তোমার আত্মাকে ছুঁতে পারবে? শরীর তো আবরণ মাত্র, কেউ যদি দূর থেকে দেখেই তার বিনিময়ে পয়সা দেয় বাধা কি নিতে? এর মধ্যে লজ্জা আছে, সততার অভাব নেই।

কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি যতই দিক না, মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে রইলো। ভাইবোনদের খুব বকলো তার উপর বসে খায় বলে, মা যখন প্রতিবাদ করলেন, মাকেও ছাড়ল না। মুখের কাছে প্রায় অভদ্রের মত হাত নেড়ে বলল, 'তোমার তো টাকা হলেই হলো। মেয়ে যদি উলঙ্গ হয়ে নেচেও টাকা আনে, তাতেও তোমার আপত্তি নেই। মাও সমান তালে চ্যাঁচালেন, 'আহাহা। কী আমার সতীরে। তা যেন আর নাচে না।'

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো মেয়েটি, তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই আমি চললুম।' বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, 'হ্যাঁ, তাই নাচব ; কিন্তু তোমাদের জন্য নয়, নিজের জন্য। নিজে সুখী হবার জন্য। তোমরা এবার দ্যাখ, কত ধানে কত চাল। কুকুরের গলায় টিন বেঁধে ভিক্ষে নাও আর বড়লোক দেখলে টুপি পাতো, আমি দেখতে আসবো না।

সেই ঝোঁকের মাথায়ই সে ম্যানেজারকে গিয়ে নিজের সম্মতি জানিয়ে এল।

প্রথম রাতটা মেয়েটি আগুনের উপর দিয়ে হেঁটেছিল। সারা শরীরটা যখন লেস

আর লিনেনের স্তূপে ঢেকে স্টেজে গিয়ে দাঁড়ালো, করতালিতে ফেটে পড়লো সব। এটা তার যৌবনকে অভিবাদন। দর্শকদের পছন্দ হয়েছে তাকে। ম্যানেজার স্টেজ থেকে নেমে পাদপ্রদীপের সামনে এসে তাকালেন তার দিকে, চোখে চোখে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তার নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পেল। আস্তে আস্তে আলো নিবে গেল প্রেক্ষাগৃহের লোকগুলোকে তত স্পষ্ট দেখা গেল না, একটু যেন কমলো কাঁপুনি। এক পাক নেচে নিল সে। নাচতে নাচতে উপরকার আলগা কাপড় চোপড় গুলো খুলে ফেললো বটে, কিন্তু ভিতরেরটা খুললো না। কিছুতেই পারল না। তাইতেই দর্শকরা যথেষ্ট পুলকিত হলো। কিছু কিছু লোক চ্যাঁচালো বটে, শুধু ম্যানেজার গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি জানেন, এসব প্রথম দিনেই হবার নয়, তিনি পুরো টাকার দ্বিগুণ দিলেন মেয়েটিকে। তিনি বুঝেছিলেন, এই মেয়ে দিয়ে মঁমাৎ-এর অন্য নাইট ক্লাবগুলো একেবারে নিষ্প্রভ করে দিতে পারবেন তিনি।

পরের দিন গেটের কাছে ব্যান্ড বাজিয়ে লোক ডাকবার ধূম পড়ে গেল, মেয়েটির অর্ধনগ্ন পুষ্টদেহের পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল দেয়াল, জলের মত কলকলিয়ে লোক ঢুকতে লাগল। সেই রাত্রে মেয়েটি একটু কম নারভাস হল, তারপর তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন, পঞ্চম দিন, ষষ্ঠ দিন, এক মাস দু' মাস, চার মাস, ছ' মাস, করে যেন একেবারে শিশুর মত নির্লজ্জ হয়ে গেল উলঙ্গ হতে।

পুরো ছ' বছর রাতের পর রাত এই কাজ করেছে সে। একেবারে কলের মত করে গেছে। ম্যানেজারকে যত বড়লোক করেছে, নিজেও তার চেয়ে কম হয়নি। ভালো ফ্ল্যাট নিয়েছে, ভাল পোশাক পরেছে, ভাল খেয়েছে। সবচেয়ে ভাল গাইয়ের কাছে গান শিখেছে। কিন্তু ভক্তের ভিড় জমতে দেয়নি বাড়িতে। কাজ সাঙ্গ হলেই সেই জীবন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে, স্নান করে এক পট কফি নিয়ে বসে গান প্র্যাকটিস করেছে, নয়তো ছবি এঁকেছে। থেকেছে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ।

কোনো এক রাতে যখন সে নাচতে নাচতে শেষ আবরণটুকু পর্যন্ত খুলে ফেললো, হঠাৎ সামনের আসন থেকে শব্দ করে বমি করে ফেললো একটা লোক। মেয়েটি চকিতে তাকালো সেদিকে। কালো কুচকুচে এক মাথা চুল, টানাটানা কালো চোখ, আর কালো রঙের এক যুবক মুখে রুমাল চাপা দিয়ে শিউরে শিউরে উঠছিলো। বোঝা গেল ভীষণ ঘেন্না করছে তার। মেয়েটির বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটলো। সে অনুভব করলো এই ঘৃণার পাত্রী সে নিজে। টাকার জন্য নিজেকে সে এই হতে দিয়েছে। ছুটে ভিতরে গিয়ে বেসমেন্টের বড়ো ড্রেসিংরুমে চলে গেল। দেয়ালজোড়া সব আয়না, চারদিকে নিজের নগ্ন দেহের প্রতিফলন দেখতে দেখতে তারও গা গুলিয়ে এলো। দ্রুত হাতে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে, ফ্রক পরে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো বাইরে, একটু আলো-আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো। যার জন্য দাঁড়িয়েছিলো, একটু বাদেই দেখা গেল তাকে। তার সঙ্গে অন্য একজন যুবক ছিলো, বোঝা গেল সেই নিয়ে এসেছিলো নাইট ক্লাব দেখাতে।

কালো ছেলেটিকে অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। হতাশ গলায় বললো, 'এই! এই দেখাতে তুমি নিয়ে এসেছো আমাকে? এই দেখিয়ে তুমি আমাকে ফুর্তি দেবে, খারাপ মন ভালো করবে? কেন, আমি কি কুকুর?'

অন্য যুবকটি বললো, 'তুমি কুকুর বেড়াল কিছু নও, আস্তো একটি ইডিয়েট, ওখানে তুমি বমি করে ফেললে? ছি ছি! যাও, হোস্টেলে গিয়ে পাদ্রি হয়ে ঘুমিয়ে থাক, আমি

টিকিট কেটেছি, নষ্ট হতে দেবো না।' এই বলে সে আবার ঢুকে গেল ভিতরে। কালো ছেলেটি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো ফুটপাত ধরে ধরে।

মেয়েটির মুখে নেটের আবরণ ছিলো। সে-ও ভিড় বাঁচিয়ে উল্টো ফুটপাতের আলোয় তাকে নজর করে হাঁটতে লাগলো। ক্লাবগুলোর আওতা ছাড়িয়ে যখন নির্জন রাস্তায় নামলো ছেলেটি, সে গিয়ে কাছাকাছি হলো, বললো, 'একটা কথা।'

ছেলেটি অন্যমনস্ক ছিলো, একটু চমকে গেল, বললো, 'বলুন।'

'আপনার দেশ কোথায়?'

'ভারতবর্ষ।'

'আপনি কি ছাত্র?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন এসেছেন?'

'ছ' মাস।'

'এখানে কেন এসেছিলেন?'

'দেখতে।'

'স্ট্রিপটিজ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো লাগলো?'

'ভালো? না। দুঃখ হলো, ঘেন্না করলো।'

'দুঃখ হলো? দুঃখ কেন?'

'যে মেয়েটি নাচছিলো সে বড়ো সুন্দর।'

'তাতে দুঃখের কী আছে?'

'সে কেন এই কাজ নিতে গেল, অন্য কাজ করলে কতো মানুষকে সুখী করতে পারতো।'

'এও তো কতো মানুষকে সুখী করছে।'

'সুখী! এ দেখে মানুষের সুখ হয়?'

'না হলে আসে কেন?'

'বমি করতে আসে। বমি। বমিরও নেশা আছে।' বলতে বলতে আবার সে মুখে রুমাল চাপা দিল।

মেয়েটি বললো, 'ইন্ডিয়ানরা পিউরিটান, তাদের রক্ত ঠাণ্ডা, মন জেলিফিশের মতো।'

তর্ক না করে ছেলেটি বললো, 'হয়তো তাই।'

'এখানে এসে আপনি কি কারো ভালোবাসায় পড়েছেন?'

'না।'

'এখানকার মেয়েদের ভালো লাগছে না আপনার?'

'খুব।'

'তবে?'

'তা বলে ভালোবাসায় পড়তে হবে? ভালোবাসা কি এতো সহজ?'

'ভালোবাসার চেয়ে সহজ আর কি আছে জীবনে ?'

'সহজ বলেই কঠিন। এতো আর রাস্তার লোককে ভালোবাসা নয়, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা নয়, ভগবানের ইচ্ছার বন্ধনে জড়িত মা বাপ ভাই-বোনকে ভালোবাসা নয়, এই এক ধরনের আত্মিক ভালোবাসা, এর অনেক চাহিদা, সে রকম কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'একটা অনুরোধ করবো ?'

'নিশ্চয়।'

'একদিন আপনি আমার বাড়ি বেড়াতে আসবেন ? এই আমার ঠিকানা।' মেয়েটি ঠিকানা লেখা একটা কার্ড ব্যাগ থেকে বার করলো, বললো, 'কোনো নির্দিষ্ট দিন আমি দিচ্ছি না, কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই, যদি ইচ্ছে হয়, ফোন করবেন, আমি অপেক্ষা করবো।'

'বেশ তো !' কার্ডটি হাতে নিল ছেলেটি। এরপর মেয়েটি বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেল নিজের ফ্ল্যাটে। পরের দিন ম্যানেজারকে লিখে পাঠালো, 'শরীর খুব অসুস্থ হওয়ায় কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছি, বর্তমানে কিছুকাল কাজ করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। আমার প্রাপ্য টাকাটা যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন বাধিত হবো।'

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন ম্যানেজার। সবে ক্লাবটা উজিয়ে উঠেছে এর মধ্যেই নায়িকার অবসর গ্রহণ ? টাকার প্রলোভন যতোদূর সম্ভব দেখালেন তিনি, মেয়েটি রাজি হলো না, তার মুখে ঐ এক কথা আমার শরীর খারাপ।

বলাই বাহুল্য কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই আবার অসুবিধায় পড়ে গেল সে। কিন্তু এখন সে একা, কারো চোখ রাঙানি নেই, বিরক্তি নেই, অনেক মুখের চাহিদা নেই। তবুও অভাবের কষ্ট আর সইছিলো না তার। আবাল্য অভাবে থেকে থেকে অভাবকে সব কিছুর চেয়ে তার ভয়াবহ মনে হতো। ঘুরে ঘুরে গান শেখানোর কাজ পেলো দুটি। কিন্তু যার জন্য এই অপেক্ষা তার কিন্তু দেখা নেই। মেয়েটি মনে মনে ভেবে দেখলো সেই চিত্রকরের পরে এই ক্ষণিক দেখা যুবকটিই আবার তার মনে রং ধরিয়েছে। তাকে ভাবতে তার ভালো লাগছে, তাকে ভেবে ভেবে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে সে। সে প্রতীক্ষা করে করে কষ্ট পেতে লাগলো। মাস তিনেক কেটে যাবার পরে যখন সে আশা ছেড়ে দিল, এক সন্ধ্যায় একটি ফোন এলো।

'হ্যালো।'

'শুনুন, আমি একবার এই ঠিকানায় আসতে চাই।'

'কী দরকার ?'

'কিছু না, কিন্তু এই ঠিকানার একজন মহিলা আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম—'

'ও, আপনি ! আপনি ! নিশ্চয়ই। নিশ্চয়। কখন ? কবে ? কবে আসবেন ?'

'আপনিই কি তিনি ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনিই বলুন কবে আপনার সুবিধে।'

'এখন আসতে পারেন ?'

'পারি।'

'তবে আসুন।'

ফোন ছেড়ে মেয়েটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, হাত-পা কাঁপতে লাগলো তার, সে বুঝলো ঘৃণা দিয়েই এ যুবকটি জয় করে নিয়েছে তাকে। তার বুক আনন্দে ফেটে যেতে লাগলো।

ছেলেটি বোধ হয় বাড়ির কাছাকাছি এসেই কোথা থেকে ফোন করেছিলো, তিন মিনিটের মধ্যে এসে গেল। আর এসেই আলোর তলায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। 'আপনি।' তার মুখ থেকে এই শব্দটি খসে পড়লো।

মেয়েটি ম্লান হেসে বললো, 'আমিই তো, আমার সঙ্গেই আপনার পথে কথা হয়েছিলো।'

'কিন্তু—'

'হ্যাঁ, এই আমিই সেই নাইট ক্লাবে নেচেছিলাম।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আমিও মানুষ। হৃদয় মন সততা ভদ্রতা মমতা সব বৃত্তিই আমার আর পাঁচজন মানুষের মতোই আছে, আর সেটা দেখাতেই আমি আপনাকে ডেকেছি।' বলতে বলতে মেয়েটির চোখে জল এসে গেল।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'আমি যাই।' মেয়েটি নিঃশব্দে তাকে লিফট পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিল। আর মেয়েটির ! তার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে সে চলে যাবার পরে অদ্ভুত এক ইচ্ছে হলো ইচ্ছা করলো, বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু কিছুই করলো না, কিছুই খেলো না, চুপচাপ বসলো এসে ব্যালকনিতে। হাতের ভাঁজে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, দিন তিনেক পরে আবার ফোন করলো ছেলেটি, 'একবার আসবো ?'

মেয়েটি চুপ করে থেকে বললো, 'কেন ?'

'ইচ্ছে করছে।'

'ঘৃণা করছে না ?'

'না।'

'আমি যে নাইট ক্লাবে নাচি তা কি আপনি ভুলে গেছেন ?'

'ভুলবো কেন ?'

'তবে ?'

'সেটা আপনার চাকরি, আপনি নন।'

'আমি আর আমার চাকরি কী আলাদা ?'

'ভেবেছিলাম আলাদা নয়, আপনাকে দেখে অন্য রকম মনে হচ্ছে।'

'তাই দয়া করে বন্ধুত্ব করতে আসছেন ?'

'দয়া ! না দয়া নয়।'

'কী।'

'কী আমি জানি না।'

মেয়েটি বললো, 'আসুন।'

সেদিনের মতো আবার তিন মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলো। বসলো, কফি খেলো, যাবার সময় সেদিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইলো।

এর পরে মধ্যে মধ্যেই আসতে লাগলো সে। বেশিক্ষণ থাকতো না, যতোটুকু আসতো চুপ করেই থাকতো বেশি, উঠে যাবার সময় তাকিয়ে থাকতো অনেকক্ষণ।

একদিন বললো, 'আপনার কাজটা ভালো না।'

'কেন ?'

'এতে মানুষের অকল্যাণ হয়।'

'কোন মানুষের ? যে নাচে তার, না দর্শকদের।'

'দর্শকদের।'

'তবে তারা আসে কেন ?'

'নরকের টানে।'

'নরক !'

'নরকটা সৃষ্টি না করলে কী হয় ? অথবা অন্য যার খুশি করুক, আপনি না।'

'উপার্জন না করলে খাবো কী ?'

'এ-রাস্তা ছাড়া কি রাস্তা নেই ?'

ঈশ্বরের দেওয়া এই শরীরটাই আমার একমাত্র যোগ্যতা। আগে আমি চিত্রকরের মডেল হতুম, তাতে বিপদ বেশি। বরং এতেই আমি এক রকমের শান্তিতে আছি। অনেকগুলো লোভী চোখ আমাকে দেখে বটে, কিন্তু আমার মনে কোনো বেদনা দিতে পারে না, তারা জানে আমি তাদের নাগালের বাইরে।'

'ও, আচ্ছা।'

চুপ করলো ছেলেটি। একটু পরে বললো, 'আপনার ঘর-সংসার করতে ইচ্ছে করে না ?'

'করলেই বা পাই কোথায় ?'

'বিয়ে করুন না।'

'প্রেমিক জোটে অনেক, স্বামী জোটে না।'

'আপনাকে আমার পছন্দ হয় ?'

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হেসে ফেললো, 'পছন্দ কেন হবে না।'

'যদি পছন্দই হয়, তবে আমাকে বিয়ে করুন না।'

'সে কী !'

আমি ভেবে দেখেছি যে, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি সারাক্ষণ আপনার কথা ভাবি। দেরিতে দেরিতে এলে কী হবে, আপনি ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগে না।'

এ রকম সহজ সরল ভালোবাসার স্বীকৃতি এবং বিয়ের আবেদন সেই যুবক ব্যতীত আর কে করতে পারতো। মেয়েটি চুপ করে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে বললো, 'রাগ করলেন কি ? দেখুন আমি জানি, আমি মানুষটা একটু খাপছাড়া, যা মনে হয় বলে ফেলি। আমি বরং আর আসবো না, সেই ভালো।' মেয়েটি তখন মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলো, 'প্রভু, এ তোমার কী খেলা ! সত্যিই কি তুমি করুণাময় ?'

ছেলেটিকে বললো, 'তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, আমাকে দয়া কোরো না, এই নোংরা জীবন থেকে উদ্ধার করার মহৎ ব্রত নিয়ো না যদি সত্য ভালোবেসে থাকো তা হলেই গ্রহণ কোরো।' খুশিতে ঝকমকে হয়ে উঠলো তার চোখ। শান্ত হয়ে বসে বললো,

'আমার বয়েস তিরিশ, দেশে বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু, মালিক একা আমিই, আমার মা বাবা কেউই নেই, লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করতে পারি না, এখানে সাহিত্য পড়তে এসেছি। আর আমার চেহারা তো তুমি দেখতে পাচ্ছ। এই আমি পাত্র। মনে ধরে?' মেয়েটি হাঁটু ভেঙে পায়ের কাছে বসে দু হাতে মুখ ঢাকলো।

আর সেই সুখের দিনে দু বছর ধরে ত্যাগ করে আসা পঙ্গু মা আর অনাথ ভাইবোনদের মনে পড়ে গেল তার। প্যারিস থেকে সাতান্ন মাইল দূরে নিজেদের গ্রামে তখন বাস করছিলো তারা। সামান্য জমি ছিলো, ঘোড়ার লাঙল দিয়ে সেই জমি চষিয়ে তারা বার্লির খেত বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলো, একটা বোন বড়ো হয়ে উঠে ভীষণ বেগে প্রেম করে নিত্যনতুন সাজে সজ্জায় নিত্যনতুনের চোখ ধাঁধাচ্ছিলো। সব খবরই রাখতো সে, দরকার মতো টাকাকড়িও যে কিছু কিছু না দিত তা নয়, কিন্তু দায়িত্ব ছিলো না, সম্পর্ক ছিলো না।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে একদিন সেখানে গেল। যাবার আগে ঘুরে ঘুরে তার জীবনের এই আশ্চর্য সুখের খবরটা পরিচিত সকলকেই জানিয়ে গেল। বোধ হয় সেইটাই তার ভুলে হয়েছিলো। কে জানে।

মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে একটা রাত সে রইলো তাঁর সঙ্গে। অনেক সুখ দুঃখের কথা হলো। মা ক্ষমা চাইলেন তার কাছে, আশীর্বাদ করলেন, বলেছিলেন একবার যেন জামাইকে নিয়ে সে আবার আসে।

ছেলেটির সঙ্গে একদিনের অদর্শনেই কাতর হয়ে উঠেছিলো মেয়েটি। শহরে ফিরে সে প্রথমেই তার আস্তানায় গেল। ঘর বন্ধ দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলো, আগের দিন নাকি অনেক জিনিসপত্র কিনে বিকেল ছটা নাগাদ ফিরেছিলো, তখুনি কে একজন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত আর তাকে কেউ দেখেনি।

সে কী কথা? মেয়েটি চিন্তিত হয়ে ফিরে এলো নিজের ফ্ল্যাটে। সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলো। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেল তবু সে এলো না। টিকতে না পেরে মেয়েটি আবার এলো তার হোটেলে। শোনা গেল তখনো সে ফেরেনি। লবিতে বসে রইলো সে। বসে বসেই রাত দশটা বেজে গেল। দৌড়ে আবার নিজের ফ্ল্যাটে এলো, আবার দৌড়ে হোটেলে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো, কোথাও নেই।

পরের দিন ভোর না হতেই আবার এলো হোটেলে আবার ফিরে গেল। তারপর যতো জায়গা সম্ভব বলে মনে হলো সব জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলো, কোথাও নেই। ততক্ষণে হোটেলের মধ্যেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। খোঁজ নেওয়া হলো হাসপাতালে হাসপাতালে, কেউ কোনো সংবাদ দিতে পারলো না। তারপর পুলিশে খবর গেল, পুলিশ এসে দরজা ভাঙলো। ঘরভরা সব বিয়ের জিনিস ছড়ানো। একজন মেয়ের জন্য যা কেনা যায়, যতো কেনা যায়, সারা প্যারিস শহর তচনচ করে সব কিনেছিল বোধ হয়। শুধু মানুষটিই নেই। নেই। নেই। কোথাও নেই।

জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে ঐ একটি কথাই প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো নেই, নেই, সে নেই, সে নেই।

মেয়েটি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল, সরকারে আবেদন করলো, পুলিশের পিছনে সর্বস্ব ঢাললো, ছেলেটির দেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করলো, সব নিস্ফল হলো। ভাঙা হৃদয়ে শয্যা নিল সে।

একান্ত মনে বললো, 'যদি জীবনে কখনো কোনো অন্যায় না করে থাকি, তবে এই শয্যাই যেন আমার শেষ শয্যা হয়।' কিন্তু কী আশ্চর্য। তা হলো না। সে বেঁচে রইলো। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অনুভব করলো, 'সে নেই', তবু তার খিদে পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিলো না, তবু সে দেখলো সে নিজেই যেন কখন শয্যা ছেড়ে উঠে খাবার খুঁজছে। আর তারপর তার শরীর মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চূর্ণ করতে করতে কখন যেন দশটা বসন্ত পার হয়ে গেল, তবু সে ফিরলো না।

গল্প শেষ করে মাদমোয়াজেল গতিয়ে চোখ নিচু করলেন। তার রঙিন ফ্রকের হাঁটুতে গাছের পাতা থেকে শিশিরের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়তে লাগলো। হঠাৎ মুখ তুলে ভাঙা গলায় বললেন, কিন্তু—কিন্তু—আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি সে আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। আমি আমরণ তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।' বলতে বলতে তার উচ্ছ্বসিত কান্না আর বাগ মানলো না। আমি তাকিয়ে রইলাম অপলকে।

অনেক পরে বললাম, 'কী হলো ? কোথায় গেল ?'

'জানি না, জানি না। তবে মনে হয় কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে, কেউ তাকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার। আর ঐ ম্যানেজার, সেই নাইট ক্লাবের ম্যানেজার কী জানি কেন তাকে খুন করার উদ্দাম ইচ্ছেতে আমি মধ্যে মধ্যে পাগল উঠি।

'তুমি কি তাকেই সন্দেহ কর ?'

'ওর ক্লাব ছেড়ে ওর ব্যবসা ছাড়া আর কার কী ক্ষতি করেছি। কেউ তো আমার শত্রু ছিলো না।'

মাদমোয়াজেলের কণ্ঠার কাছটা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ফুঁপিয়ে কান্নার দমকে।

আমি আর কোনো কথা বললাম না। খুঁচিয়ে আগুন বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভারি মনে বাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম খোলা জানালার ধারে। এক ফালি নীল আকাশ ধরা দিলো চোখে, এক রাশি তারা ঝিকমিক করে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম প্যারিস শহর দেখে এই দেশের কতোটুকু আমি জানতাম যদি না মাদমোয়াজেল গতিয়ের সঙ্গে আমার দেখা হতো। আর এই হাসি খুশি, যখন তখন গান গেয়ে ওঠা সুন্দরী চপলা ফরাসিনীকে দেখেই বা আমি কী করে বুঝতাম তাঁর বুকের তলায় কী আগুন জ্বলছে, যদি না কুখ্যাত মমাৎ পাড়ার স্ট্রিপটিজ দেখতে যেতাম।

সেই মুহূর্তে গতিয়ের সব দুঃখ আমার দুঃখ হয়ে বেদনাবিদ্ধ করলো আমাকে। আমার চোখে আকাশটা ঝাপসা হয়ে উঠলো।

কাঁচা রোদ

বিকেল। সূর্যাস্তের সোনা গলে পড়ছে পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে, ওয়ার্ডরোবের মসৃণ গায়ে, স্তূপীকৃত পড়ার বইয়ের আনাচে-কানাচে। মানসমুকুল আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তাকালো টেবিলের উপরকার ছোট্ট লাল অদ্ভুত টাইমপিসটির দিকে, চারটে পঞ্চাশ।

ঈস্! কমক্ষণ তো তাহলে পড়া হয়নি আজ। ভালোই। এরকম পড়া হলে আর ফার্স্টক্লাসটা মারে কে?

কোণের ছোট্ট আলনা থেকে তোয়ালে কাঁধে নিল সে, স্নান করা দরকার, মাথাটা ঝিম ধরে গেছে।

টেলিফোন বেজে উঠলো।

'হ্যালো।'

'মানসমুকুল আছেন? আমি তাঁকে চাই!'

'আমিই মানসমুকুল কথা বলছি। আপনি? আপনি কে?'

'আমি—' ওপার থেকে মিষ্টি গানের মত মেয়েলি গলা একটু কাঁপলো, 'আমি কেউ না।'

'কেউ না?'

'না।'

একটু চুপ।

'তবে মানসমুকুলের কাছে কী চাইছেন আপনি? কী দরকার।'

'দরকার।' একটু থেমে, 'কিছু না।'

'ফাজলেমি।' টেলিফোন কেটে দিতে যাচ্ছিলো মানসমুকুল, ওপার থেকে একফোঁটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো এপারে, শুনুন শুনুন, 'একটা কথা আছে।'

টেলিফোন আবার কানে উঠলো, 'কী?'

'আপনি খুব সুন্দর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! স্টিমার পার্টির দিন আপনাকে দেখে থেকে আমি ভাবছি এ খবরটা আপনাকে জানানো দরকার।'

'স্টিমার পার্টি?'

'হ্যাঁ। সেদিন বিকেলে আমরা যখন পার্টি শেষ করে ফিরছিলাম, সূর্য পশ্চিমে হেলে গিয়েছিল, ঠিক এই এখন যেমন হেলছে। আপনি স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিলেন। নীল কর্ডের প্যান্ট সাদা সিল্ক টুইলের হাফসার্ট পরেছিলেন আপনি, আমি হঠাৎ আপনার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'এই পৃথিবীতে ঈশ্বর যত কিছু সুন্দরের নমুনা দেখিয়েছেন আমাদের আপনিই তার চরম-দৃষ্টান্ত।'

'তাই নাকি ? ধন্যবাদ।'

ঠক্।

'একি কেটে দিলেন নাকি ? হ্যালো, হ্যালো !' মানসমুকুল বোকার মত টেলিফোন কানে নিয়ে আরো একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলো আশায় আশায়। ওপার নিঃশব্দ।

মন খারাপ হয়ে গেল। ধ্যেৎ, কিছু কথাই বলা হলো না। কে তাও জানা গেলো না। স্টিমার পাটির কথা যখন বললো তখন তো নিশ্চয়ই আমাদের কলেজের মেয়ে। কিন্তু কে ? কলেজের সব মেয়ে সব ছেলের মধ্যে কাকে বুঝবো আমি ? এমন গানের মত গলা আর কার শুনেছি ? কবে শুনেছি ?

বাথরুমে ঝরনার তলায় দাঁড়িয়ে চল্লিশ মিনিট ধরে স্নান করেও মাথা ঠাণ্ডা হলো না, বন্ধু সংসর্গে বেরুতে হলো পরীক্ষার পড়া ফেলে।

ঠিক পাঁচদিন পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো।

'হ্যাঁ। কাকে চাই ?'

'মানসমুকুল। মানসমুকুল মুখার্জি আছেন ?'

'এই তো আমিই কথা বলছি। আপনি কে ?'

'আমি—আমি কেউ না ?'

'যদি কেউ না-ই হন তা হলে কোনো অশরীরিণীর সঙ্গে কথা বলার আমার সাধ নেই। এই আমি ফোন কেটে দিলুম !'

'এই শুনুন শুনুন—'

'কী !'

'আজ কলেজে যাননি কেন ? খুব পড়ছেন ?'

'না।'

'তবে ?'

'আপনি কে তাই ভাবছি।'

'সারাদিন !'

'সারাদিন।'

'তা হলে আমি খুব ভাগ্যবতী বলতে হবে।'

'তাই নাকি ?'

'নয় ?'

'কেন ?'

'বারে, এ আবার কেন কী ?'

'আপনি কে ?'

'বলবো না।'

'বলতেই হবে !'

'অসম্ভব।'

'আমি যেমন করে পারি বার করবো।'

'বেশ তো।'

'বলুন তো আপনি আমাদের কলেজের মেয়ে কি না।'

'বলবো কেন ?'

তাহলে আর আমাকে ফোনে ডাকবেন না।' ঠক্ করে ফোন রেখে দিল মানসমুকুল। আর দেওয়া মাত্রই অনুশোচনায় হৃদয় ভরে গেল। এখন তো হাজার চেষ্টা করলেও সে ঐ গলা আর শুনতে পাবে না, যদি না মেয়েটি আবার কখনো দয়া করে ফোন করে তাকে।

পরের দিন দশটা বাজতেই কলেজে গেল। রাশি রাশি ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে, রাশি রাশি গলার আওয়াজ মুখরিত করছে কলেজ প্রাঙ্গণ, ছুটছে, দৌড়চ্ছে, দলবেঁধে যাচ্ছে কফি হাউসে, বসে আছে ঝাউগাছের ছায়ায়। কিন্তু কে ? কে ?

সেমিনার থেকে ছুটে, বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। এই, এইতো, এই নিশ্চয়ই। মেয়েটি ফিক্ করে হেসে চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

কিন্তু উদ্বেগ কমলো। অনেক চেষ্টায় অনেকবার হতাশ হয়ে আস্তে আস্তে নিবে এলো উৎসাহ। তারপর আট-ন'দিন অদ্ভুত একটা চাপা অশান্তিতে কাটিয়ে অদৃশ্য ফাজিল মেয়েটিকে প্রাণ ভরে মনে মনে গাল দিয়ে আবার মাথা ঠাণ্ডা হলো তার। মন লাগলো পড়ায়। নিবিষ্ট হয়ে চমৎকার কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিল সে। কিন্তু পরের দিন আবার বেজে উঠলো ফোন।

তবে এর মধ্যে কি আর ফোন বাজেনি এই মস্ত বাড়ির মস্ত ঘরটিতে ? বেজেছে বই কি, অসংখ্যবার বেজেছে। বিরাট ব্যবসায়ীর বাড়ি, ঘরে ঘরে ফোন, ঘরে ঘরে লোক। কতবার কত কারণে কত লোক ডেকেছে তার কি ইয়ত্তা আছে ? সব ফোনেই চকিত হয়ে দৌড়েছে সে, আবার ফিরে এসেছে তক্ষুনি। কিন্তু আজ আবার সেই গলা—'মানসমুকুল, মানসমুকুল মুখার্জি আছেন ?'

বুকটা ধড়াস করে উঠলো গলা শুনে—'কেন ? কী দরকার।' গলায় যথেষ্ট গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করলো সে।

'একটু কথা বলতে চাই ?'

'কী কথা ?'

'এটা তো চৈত্র মাস, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কী সুন্দর হাওয়া, না ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখনো লেকে যান না ?'

'না।'

'বিষ্যুৎবার তো গিয়েছিলেন। রাত বারোটা অব্দি ছিলেন, তারপর ঠাণ্ডা লেগে লাঞ্ছিত নাসিকায় গৃহে প্রত্যাবর্তন।'

'বারে, কী করে জানলেন ?'

'কেন জানবো না, আজ কলেজে আর্টস লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে সনতের কাছে হাঁচতে-হাঁচতে নিজের সর্দির ইতিহাসটা বলেননি আপনি ?'

'কী আশ্চর্য! আপনি কী করে জানলেন বলুন না ?'

'পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম।'

'পাশে ?'

'কেন টের পাননি ?'

'না তো।'

'আপনি যখন যেদিনই কলেজে আসেন—আমি তো সব সময়েই আপনার কাছে কাছে থাকি।'

'তার মানে ঐ কলেজেরই ছাত্রী আপনি।'

চুপ।

'শুনুন—'

'বলুন।'

'আপনি কে?'

'তা দিয়ে কী দরকার?'

'আমি শুনবো, আমি দেখা করবো আপনার সঙ্গে।'

'কী লাভ?'

'আপনারই বা আমাকে রোজ এভাবে ফোন করে কী লাভ?'

একটু থেমে, 'জানিনে।'

'শুনুন।'

'কী।'

'বলুন আপনি কে?'

'শুনবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে যে মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখে, সবচেয়ে বেশি ভাবে সে।'

'আমি কি খুব সুন্দর?'

'তার চেয়ে সুন্দর আর কিছু চোখে পড়েনি।'

'আপনার কণ্ঠস্বর তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মধুর।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'অবস্থা যে ভারি খারাপ।'

'একটু তো খারাপই।'

'তবে আর তাকে বেশি খারাপ করে লাভ নেই।'

ঠক।

হ্যালো, হ্যালো। ওপার নিঃশব্দ।

পাঁচ দিন চুপ। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলো মানসমুকুল। পড়াশুনো ফেলে রোজ কলেজে গিয়ে পাগলের মতো তাকাতে লাগলো প্রত্যেক মেয়ের মুখে, চোখে চোখ ফেলে কখনো কারো দিকে হাসবারও চেষ্টা করলো দু'একদিন, ভ্রূকুটির দাপটে ছিটকে গেল পঞ্চাশ হাত দূরে। আবার তাকালো, আবার হটে এলো, থার্ড ইয়ার থেকে সিক্সথ ইয়ার পর্যন্ত কাউকেই মনে-মনে কল্পনা করতে বাকি রাখলো না সে, পড়াশুনো মাথায় উঠলো, চোখের ঘুম কমে গেল, খাওয়ায় অরুচি ধরলো, অদৃশ্যচারিণীকে দেখতে পাবার দুরন্ত বাসনায় দিন রাত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো।

তারপর আবার ফোন।

'না, আপনাকে বলতেই হবে আপনি কে?'
'বলতেই হবে?'
'তা নৈলে আর কক্ষনো ফোন এলে আমি ধরবো না।'
'ধরবেন না?'
'না।'
'বেশ।'
'শুনুন।'
'কী?'
'আপনি কে?'
'কী দরকার জেনে?'
'না জানলে আমি মরে যাবো।'
'সত্যি?'
'হ্যাঁ।'
'তবে ফোন করার পাটটা তো এখন চুকোনোই উচিত।'
'না?'
'না।'
'না।'
'তবে কী?'
'ফোন আপনি করবেন। রোজ।'
'রোজ।'
'হ্যাঁ।'
'বেশ।'
'শুনুন কখন করবেন, প্রত্যেকদিন ঠিক চারটে পঞ্চাশ। যেমন প্রথম দিন করেছিলেন।'
'এ বছরে এর চেয়ে সুখের খবর আর আমি শুনিনি—না, না ভুল বললাম, এ জীবনে।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ।'
'সত্যি?'
'সত্যি।'
'আমাকে ফোন করতে তোমার ভালো লাগে?'
'তার চেয়ে ভালো আর কিছুই লাগে না।'
'কিন্তু তুমি কি চাও আমি পাগল হয়ে যাই?'
'একটু পাগল কিন্তু হয়েছেন।'
'হবো না? পাগল করলে পাগল হবো না! কিন্তু আমাকে আপনি বল কেন?'
'কী বলবো?'
'তুমি। তুমি। তুমি। তুমি আমাকে তুমি বলবে।'
'তুমি বলবো?'
'হ্যাঁ।'
খুট করে কেটে গেল সুর। কেটে দিল কানেকশান। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

ঈশ্। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে চমৎকার সময়টিতে কিনা এই শত্রুতা। মানসমুকুল তার ঘন চুলে এলোমেলো আঙুল চালাতে চালাতে বসে পড়লো চেয়ারে।

আর চার মাস পরে পরীক্ষা। এই আকুলিবিকুলি হৃদয় নিয়ে এখন কী করে সে ? একুশ বছরের টাটকা কাঁচা যৌবন, উদ্দাম হয়ে উঠেছে বুকের ভেতরে। শুধু গলার স্বর ! শুধু দুটো মিষ্টি কথা, এখানেই কি সীমাবদ্ধ থাকতে চায় এই দুকূল ছাপানো প্রেম ?

কলেজে ক্লাস হয় না, কেউ যায় না, যারা যায় তারা লাইব্রেরিতে যায় পড়তে। কিন্তু মানস লাইব্রেরির ধার দিয়েও হাঁটে না। দশটা বাজতেই সবুজ রংয়ের ছোটো নিজস্ব গাড়িটি নিয়ে ছোটে কলেজে, বেলা চারটে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাড়ি আর মানস থাকে কখনো মাঠে, কখনো দালানে, কখনো দোতলায়, কখনো সেমিনারের ধারে—ক্লান্ত হয়ে কখনো কখনো চুপচাপ শুয়ে থাকে কোনো বড় গাছের ছায়ায়।

'তুমি কি চাও আমি ফেল করি ?'

'না।'

'তুমি কি চাও আমি একটা অসহ্য জীবনযাপন করি ?'

'না।'

'তবে কী চাও ?'

'তোমাকে রোজ একবার কলেজে দেখতে। একবার এই সময়ে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে।'

'এই-ই সব ?'

'এর বেশি লোভ করতে আমার ভয় করে।'

'কেন ?'

'যদি আর তোমাকে না পাই, আর কথা বলতে না পারি ?'

'তুমি যদি দেখা দাও তবে তো সেটা আরো সার্থক হতে পারে, আরো সুন্দর।'

'যদি না হয় ?'

'কেন হবে না ?'

'যদি আমাকে তোমার পছন্দ না হয় ?'

'পছন্দ ! তোমাকে ! আমার মন-ভোমরা কে—'

'অসম্ভব কী ?'

'তুমি কি খুব বিশ্রী দেখতে ?'

'নিজেকে কি কেউ খুব বিশ্রী দেখে ? দেখলেও বলে ?'

'তবে তুমি কি খুব কালো ?'

'খুব নই, তবে কালোই তো।'

'নিশ্চয়ই তোমার চুল খুব ঘন।'

'লোকেরা বলে, না।'

'তবে চোখ নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত।'

'তেমন জনরবও শুনিনি।'

'তবে ? তবে কী তুমি ?'

'তোমার প্রেমে হলাম সবার কলঙ্কভাগী।' ওপার গুনগুনিয়ে উঠলো।

'কী মিষ্টি, কী মিষ্টি তোমার গলা। আচ্ছা, অন্তত এটুকু বল কোন ইযারে তুমি পড়।'
'তাহলেই বার করতে পারবে।'
'আর কী তোমার কমবিনেশন তা-ও বলতে হবে। অনার্স আছে?'
'আছে।'
'কী বিষযে?'
'ইংরাজি।'
'আচ্ছা এবার আমি তোমাকে নিশ্চয়ই খুঁজে নেবো। নেবো, নেবো, নেবো।'
'দেখা যাক তোমার ভালোবাসার জোর।'
'একটু উল্টো হচ্ছে না ব্যাপারটা? পুরাকালে দময়ন্তী খুঁজে নিয়েছিলেন নলকে, একালে বেচারা নলকেই খুঁজতে হচ্ছে দময়ন্তী।
'বেশ তো। খোঁজ না একটু। কিন্তু দেখো সাপ খুঁড়তে না কেঁচো বেরোয।'
'সেই কেঁচোই আমার স্বর্গ।'
'ঈস্।'
'হ্যাঁ।'
'দেখা যাক।'

না, দেখা গেলো না। ইংরাজি অনার্সের এই মিষ্টি গলার মেয়েটিকে কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলো না মানস। কিন্তু আস্তে-আস্তে উন্মাদনা কমলো তার। সে শান্ত হলো, স্থির হলো, যাকে চোখে পেলো না হৃদয়ে পেলো তাকে। আবার মন দিল পডাশুনোয, জানা আছে চারটে পঞ্চাশে একবার পাবেই তাকে। ঘড়ির কাঁটার মত। এরমধ্যে একদিন বাদ যাবে না, কোনো রকমেই না।

মাসখানেক বা মাসদেড়েক লেখাপড়ায় যতটা ক্ষতি হয়েছিলো তার চারগুণ বাকি ক'মাসে পড়ে নিল সে, তারপর একদিন বসলো গিযে পরীক্ষার হলে।

পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষা দিয়ে এ-ও বোঝা গেল ফার্স্টক্লাস তার অবধারিত। ডক্টর এন এন মুখার্জি, লন্ডনের ডি এস-সি, ওষুধের কারবারে যার লক্ষ টাকা আয়, মানসমুকুলের বাবা,—তিনি এবার ছেলেকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, আর মা, সমাজের বিশিষ্ট মহিলা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী অরুন্ধতী মুখার্জি—তিনি ব্যবস্থা কবলেন বিয়ের।
মানসমুকুল বললো, 'না।'
মা-বাবা বললেন, 'কী না?'
'দুটোই না।'
'তুই বিলেত যাবি না?'
'তুই বিয়ে করবি না?'
'না।'
'কেন?'
'আমার বিলেত যেতে ইচ্ছে করে না।'
'আর বিযে?'
'বিয়ে করতেও না।'
'তবে কী করবি?'

'এখানেই—যা হয় করবো কিছু। ইউনিটি ড্রাগে একটা চাকরি দাও না।'

'ইউনিটি ড্রাগের ভালো চাকুরে হতে হলে ইউরোপে যেতে হয়।'

'তবে সামান্য চাকরি দাও।'

স্যুটে-বুটে গনগনিয়ে বাপ বেরিয়ে গেলেন। শাড়ির দামী আঁচলে ঝলক তুলে মা বেবিয়ে গেলেন।

চারটে পঞ্চাশ। টেলিফোন বাজলো।

'হ্যাঁ, বল, আমি কথা বলছি।'

'ফার্স্টক্লাস তো পাচ্ছ, খাওয়াবে না?'

'ফোনের ভেতর দিয়ে যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই খাওয়াবো।'

'ফোনের ভেতর দিযে কেন, নেমতন্ন কর না একদিন।'

'বন্ধু, কেন আর আমাকে কষ্ট দাও?'

'কষ্ট! কষ্ট কী?'

'এ ভাবে আমি আর থাকতে পারছিনে।'

'আমিও না।'

'তবে, তবে কেন এমন করছো?'

'কী করছি?'

'দেখা দাও, দেখা দাও। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনে।'

'শোন!'

'কী?'

'আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'অসম্ভব।'

'উপায নেই।'

'আমি বিলেত যাওয়া নাকচ করে দিলুম আর তুমি—'

'আমি যে মেয়ে।'

'বেশ! একজন মেয়ের উপর যার সবচেয়ে বেশি জোর থাকে সেই ক্ষমতা আমাকে দাও, আমি তোমাকে নিয়ে বিলেত যাবো।'

'এতোখানি!'

'হ্যাঁ।'

'পাগল।'

ঠক্।

'হ্যালো, হ্যালো।'

ওপার নিস্তব্ধ।

হঠাৎ একটা অধীর রাগে জ্বলে উঠলো মানসমুকুল। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা ছুটে চলে গেল, আবার ছুটে এলো এদিকে। হাতের মুঠো শক্ত করলো, ছেড়ে দিল, বড় বড় ঢেউ তোলা চুল ছিঁড়ে ফেললো আঙুলের টানে।

রাত্তিরে খেতে বসে বললো, 'বাবা, আমি বিলেত যাবো।'

গ্রামফেড্ মাটনের মস্ত একটি চাকে ছুরি-কাঁটা চালাতে চালাতে বাবা বললেন, 'গুড্।'

মা বললেন, 'তা হলে কিন্তু বাপু বিয়েটাও তোমাকে করতে হবে!'

'করবো।'

'এইতো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা।'

পরের দিন যখন ফোন এলো নির্দিষ্ট সময়ে মানসমুকুল ছুঁলো না। বেজে বেজে যখন থেমে গেল তখন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—'হ্যালো হ্যালো।' কোনো শব্দ নেই।

শব্দ কি শুধু ওপারে নেই ? এপারেও নেই ! আকাশে নেই, বাতাসে নেই, পৃথিবীর কোথাও নেই, মানসমুকুল বধির হ'য়ে গেছে।

মা বললেন, 'মেয়ে দেখবি ?'

মানস বললো, 'না—'

'তা হলে তার গুণপনাটাই শোন।'

'না।'

'সে কী রে ! বিয়ে করতে যাচ্ছিস, পছন্দ অপছন্দ নেই ?'

'দরকার করে না—' গম্ভীর মুখে সে উঠে গেল।

গেল সে কলেজ। না, আজ আর মুখ থেকে মুখে চোখ ফেললো না, সে সব সাঙ্গ হয়েছে অনেকদিন। ইংরাজি অনার্সের প্রায় প্রত্যেক মেয়ের কাছে সং বনেছে অনেকবার। কলেজের প্রত্যেক মেয়ের কাছে হাস্যকর করেছে নিজেকে। লাইব্রেরিতে এসে বসে রইলো চুপচাপ। মন টিকলো না, কমন রুমের আশেপাশে হাঁটাহাঁটি করলো কয়েকবার, কয়েকবার থমকে দাঁড়ালো কারো কোনো হাসির শব্দে, কথার টুকরোয়, কোন কোন গলার আমেজে কান পাতলো মনোযোগ দিয়ে, তারপর নেমে এলো নিচে। ঠিক শেষ সিঁড়িটির মুখে তিন চারটি মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠে গেল উপরে। মানস চকিত হয়ে তাকালো।

ধ্যেৎ ! এ-সব কী করছে সে ? কোন আলেয়ার জন্য তার এই প্রাণান্তকর অবস্থা ? হয়তো সবটাই মিথ্যে, সবটাই ভিত্তিহীন। কে জানে কার কোন ঠাট্টার আধার হয়ে, হাসাহাসির কেন্দ্র হয়ে কতগুলো অলক্ষ্য মানুষকে সে মজার যোগান দিচ্ছে। ছিঃ !

মন শক্ত করে বেরিয়ে এলো কলেজ থেকে রাস্তায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। এক কাপ চা অন্তত চাই, তারপর যেদিকে দু'চোখ যায়।

নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে ওয়াই এম সি এ-র দরজায় এসে সে থামলো। আর থেমেই ধ্বক করে উঠলো বুকের ভেতরটা।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ফোন করছে একটি মেয়ে। ঈষৎ নোয়ানো ঘাড়, খোঁপার তলায় চিকচিকে সরু হারের ঝিলিক। টেলিফোনের তারটা খুব বড়ো নয়, তবু সেটাকে যতটা সম্ভব টেনে নিয়ে একটু নিরিবিলি হয়ে, একটু কোনাচে হয়ে, অন্যের চোখে পিঠ ফিরিয়ে সে দাঁড়িয়েছে।

'সাউথ থ্রি ওয়ান থ্রি।'

'হ্যাঁ। আমি মানসকে, মানসমুকুল মুখার্জিকে চাই।'

'ও, উনি নেই ?' 'ও' 'ও' 'এ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' 'একটু দরকার ছিল।' 'আচ্ছা— না না নাম টাম বলতে হবে না। বলবেন ঠিক সাড়ে চারটেয় একজন ফোন করছিলো।'

ঠক করে ফোনটি রেখে রুমালে মুখ মুছে গট গট করে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

একটু আড়াল হয়ে বসেছিলো মানস, চায়ের অর্ডারও দিয়েছিলো, কিন্তু না খেয়েই তার দামটা ম্যানেজারের কাউন্টারে রেখে সেও ঝট্‌পট্‌ বেরিয়ে এলো পেছন পেছন। আর একটু পরেই কলেজের গেটের সামনে এসে হঠাৎ সে ধাক্কা খেলো মেয়েটির সঙ্গে। কলেজে ডিবেট ছিলো সেদিন, তখনো ছুটি হয়নি, মাঠে ভিড় ছিলো না, গেট নিরিবিলি ছিলো, তবু তাকে ধাক্কা দিল কে ? মেয়েটি রাগে লাল হয়ে ফিরে দাঁড়ালো, তারপরে ঈষৎ থমকালো। কিন্তু সামলে নিল তক্ষুনি। ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূকুটি করলো, 'কেমন করে পথ চলেন ? দেখতে পান না ?'

'আজ্ঞে—'

'আরে অমন হাঁ করে মেয়েদের দিকে আপনি তাকিয়ে থাকেন কেন রোজ বলুন তো ?

'মানে—এই—দেখবার জিনিস সকলেই দেখে কিনা ?'

'দেখবার জিনিস ? মানে ? মেয়েরা কি হিপ্পোপটেমাস না বাইসন ?'

'ছি ছি ছি ছি। কী যে বলেন।' মানসমুকুল একেবারে জিব টিব কেটে, কানে চিমটি খেয়ে লজ্জায় লাল। 'কী যে বলেন। আপনারা হলেন গিয়ে, ঐ কী যে বলে না চাঁদ তারা ফুল পাখি গান কবিতা—'

'থাক থাক আর ইয়ার্কি করতে হবে না, সরুন।'

'যাবেন না, যাবেন না।' পথ আগলে দাঁড়লো মানস, আভূমি আনত হয়ে বিগলিত হাস্যে বললো, 'কী করলে আপনার রাগ ভাঙান যায়, সেটি আমাকে বলতেই হবে।'

'দয়া করে স্বভাব শোধরান।'

'আজ্ঞে, তা তো আমি শোধরাবোই, কিন্তু আপাতত, এই এখন কী করলে—'

কপাল কুঁচকে মেয়েটি ভালো করে লক্ষ্য করলো মানসমুকুলকে ; তারপর আরো গম্ভীর হলো—'বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করার—'

'আহা। এমন সুন্দর আশ্বিন মাস, আকাশে বাতাসে এমন চমৎকার শরৎ-মেঘের লীলা এখন কি একটা বাজে কথার বলবার সময় ? তা কি আমিই জানিনে ? আমি বলছি কি এই সময়ে গাড়ি চড়ে একবার লেকটা চক্কর দিতে গেলে কেমন হয়।'

'খুব বিশ্রী ! এ সমস্ত অর্থহীন প্রলাপ বকতে হলে আপন মনে বকুন, আমি চললুম।'

'বেশ তো, যাবেনই তো, আমার সঙ্গেই চলুন না একটু। কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায় ? নাকি ফোনে ফোনেই সব কথা—'

'অ্যাঁ।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি—মানে—আপনি একটি ইডিয়েট।'

'তুমি—মানে—তুমি একটি ফুউল।'

'কী বললেন ?'

'বললাম, তুমি—মানে শ্রীমতী চিত্রা চৌধুরী, অর্থাৎ কলেজের সব চাইতে মিষ্টি মেয়ে, অর্থাৎ হিস্ট্রি অনার্সের তথাকথিত হরিণাক্ষী, অর্থাৎ মানসমুকুলের মনভোমরা—'

'এমা ! কী ভীষণ লোক ! ধ্যেৎ !' হিস্ট্রি অনার্সের তথাকথিত হরিণাক্ষী চিত্রা চৌধুরী লাল হয়ে কপাল ঘামিয়ে, জিব ভেঙিয়ে তৎক্ষণাৎ হাওয়া।

গদ গদ মানসমুকুলই বা তবে হাওয়ার পেছনে ধুলো হয়ে উড়ে যাবে না কেন ?

সন্ধ্যাবেলা

বাস থেকে সবেগে নেমে পড়ল অনুরাধা। আজই প্রথম না এই নিয়ে সে তিন দিন দেখল। একটি গাঢ় খয়েরি রংয়ের অস্টিন গাড়ির ভিতরে ওরা।

আপাদমস্তক জ্বলে গেল তার। যেদিনই দেখে সেদিনই জ্বলে। এই জ্বলুনি সহ্য করা কঠিন। কঠিন হলেও সহ্য করতে হচ্ছে, উপায় কী?

কিন্তু আজ আর পারছে না। চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। আহাম্মকের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভিড়াক্রান্ত ফুটপাতে একা একা। ভেবেই পেল না কেন এমন তড়িঘড়ি একে ওকে মাড়িয়ে জীবন বিপন্ন করে নেমে পড়ল বাস থেকে। সে কি ভেবেছিল, ধরতে পারবে ওদের? যদি পারতও তা হলেই বা কী হত?

কোন পাঞ্জাবি চলতে চলতে একটা ধাক্কা দিল, প্রায় পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়িয়েই একটা ওষুধের দোকান চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বক করে উঠলো হৃৎপিণ্ডটা।

অবশ্য এই ভাবনাটা যে আজই ঝলসে উঠল—তা ঠিক নয়। ক'দিন থেকেই ঢেউয়ের মত আসা যাওয়া করছে। আজ ওষুধের দোকানটর দিকে তাকিয়ে সেই ভাবনাটা একটা স্পষ্ট চেহারা নিল।

তারপর কেবলমাত্র সেই ওষুধের দোকানের মধ্যেই সে ঢুকল না, কাছে দূরে ছ'টা দোকানে গেল। যেখানে যে ক'টা পারে ঘুমের বড়ি সংগ্রহ করল। প্রায় এক মুঠো হল বৈকি। কম পড়ে তো আরো আছে বাড়িতে। বড় মামীর অনিদ্রারোগ, তাঁর জন্যে সর্বদাই মজুত থাকে এ সব। তা ছাড়া ছোট মামার, বিলিতি অ্যাসপিরিনের শিশি আছে, চোখের জন্যে মাথা ধরে খুব, কোন বিলেত-ফেরতা বন্ধু এনে দিয়েছে। অবশ্য সে শিশি ছোট মামার পকেটেই থাকে সর্বদা, পাওয়া কঠিন। তবু ভাগ্য ভাল থাকলে টেবিলের দেরাজে পেয়েও যেত পারে।

আত্মহত্যার সংকল্প করেই সে কিনল এই বিষ। ব্যাগের মধ্যে ভরে অনেকটা হালকা হল। আর খানিক বাদেই যে এই ভয়ঙ্কর দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে সে কথা ভেবে বিস্বাদে ভরা বিকেলটাকে যেন সুন্দর মনে হলে।

রসা রোড আর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ মোড়, এপারে ওপারে অজস্র বিপণি, অজস্র লোক, পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত চলে গিয়েছে রাস্তা, সূর্য হেলেছে সেখানে, মেজেন্টা রং ঢেকে রেখেছে দিগন্ত। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার একটা ট্রাম বা বাস যা পায় তার আশায় ছুটোছুটি করতে লাগল।

বছর চারেক আগে বি. এ. পাস করেছে। ছাত্রী ভাল ছিল। ইংরেজি অনার্স ছিল। তারপরে এম. এ. না পড়ে বি. টি. পাস করেছে। তবু একটা ভাল চাকরি পায়নি এখনো। তবে বসে নেই। গজিয়ে ওঠা অনেক ব্যবসায়ের মত স্কুলেরও একটা ব্যবসা হয়েছে আজকাল। তেমনিই একটা স্কুলে অতি সামান্য মাইনেতে পড়াতে যাচ্ছে রোজ। আশা—একদিন চারাগাছ থেকেই বিদ্যালয়টি মহীরুহ হয়ে দাঁড়াবে। তখন কোন সমস্যা থাকবে

না। প্রতিষ্ঠাত্রী বিভাবতী সমাদ্দার রোজই এ আশ্বাস দিয়ে থাকেন। বিভাবতী সমাদ্দার সমাজসেবিকা, রাজনীতির সঙ্গে বেশ ভালভাবেই যুক্ত। বলছেন, সমাজের উপকার করতেই তাঁর এই শিক্ষালয়ের প্রচেষ্টা, নইলে নিজের সংসার ফেলে ঘরের খেয়ে কেন তিনি পরের মোষ চরিয়ে বেড়াবেন ? উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই যে ছাত্র যোগাড় করছেন, আবার সরকারি সাহায্যের জন্য হাঁটাহাঁটি করেছেন—এই সবই নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রতমাত্র।

তা ব্যতীত অনুরাধাদের মত সব বেকার বি. এ. পাস এম. এ. পাস মেয়েদের একটা বন্দোবস্ত করাও উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, এটাও তাঁর সমাজসেবারই অঙ্গ। এই সেবার মধ্যে আপাতত অর্থ না থাকলেও পরমার্থ আছে। এই পরমার্থের জোরেই এই শিক্ষালয় যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন তিনি সমবণ্টনের দ্বারা সকলকেই সমান সুখী করতে পারবেন।

অনুরাধা এই আশাতেই বুক বেঁধে আছে। তবে বর্তমানে সেই আশাতেও ফাটল ধরেছে। যে স্কুল এক বছর আগে দশটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন সেখানে দেড়শো ছেলেমেয়ে কিলবিল করছে। সামলাতে হিমশিম। মাইনে কিন্তু সেখানেই ঠেকে আছে। মনে মনে হিসেব করে দেখা গেছে, যা আয় হচ্ছে, ব্যয় বাদ দিয়ে তার পরিমাণ যদি সমান ভাবে বিভক্ত করা যায় তাহলে তাদের চারজনের ভাগে বেশ একটি ভদ্রগোছেরই দাঁড়ায়।

যে চারজন প্রথম দিন থেকেই এই স্কুলের জন্যে সমান খেটেছে তাদের একজন সে নিজে আর একজন সাবিত্রীদি। এম. এ. পাস, বিবাহিত এবং দুঃস্থ। অন্য দুজন বিভাদি আর তাঁর কন্যা সুমনা। শেষোক্ত দুজন বি. এ.।

নিতান্ত নগণ্য মাইনের এই চাকরিটা সুনন্দ রোজ ছেড়ে দিতে বলত। সুনন্দ অনুরাধার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজন—একাধারে সব। মাস আষ্টেক আগে কোন বন্ধুর সূত্রে আলাপ হয়েছিল, সেই আলাপ প্রলাপে পরিণত হতে দেরি হয়নি। মাত্র চারদিন দেখা হবার পরেই সুনন্দ তাকে ভালোবাসা নিবেদন করেছিল। অনুরাধা অনুরাগের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছে।

সুনন্দ বড়লোকের ছেলে, বাবার বাণিজ্যে শিক্ষানবীশ, প্রাইভেট কোম্পানি সুতরাং মাসের শেষে ভালোই মাইনে পায়। কথা আছে শিগগিরই বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে বিলেত যাবে। বলেছে অনুরাধাকে পাবার জন্যে সে জলে ডুবতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। অনুরাধা সম্মোহিত।

অনুরাধার পক্ষে এমন একটি যুবককে প্রেমিক পাওয়া ভাগ্য বই কি। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মামাবাড়িতে প্রতিপালিত। মা-ও মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। মামারা কেউই তেমন উপার্জনশীল নয়। সুতরাং ভাগ্নিকে দেখে শুনে ঘটাপটা করে বিয়ে দেবেন তেমন সামর্থ্য কোথায় ?

অনুরাধা নিজেও তা ভাবে না। সে সব ভাবনার দিক দিয়েই সে যায়নি কোনদিন। এত অভাবের মধ্যেও মামারা যে যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সেজন্যে সে যে কত কৃতজ্ঞ তার কি কোন সীমা আছে ? তাই তার একমাত্র চেষ্টাই ছিল যোগ্য হয়ে তাদের সাহায্য করা। বিয়ের কথা উঠলেই বলেছে, ওসব ছেড়ে দাও, আমি বিয়ে করব না। আমি তোমাদের মেয়ে নই, ছেলে। মামাতো বোনেদের কথা বলেছে, রানীকে আর রেখাকে বিয়ে দাও। বস্তুত এ পর্যন্ত চাকরির চেষ্টা ছাড়া আর কোনদিকে মনও দেয়নি। হঠাৎ

এটা সে কী হয়ে গেল। তা এক রকম ভালোই। জেনে মামারা খুশিই হয়েছেন। সত্যিই তো, হাজার চেষ্টা চরিত্র করলেও তাঁরা তো ভাগ্নিকে এমন সব দিকে থেকে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতেন না। আর বিয়ে হওয়াই তো একজন মেয়ের পক্ষে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে নিরাপদ। তাছাড়া নিজে চাকরি করে সে একা একা মামাদের যে সহায়তা করতে পারত, দুজন মিলে তার চেয়ে ঢের বেশি সহায় হবে। সুনন্দকে সে বলেওছে এসব কথা।

সুনন্দ বলে, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

অনুরাধা প্রস্তাব দিয়েছে, একদিন চল না, ওদের সঙ্গে দেখা করে বলবে।

'তুমিই তো বলেছ।'

'আমি বলা আর তোমার বলা কি এক ?'

'এক নয় ? আমরা অভিন্নহৃদয় নই ?' মিষ্টি করে হেসে তাকে নিবিড় আবেগে টেনে নিয়েছে কাছে।

এই আবেগকে আরো নিবিড় করতে চেয়েছে, নির্জনতম কোন গন্তব্যে গিয়ে। কী জানি কী ভেবে, কী সংস্কারবশত রাজি হয়নি সে। সবেগে মাথা নেড়ে বলেছে, 'না না, ওসব ভালো লাগে না। আর এত ব্যস্তই বা কেন ? তুমি তো বলেছই, আর দু এক মাসের মধ্যেই বিয়ে করবে।'

সুনন্দ ঠাট্টায় বেঁকে গিয়ে বলেছে, 'ও, বিয়ের আগে আর পরে বুঝি প্রেমের সব আলাদা আলাদা নিয়ম আছে ?'

অনুরাধা হেসে শান্ত করে বলেছে, 'আলাদা নিয়ম না থাকলেও, কিছু কিছু উপহার থাক না জমা—শুধু বিয়েরই জন্য।'

'রাস্টিক !' রাগে গরগর করেছে সুনন্দ। কিন্তু ভুলেও গেছে। আবার ছুটে এসেছে পরের দিন। নানা জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অপেক্ষা করেছে। স্কুলটাকে নরকে যেতে বলেছে। স্কুলটার জন্যেই যত সময়ের অভাব। হাজারবার বলেছে এই জঘন্য কাজটা তুমি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

সুনন্দর নিজের তো বেশি কাজ ছিল না, বাবার আপিসে শিক্ষানবিশী মাত্র। তার ওপরে এক নম্বরের ফাঁকিবাজ। তালে আছে কবে বিয়ে করে বৌ নিয়ে বিলেত যাবে।

সেই সুনন্দর যে কী হয়েছে কে জানে। কেমন যেন অন্য রকম ভাব। ডাকলে আসে না, ঘড়ি দেখে চলে যায়। একদিন তো থাকতে না পেরে অনুরাধা ওদের বাড়িতেই চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুনে এল ওর নাকি বিয়ে ঠিক করেছেন ওর বাবা-মা। অনুরাধা একেবারে স্তম্ভিত।

দেখা হতেই ভেঙে পড়েছিল, বলেছিল, 'এসব কী শুনলাম ?'

সুনন্দ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'যত সব উদ্ভট তথ্য।'

'তবে তুমি আজকাল এ রকম কর কেন ? আস না, দেখা কর না, ডাকলে ভালো করে কথা বল না—'

'তুমি যেমন স্কুল ছাড়তে পার না, আমিও তেমনি আপিসে ব্যস্ত থাকি।'

'এতদিন এ আপিস কোথায় ছিল ?'

'তখন কাজকর্ম কম ছিল, এখন বেড়েছে। তা ছাড়া বিলেত চলে যাব শিগগিরই, তাই অনেক কিছুই বুঝে নিতে হচ্ছে।'

'কিন্তু তার আগে তোমার বিয়ে করাও স্থির ছিল।'
'যদ্দুর মনে হয়, যাবার আগে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'
'সম্ভব না? তবে আমার কী হবে?'
'আমাকে যেতে হবে রাধা'—ঘড়ি দেখেছে—'পরে যোগাযোগ করব।'
'যোগাযোগ করবে?'
'আচ্ছা আসি'—হাত নেড়ে বাই বাই করে চলে গেছে।

তবু আশা ছাড়েনি অনুরাধা। কী করে ছাড়ে। একটা লোকলজ্জাও তো আছে? কে না জানে অনুরাধা আর সুনন্দর সম্পর্ক! মামারা ব্যবস্থা করতে শুরু করেছেন পর্যন্ত।

সে আবার ডেকেছে, আবার দেখা করেছে, আবার কেঁদেছে, রাগ করেছে, এমন কি একদিন ওর কথা মত ইস্কুলটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এল!

বৃথা। সব বৃথা। কবে যে কখন মন চলে গিয়েছে সুনন্দর কে জানে। কবে যে ঐ মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছে কে জানে। এই তো তিনদিন দেখল ওদের একসঙ্গে। তিনদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করল। মাত্র তিনদিন! মৃত্যুযন্ত্রণা এখন সে অহরহ ভোগ করছে। শুনেছে এই মেয়েটাকেই বিয়ে করে বিলেত যাবে। এতদিন বিশ্বাস করেনি, এখন করে।

আসলে সুনন্দ নিশ্চয়ই জানত কাকে বিয়ে করবে, কখন করবে। সব ঠিক ছিল আগে থেকে। ওর মতে বোধহয় প্রেম করা আর বিয়ে করা এক নয়। সত্যিই কি তাই। ও এত ছোট? এত অসৎ? বোধহয় তা নয়। নিশ্চয়ই বাবা মা মত দেননি অনুরাধাকে বিয়ে করতে। বাবা মার অসম্মতিতে নিজের জীবনে নিজে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তিত্ব হয়তো নেই ওর।

কিন্তু সে তো সব কিছুর বিনিময়েই ওকে চেয়েছিল! অনুরাধার কী কিছু অদেয় আছে সুনন্দকে।

পথ চলতে পা কাঁপছিল। বাসের জন্যে ছুটোছুটি করতে করতে ঘুমের বড়ি খেয়ে মরবার আগে বাসের তলায় পিষ্ট হবার বাসনা জাগছিল। তারপর হঠাৎ একটা দুর্নিবার আক্রোশে ক্রোধে ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে।

যাকগে, সব কিছুরই অবসান হবে আজ। এ রকম অবস্থায় যা করণীয় তাই সে করতে যাচ্ছে। এতে আর কিছু না হোক আত্মসম্মান যে বাঁচবে তাতে তো সন্দেহ নেই। আর সুনন্দর হৃদয়েও কি কোন দাগ কাটবে না?

ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি মেরে আবার বড়িগুলো সে দেখল।

আজ বাড়িটা খুব নির্জন থাকবে। বড় মামী আর মামা পলতা গেছেন। মামীর বাপের বাড়ি সেখানে। মেজমামা মেজমামী আজ বিকেলের শোয়ে সিনেমার টিকিট কেটেছেন, রানী রেখা বুবি সঙ্গে যাবে। আর ছোটমামার তো আড্ডা মেরে ফিরতে রোজই রাত দশটা।

এই সুযোগে ঘরের দরজা বন্ধ করে অনুরাধা স্বাধীনভাবে সব করতে পারবে। মুঠো মুঠো বিষ খেয়ে ঢলে পড়তে পারবে চিরনিদ্রার কোলে।

সারা বাস এই ভাবতে ভাবতে নিজেদের স্টপে এসে যখন নামল, বিকেল ঘন হয়ে এসেছে। মনের মধ্যেও অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। এই ছোট্ট জীবনটার জন্যে গভীর মমতা অনুভব করছিল। এমন সুন্দর আকাশ, বাতাস, গাছ, পাখি, সন্ধ্যা, সন্ধ্যার ছাই ছাই রঙ—শুধু সে-ই কিনা থাকবে না?

'এই রাধা'—কে যেন ডাকল পিছন থেকে।

হনহন করে এগিয়ে যেতে যেতে থামল অনুরাধা, 'কে!' ফিরে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল, 'ও মা আপনি! আপনি কোথা থেকে?'

'পরলোক থেকে।'

'ধ্যেৎ, কেবল ইয়ার্কি'—অনুরাধার বিষণ্ণ চোখ হেসে উঠল, 'ঈশ, কদ্দিন বাদে।'

'বিরহে আছাড়ি পিছাড়ি করছিলে না তো?'

'ফাজিল। বলুন কেমন আছেন?'

'তুমি কেমন আছ?'

সুভদ্রার দাদা নীলকান্ত, যাকে সবাই নীল বলে ডাকত। সুভদ্রা অনুরাধার সঙ্গে পড়ত। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে। এক সময়ে বকুল বাগানে পাশাপাশি বাড়িতে ছিল। তারপর মেশোমশাই মস্ত বাড়ি বানিয়ে কোথায় চলে গেলেন। সুভদ্রা অবশ্য স্কুল ছাড়ল না, তার সঙ্গে তেমনি দেখাশোনা হত, অন্য সবাই দূর পর হয়ে গেল।

সুভদ্রার এই একই দাদা। কী জ্বালান জ্বালাত তাদের। ছোট ছিল, বোধহয় ফাইভ সিক্স-এ পড়ত তখন, কেবল খ্যাপাত। চুল ধরে টানত, ভূতের ভয় দেখাত লুকিয়ে চুরি করে যখন তেঁতুল মেখে খেতো, থুতু মাখিয়ে দিত। যাকে বলে এক নম্বরের ইয়ে।

বাড়ি ছাড়ার পরেও কিছুদিন হঠাৎ হঠাৎ আসত, খোঁজ খবর নিত, ছোটমামার সঙ্গে আড্ডা মেরে চলে যেতো। তারপর আস্তে আস্তে সে তাপটুকুও নিভে গেল। নিভলেও সংবাদ সরবরাহের অসুবিধে ছিল না। সুভদ্রাই ছিল সেতু। বি. এ. পাস করবার পরেই সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল, তখনই সম্পর্কের ইতি ঘটল।

কেমন আছ—জিজ্ঞেস করায় অনুরাধার মনে আবার মেঘ ঘনিয়ে এলো। বলল, 'আমার আবার থাকা না থাকা। সুভদ্রা কোথায় বলুন।'

'শচীন তো দিল্লীতে বদলি হয়েছে, সুতরাং সেখানেই অধিষ্ঠিত।'

'আর সুভদ্রার আই. এ. এস. দাদাটি?' হাসল অনুরাধা।

আই. এ. এস. দাদাটি হেসে বলল, 'তিনি এখন দার্জিলিং নিবাসী। সুভদ্রার বিদূষী বন্ধুটি কী করছেন এখন জানতে পারি কি?'

'ঘোড়ার ঘাস কাটছেন।'

'বাঃ খুব ভাল কাজ। তা মামারা কেমন আছেন?'

'ভালো। মাসিমা-মেশোমশায় ভালো আছেন?'

'চল না দার্জিলিং নিয়ে যাই, সবাইকে দেখবে।'

'একটা কাজ দিন না।'

'কাজ! কী কাজ চাও বল?'

'আবার কী। স্কুল মাস্টারি।'

'করবে?'

'আছে?'

'আছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

মন নেচে উঠল অনুরাধার। ঘুমের বড়ির কথা ভুলে গিয়ে বলল, 'বাড়ি চলুন। কোথায় কাজ, কী কজ বলবেন। আমি আর বেকার দশা সহ্য করতে পারছি না।'

'বাড়ি যাবে? তার চেয়ে চল না, লেকটা চক্কর দিয়ে আসি একবার।'

'লেক?'

'মফস্বলের লোক হয়ে গেছি না? কলকাতা এলেই হাইকোর্ট লেক এসব দেখতে ইচ্ছে করে।' হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামল।

'ছেলেবেলায় নতুন নতুন ইংরেজি শিখে তুমি আর সুবি কী সব বলতে না? ডে স্পেন্ড, লাইফ এনজয়—কলকাতা এসে আমি সেই লাইফ এনজয় আর স্পেন্ড করে বেড়াচ্ছি।'

'ছুটি নাকি?'

'বলতে পারো এক রকম তাই। তবে পুরোপুরি নয়। একটা কাজের ছুতো নিয়েই এসেছি।'

পাশাপাশি বসে কথা বলছিল তারা। কতদিন পরে দাদাটিকে ভাল লাগছিল অনুরাধার। ঠিক তেমনি আছে। তেমনি ছটফটে হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মিশুক। তবু এদিক ওদিক তাকিয়ে বারে বারেই মন বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছিল। ব্যর্থতার বেদনার চেয়ে অসম্মানের যন্ত্রণাতেই যেন কষ্ট পাচ্ছিল বেশি। ভুল হয়েছে, গোড়া থেকেই ভুল হয়েছে। সুনন্দ যে খুব বিশ্বস্ত হবে না, বিবেকবান হবে না, একথা আগেই বোঝা উচিত ছিল। দুটো একটা ব্যবহার মনে পড়ল তার।

'কী ভাবছ?'

চকিত হয়ে আবছা হাসল অনুরাধা। বলল, 'কিছু না।'

'খুব অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে কিন্তু।'

'একটু অন্যমনস্ক হতেই পারি।'

'কেন?'

'বা রে, কতদিন বাদে দেখা হল, কত কথা মনে পড়ছে!'

'আমাকে কি তোমার মনে ছিল নাকি?'

'ছিল না? মামারা বলতেন, আপনার নাম যেমন নীলকান্ত, সত্যিই আপনি নীলকান্তমণি। আপনার আই. এস. হবার খবর যখন এল—'

'থাক থাক খুশি করতে হবে না। বিয়ে কবে?'

'বিয়ে!' চমকে গেল অনুরাধা।

'ভাবছ কিছুই জানি না? সুনন্দকেও আমি চিনি।'

'চেনেন?'

'মনে কর কলকাতা থাকি না বলে—'বলতে বলতে ট্যাক্সি থামল। নামতে নামতে বলল, 'এসো এখানটাতে বসি। লেকের এ দিকটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।'

হাঁটতে হাঁটতে জলের ধারে এল। 'চাকরির কথাটা কিন্তু আমি তোমাকে মিথ্যে বলিনি। কার্শিয়াংয়ের স্কুলে খালি আছে কাজটা। মাইনে ভাল।'

'আমার হবে না।' অনুরাধার হতাশ গলা বহুদূর থেকে ভেসে এল।

নীল বলল, 'কী করে জানলে হবে না?'

'আমার মত হতভাগ্যের কিছু হবার নয়।'

'ওরে বাবা, এ যে শ্মশান বৈরাগ্য। আসল কথা বল যে চাকরি তুমি নেবে না। কেনই বা নেবে আর কী করেই বা নেবে।'

'কেন ?'

'বললাম তো, তোমার বিয়ের খবর আমি জানি। জানো রাধা, দার্জিলিং শহরটা আমার মন্দ লাগে না কিন্তু কলকাতার কথা ভুলতে পারি না এমন কি সেই যে অল্পবয়সে বকুলবাগানে ছিলাম, সে কথাও ভোলা আমার পক্ষে কঠিন। বাড়ি করে বাবা টালিগঞ্জে এলেন বটে, আমাদের ভাইবোনের মন কিন্তু সেই ভবানীপুরেই পড়ে থাকল। বিশেষ করে তোমাকে আমি কখনই ভুলিনি।'

এ কথায় চোখে জল এসে গেল অনুরাধার। চুপ করে থাকল। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল, জলে তার কম্পন উঠছিল।

অনুরাধা বলল, 'কার্শিয়াং দার্জিলিং থেকে খুব কাছে, না ?'

'খুব। আমাকে তো সর্বদাই যেতে হয়।'

'আপনি হাকিম মানুষ, নিশ্চয়ই আপনার কথার অনেক মূল্য এসব অঞ্চলে —কাজটা আমাকে করে দিন।'

'সত্যি চাও ?'

'কত যে সত্যি বলে বোঝাতে পারব না।'

'তাহলে বিয়ের ব্যাপারটা— ?'

'হবে না।'

'আমি কিন্তু তোমার ছোটমামার চিঠিতে জেনেছিলাম যে—

অনুরাধা আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নীল কিছু বলল না, চুপ করে বসে বসে ঘাস ছিঁড়তে লাগল। অনেকক্ষণ শান্ত হয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে যখন মুখ তুলল, নীল তখন নিতান্ত সহজ গলায় বলল, 'আসলে চাকরিটা বলা যায় আমারই হাতে, করবে তো বলে দাও। যা আহ্লাদি, মামা-মামীরা রাজি হবেন কি না সেটাও বলে দিও।'

'আমি যে কত কৃতজ্ঞ হব তাহলে—'

'আচ্ছা স্বার্থপর তো। কাজ করে দিলেই কৃতজ্ঞ আর না দিলেই ভুলে থাকবে ?'

অনুরাধা হাসল।

'তুমি আমার ওখানেই উঠতে পারবে গিয়ে প্রথমে। তারপর—'

'তারপর ? তারপর আমি যেমন কুন্তলাকে ভুলে গেছি তুমিও তেমনি সুনন্দকে ভুলে যাবে।' হাসতে লাগল।

'কুন্তলা ?'

'আরে যার সঙ্গে আমার ভালবাসা ছিল, যাকে না পেয়ে আমি বিষ খেয়েছিলাম বি. এ. পড়াকালীন।'

'বিষ !'

'ঐ ঘুমের বড়ি। কী কাণ্ড। কী কাণ্ড। দোষ করল কুন্তলা কষ্ট দিলাম বাবা-মাকে। পাম্প করে সেই বিষ বার করা হল তারপর।'

অনুরাধা রুদ্ধস্বরে বলল, 'শেষে ?'

'শেষে ? এই তো দেখছ, কোথায় কুন্তলা কোথায় কে—তোমার ছোটমামাকে লিখলাম, রাধার খবর কী ? কী করছে ? আমার সঙ্গে বিয়ে দাও না।'

আপাদমস্তক কেঁপে উঠে অনুরাধা। সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় নীলের মুখের দিকে তাকাল। নীল বলল, 'আরে না না, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু হবে না। আমি অপেক্ষা করব। তুমি যদ্দিন বলবে তদ্দিন অপেক্ষা করব। চল উঠি।' অনুরাধা উঠল। জলের কাছে নীচু হয়ে ঘুমের বড়িগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। আস্তে বলল, 'যদি বলি অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই, তাহলে ?'

'তাহলে ? এক্ষুনি রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে নোটিসটা দিয়ে আসব, চাইলে এই সাতদিনের ছুটির মধ্যেও হয়ে যেতে পারে।'

'তবে তাই হোক।'

'সত্যি !' নীল হাত ধরল, মনে আছে রাধা, তোমার যখন বারো বছর বয়েস আর আমার আঠারো তখন কোন এক নির্জন দুপুরে আমি তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম। তুমি লাল টুকটুকে হয়ে একটা থাপ্পড় মেরেছিলে, বলেছিলে, জানো, চুমু খেলে বিয়ে করতে হয় ? আমি বলেছিলাম, আরো বড় হই তখন আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

সুনন্দর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভেদ করে অনুরাধার বুকের মধ্যে একটা আনন্দর বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মনে হল জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই মানুষটিই তার সখা।

স্বপ্ন ভেঙে যায়

'তারপর ?'

গল্পের গন্ধে নড়ে চড়ে বসলেন সাংবাদিক দুজন। এঁরা এসেছেন এলালতা রায়ের জীবনী সংগ্রহে। সেই বিদ্রোহী এলালতা, এককালে যাঁর খ্যাতিতে সারা বাংলা মথিত ছিল, সারা ভারতের সব বিপ্লবী দলের যিনি মক্ষীরাণী ছিলেন। গতকাল পঞ্চান্ন বছর বয়সে কলকাতা শহরের এক গরিব পাড়ার গরিব বাড়ির অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে যিনি নিঃশব্দে মারা গেলেন।

আর যাঁর কাছে এসেছেন, তিনি হচ্ছেন এলালতার দাদা, সেই কৃষ্ণ রায়, ঢাকার অনুশীলন সংঘের যিনি একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন, যাঁর ইঙ্গিতে শত শত ছেলেমেয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে পেরেছে, জঁলে ডুবতে দ্বিধা করেনি। কোন ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে যাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল।

কৃষ্ণ রায় অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, যেন ডুব দিলেন স্মৃতির সাগরে। গলা পরিস্কার করে নিয়ে বললেন, 'তারপরের সব খবর আপনারা এই খাতাখানা থেকেও পড়ে নিতে পারেন। এটা ওর ডায়েরি। বলেন তো আমিও পড়ে শোনাতে পারি।'

'আপনিই পড়ুন।'

খাতাখানা খুলে কৃষ্ণ রায়ের চোখে জল দেখা দিল, বোধহয় সদ্যমৃত বোনের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে। সামলে নিলেন তারপর গম্ভীর এবং মৃদুগলায় পড়তে লাগলেন আস্তে আস্তে।

'তারপর পার্টির হুকুমে কোনো একদিন কতোগুলো জরুরী কাগজপত্র এবং খবর নিয়ে ঢাকা থেকে আমি কলকাতা এলাম। আমার দাদার নির্বাসনের পরে তাঁর জায়গায় যিনি নেতা ছিলেন, তিনি জানিয়ে দিলেন, কাজটা সাঙ্গ হওয়া মাত্রই যেন আবার ঢাকা ফিরে যাই, একদিনও দেরি না হয়। কাগজে ছবি এঁকে জায়গাটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, আমি গা ঢাকা দিয়ে ছবি দেখে দেখে হাওড়া পুলের তলায় গঙ্গাতীর ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটছিলাম। ঘা খেয়ে খেয়ে ইংরেজ সরকার তখন ক্ষিপ্ত বাঘের মত হয়ে উঠেছে, ব্যবহার নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছেছে। গুলি লাথি লাঠি ব্যাটাবি বেয়নেট দোহাত্তা চালাচ্ছে দিগ্বিদিকে। যাকে পাচ্ছে ধরছে, মারছে, মেরে ফেলছে। গিসগিস করছে চারদিক পুলিশে, ঘরে ঘরে গোয়েন্দা লেলিয়েছে। ফিসফিস করেও মনের কথা বলছে না কেউ। তারই মধ্যে সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় গঙ্গার নিরালা পথে একা এগিয়ে চলেছি, আমার পরনে হিন্দুস্থানী গয়লানীর মত পোশাক, কপাল আর সিঁথি লেপ্টে তাদের মতই মেটে সিঁদূর মাখানো, মাথায় সোনার মত করে মাজা দুধের কলসী। যদিও তা শূন্য। সেই সময়ে এইসব কাজে অগ্রসর হওয়া মানেই মৃত্যুর দরজা খুলে দাঁড়ানো।

নিরাপত্তার কথা ভেবেই এই পথ আমাকে বাতলে দেওয়া হয়েছিলো। বুকের ভিতরে পিস্তল চেপে, কোমরের বটুয়ায় কাগজপত্র চিঠি নিয়ে টিপে টিপে এগুচ্ছিলাম আমি।

শরৎকাল, দিনটা মেঘলা মেঘলা, দু'এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে দুপুর বেলা। পথ পিছল ছিলো, আমার কষ্ট হচ্ছিলো চলতে। আমার পায়ে জুতো ছিলো না, কাদাতে পা বসে যাচ্ছিলো।

আগের রাত্রে থার্ডক্লাসের ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে জেগে জেগে সকালে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছি। কাছাকাছি কোন একটা হোটেল খুঁজে উঠেছি সেখানে, সমস্ত দুপুরটা কাটিয়েছি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে। আমার হাতব্যাগের ভিতরে যা আছে, কোনোরকমে যদি ধরা পড়ে যাই আর উপায় থাকবে না কারো। আমরা কেউ বাঁচবো না। হোটেলটায় উঠেছিলাম নামেই, শুধু দুটি খাওয়া ছাড়া বাকি সময় কেবল পথে পথে হেঁটেছি। এ রাস্তা থেকে সে রাস্তা, এ ফুটপাত থেকে সে ফুটপাত। একসঙ্গে এক জায়গায় স্থির হবার মত সাহস হয়নি। কেবলই মনে হয়েছে এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম।

আমার পা আর চলতে চাইছিলো না। সন্ধ্যার রং যতই গাঢ় হয়ে উঠছিলো, ক্লান্তিতে, ভয়েতে আর উদ্বেগে ততই আমি কাতর হয়ে পড়েছিলাম। শুধুই তো পুলিশের ভয় নয়, একজন মেয়ের পক্ষে রাত্রিবেলা এইসব ঝোপঝাড় জঙ্গলে নির্জন রাস্তা আরো কত কারণে ভয়াবহ। চোর জোচ্চোর গুণ্ডা বদমাইস, অভাব কোথায় সংসারে ? আমার দুরন্ত সাহস ছিলো, অপরিমিত মনের বল ছিলো, সেই সম্বলটুকুর জোরেই এগিয়ে চলছিলাম। ঐ পথের ধারেকাছেও ইলেকট্রিক ছিলো না তখন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলার রাস্তা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল। শুধু লাখে লাখে জোনাকিরা জ্বলতে লাগলো আর নিবতে লাগলো। অবিশ্রান্ত ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকার মিলিত শব্দে কানে তালা লেগে গেল শেয়াল ডেকে উঠলো ঝাঁক বেঁধে।

একটা জায়গায় এসে আমি দাঁড়ালাম। তাকালাম এদিক ওদিক। তাকালাম আকাশে। বোধহয় অমাবস্যা ছিলো, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এক ফোঁটা আলোর জন্য আমি আকুল হয়ে উঠছিলাম। সঙ্গের ছোট্ট টর্চটা জ্বেলে ম্যাপটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। গোপন আস্তানাটা কোথায় হতে পারে ভাবলাম খানিকক্ষণ। হঠাৎ ভীষণভাবে মেঘ ডেকে উঠলো, আকাশ চিরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকালো, আর কোথা থেকে একটা ভূতের মত লোক এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকে। আমি কেঁপে উঠে যে দিকে পারি সেদিকেই ছুটে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। বুকের ভিতরটাতে হাতুড়ি পিটছিলো। লোকটা চলে গেল কোথায়। অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলাম আড়াল থেকে। বেরিয়ে চারিদিকে তাকালাম, এগুতে গিয়ে থমকালাম। বুঝতে পারলাম এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমি দিকভ্রান্ত হয়েছি। আমার কাছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব একাকার হয়ে গেছে। ভয় পেয়ে একবার এদিকে গেলাম, আবার ওদিকে ঘুরলাম। আবার ফিরলাম, আবার হাঁটলাম। আবার থেমে থাকলাম কতক্ষণ। শেষে ছোটাছুটি করতে লাগলাম পাগলের মত। পথ হারিয়ে দেশাত্মবোধের উন্মত্ততা তখন দুর্নিবার ত্রাসের আকৃতিতে আমাকে গ্রাস করছিলো। আমার দাঁতে দাঁত লেগে আসছিলো। অন্ধকারে আর একটি লোককে পাশ কাটিয়ে কোথায় চলে যেতে দেখলাম। আমি ঢালু তীর ছেড়ে তখন রাস্তায় উঠেছি, লোকালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমার মন যদি সুস্থ থাকতো তা হলে এ রকম এক আধজন লোক দেখে এমন ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ছিলো না। আমি ভেবেই নিতাম, আমি ছাড়াও চলাচল করবার অধিকার আরো দু'চারজন লোকেরও আছে। কিন্তু সেই যে প্রথম লোকটি কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গিয়ে আমাকে দিশেহারা করে রেখে গেল, তারপর থেকে একটা পাতা পড়ার শব্দেও আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত

শিহরিত হয়ে উঠছিলো। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা একটা প্রচণ্ড গতি ইঞ্জিনের মত ধ্বক ধ্বক করছিলো।

আমি নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস ছিলো না। কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে আমি তাঁকে ডাকলাম, তাঁকে ছাড়া আর কারো কথা আমার মনে পড়লো না। তখন ঈশ্বরই বোধহয় আমাকে রক্ষা করলেন, আর একটা বিদ্যুতের রেখা এই প্রান্তর থেকে ঐ প্রান্তর পর্যন্ত আলো করে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর সেই আলোয় আমি একটা পুরনো ধরনের বাংলো বাড়ি দেখতে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম, 'পেয়েছি। পেয়েছি।' আবার টর্চ জ্বালিয়ে নকশাটা দেখলাম। ঠিক। সাদা রং, চওড়া বারান্দা, টালির চাল, রাস্তার পশ্চিমে।

ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে দৌড়ে চলে এলাম সেখানে। গেটের কাছে এসে টর্চটা জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালাম না। কে জানে কোথায় ওৎ পেতে আছে দস্যুরা, দেখে ফেলবে ঢুকতে। সন্তর্পণে সামনের জমি পেরিয়ে ঘন অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলাম। ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিলো, নির্দেশ মত গুনে গুনে চারটে টোকা দিলাম দরজায়। তারপর কম্পিত বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দরজা খুলে গেল, লণ্ঠন হাতে একটি মানুষ দরজার ফ্রেম জুড়ে ছবির মত এসে দাঁড়ালো। হাওয়া বইছিলো জোরে, আলোটা কাঁপছিলো, তারই মধ্যে আমরা দু'জন দু'জনকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তারপর দু'জনেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারো চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না।

সহসা আমি অস্ফুট শব্দে একটি ভয়ার্ত আওয়াজ করে পিছিয়ে গেলাম দু'পা। ভদ্রলোকটিও দু'পা এগুলো। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে একটু হেসে বললো, 'কী ব্যাপার ? এই বেশে ? এখানে ?'

হাসি দেখে আমার গা জ্বলে গেল। আমার তখন দাঁড়াবার মত শক্তি ছিলো না, কোমরের পেটিতে হাত চেপে মাথার শূন্য কলসিটা ফেলে দিয়ে তারই মধ্যে আমি দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। পিছনের থামটাতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম নিচে। ভদ্রলোক লণ্ঠনটা রেখে ছুটে গিয়ে আমাকে ধরলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বুকের ভিতর থেকে পিস্তলটা বার করলাম, হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে বললো, 'কী পাগলামি হচ্ছে ?'

এর পরে কিছুক্ষণের জন্য আমার কোনো চৈতন্য ছিলো না। সেই সুযোগে সে আমাকে পাঁজা কোলে করে তুলে এনেছে ঘরে, নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, সাবধানে বন্ধ করে দিয়েছে সব দরজা জানালা, যেন টুঁ শব্দটি বাইরে না যায়। পিছনেই ভৃত্যদের আস্তানা।

ঝালরওয়ালা পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলো, তাকাতেই ঝুঁকে পড়ে বললো, 'ভালো লাগছে একটু ?'

আমি হুড়মুড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিয়ে বললো, 'রাগারাগি করার স্বভাবটা এখনো যায়নি দেখছি। অসুস্থ হয়েছেন, শুয়ে থাকুন।'

আমি বললাম, 'আমাকে যেতে হবে ?'

সে বললো, 'কোথায় ?'

আমি বললাম, 'সেটা আমারই জানবার কথা, আর কারো নয়।'

সে বললো, 'কিন্তু এটা যাবার মত রাত নয়, যাবার মত জায়গাও নয়।'

'যে কোনো লোকের পরামর্শ শুনে চলতে আমি অভ্যস্ত নই।'

'নিশ্চয়ই নন। কিন্তু ভুল করে যখন একজন পরামর্শদাতার ঘরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—'

'আমি অসুস্থও নই।'

'নন বুঝি?' ভদ্রলোকের চোখেমুখে কৌতুক।

আমি উষ্ণ হয়ে বললাম, 'না।'

সে ততোধিক শান্ত হয়ে বললো, 'অসুস্থ না হোন অপ্রকৃতিস্থ তো নিশ্চয়ই।'

'ভেবে কথা বলবেন।'

'অনেক দিন ধরেই তো ভাবলাম, আর কত ভাববো?'

আমি চুপ করলাম। সে নরম করে হেসে বললো, 'ভয় নেই, যে কোনো অবস্থায়ই হোক, যে কোনো কারণেই হোক, আপনার কোনো অনিষ্ট আমি কিছুতেই করতে পারবো না। সেটাই আমার চরিত্রের একমাত্র অক্ষমতা। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

আমি চুপ।

'সাজপোশাক তো দেখছি হিন্দুস্থানী রমণীদের মত, মাথায় তেমনিই দুধের কলসি যদিও শূন্য, সিঁথিভরা তেমনিই সিঁদুর? একি সত্য? না ধাঁধা?'

আমি নিঃশব্দ।

'বিয়ে করেছেন নাকি?'

'জেনে আপনার লাভ আছে কিছু?'

'লাভ না থাকুক ক্ষতি তো থাকতে পারে?'

'ক্ষতি? কিসের ক্ষতি?'

'বলুন না সিঁদুরটা সত্য কি না।'

'ওটা আমাদের পথ নয়।'

'কোনটা? বিয়েটা? তা হলে প্রতিজ্ঞাটা এতদিনেও শিথিল হয়নি?'

'কারণ ঘটেনি কোনো।'

'এই বেশ তাহলে ছদ্মবেশ?'

'ক'টা বেজেছে বলবেন দয়া করে?'

'সময় জেনে কী হবে?'

'আমি পথ ভুল করেছিলাম।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আমি হাওড়া স্টেশনে যাবো।'

'সেখানেই কি যাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই রাত্রিবেলা? বিপথে? একা একা?'

'আমার ভয় নেই।'

'আমার আছে। কিন্তু সেটা কথা নয়, কথাটা হলো এই যে এ বাড়িটাকে হঠাৎ হাওড়া স্টেশন বলে ভুল হলো কেন?' তার ঠাট্টার ভঙ্গিতে আমি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। সে হাসলো, বললো, 'মিথ্যে কথা বলতে শেখেননি আবার রাজনীতির পাণ্ডা। শুনুন, আমি এ অঞ্চলের একজন কেষ্টবিষ্টু বিশেষ। নিজস্ব কুঠি ছেড়ে সরকারি নির্দেশে এই বাংলোয়

এসে ভালোমানুষ সেজে বসে আছি। কেন আছি জানেন তো ? এই আপনাদের মত দু'চারজন আনাড়িকে ধরবার জন্যে। ধরাও পড়েছেন। ছাড়া পাওয়া কি অতই সহজ ?'

'ও, আমি তাহলে আপনার বন্দী ?' আমার গলার স্বরে ঘৃণা পরিস্ফুট হলো।

'নিশ্চয়ই।' সে এতটুকুও বিচলিত নয়।

'ঠিক আছে।' চোখের পলকে উঠে শোবার ঘর ছাড়িয়ে বাইরের ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আমি চলে এলাম। আমার চেয়েও দ্রুত সে এসে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, সহাস্যে জিভ কেটে বলল, 'ছি, ছি, ওরকম ছুটোছুটি করবেন না। কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে একটা। মনে রাখবেন এখানে স্বয়ং হাকিম সাহেব বাস করছেন। তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অনেক যুগল হস্ত সর্বদা সচেতন। একটা পাতা পড়ার আওয়াজ হলেও দৌড়ে আসে তারা।'

'আমি যাবো, আমি থাকবো না।'

'কোথায় যাবেন ?'

'বললাম তো হাওড়া স্টেশন।'

'সেখানে গিয়ে ট্রেন ধরবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকার ট্রেন ? আমি তো যতদূর জানি হাওড়া থেকে কোনোদিন ঢাকা মেইল ছাড়ে না।'

'ইয়ার্কি।' ঠোঁট কামড়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিলাম।

'বড্ড রাগ হচ্ছে ; না ? লোকটাকে একেবারে কৃমি কীট বোধ হচ্ছে না ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু জানি আপনি কোথায় এসেছিলেন।'

এ কথায় আমি চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি কোমরের বটুয়ায় হাত রেখে সভয়ে বললাম, 'কোথায় ?'

'সে বাড়িটা রাস্তার ওপারে, আরো দক্ষিণে, আরো পুরনো। এবং 'ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট' হত্যার আসামী—যাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার তিরিশ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে সেই নিরঞ্জন দাস আপনার আমার চাইতে আরো অনেক বুদ্ধিমান। সে আসেনি।'

আমি সনিঃশ্বাসে বললাম, 'আমি তো তাকে চিনি না, আমি তো জানি না সে কোথায় আছে, আমি তো কোনো বাড়ি-টাড়িতে যাচ্ছিলাম না।'

'অমনিই একটু অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না ?'

'আমার কাজ ছিলো।'

'কাগজপত্র চালান করা।'

'না। কক্ষনো না।'

'বটুয়াটায় কী আছে ?'

'আমাকে যেতে দিন।'

'পাগল।'

'আমি যাবো।'

'এই অন্ধকারে, এই মেঘের মধ্যে, এমনি অনিরাপদ রাস্তায় ?'

'তা কি এর চেয়েও অনিরাপদ ?'

'এর চেয়েও।'

'বেশ তো, আমার নিরাপত্তার জন্য যদি এতই ব্যস্ত, কাউকে সঙ্গে দিন, সে গিয়ে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক স্টেশনে।'

'উহুঁ, তা আর হয় না।'

রেগে উঠতে গিয়ে খোসামোদ করে বললুম, 'আমাকে দয়া করুন—'

'আমাকে কে দয়া করেছিলো?'

'আমি—আমি—'

'আবার পিস্তলটা নিয়ে নাড়ানাড়ি করছেন কেন? ওটা দিন তো আমাকে। সে হাত বাড়ালো আমার দিকে, ছেলেমানুষের হাতে কি কখনো এসব খেলনা মানায়? অবিশ্যি যদি চান নিশ্চয়ই ওটার সদ্ব্যবহার করতে পারেন আপনি। কিন্তু আমি বলছিলাম যে এখানে নয়, এ কুঠিতে নয়, চলুন নির্জন নদীর ধারে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই, আপনি আমাকে চিরতরে বিদ্ধ এবং বাধিত করুন। আপনার হাতে মরবো সে আমার সুখ।'

অপেক্ষা করে বললো 'কী রাজি? যাবেন? চলুন না। কেউ জানবে না। শুধু আমি আর আমার ঈশ্বরই জানবো ভালোবাসার জন্য প্রাণ দিতেও কত আনন্দ। মৃত্যুও কোনো কোনো সময় কী রমণীয় হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে। বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়ে উঠলো। এমন ভাবে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো যে সে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে সহস্র বেদনায় মথিত হলো। আমি আমার দুর্বল দেহটা দেয়ালের ঠেসানে রেখে চোখ বুঝলাম। জোর করে দাবিয়ে রাখা অনুভূতিগুলো তোলপাড় করে তুললো হৃদয়।

কী আশ্চর্য! সময় কি তবে সেখানেই থেমে আছে? অথচ বয়স তো দু'জনেরই অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তবু এই শত্রু কোথায় ঘাপটি মেরে বসেছিলো নিভৃত অন্তরে? চোখে চোখ রেখে কেমন অল্প বয়সী মেয়ের মত কাঁপছে ভিতরটা। আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিলো। আমি সেখানে, মেঝেতে বসে পড়লাম। সব স্পষ্ট মনে পড়ে গেল।

বোধ হয় সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন সেই সময়েই আমার আলাপ হয়েছিলো এর সঙ্গে। ও তখন বি. এ. থার্ড ইয়ার পেরুচ্ছে। দুর্দান্ত ছাত্র। শুধু ছাত্রবৃত্তিতেই নয়, সুব্রত সেনের নাম আরো অনেক কিছুর জন্যও বিখ্যাত। এমন কি চেহারার জন্যও; ঘসা মাজা শ্যাম রং, সিংহ কোটি, বিশাল বক্ষ, অজানুলম্বিত বাহু—অর্থাৎ রূপে গুণে সুব্রত সেন হীরের টুকরো।

কুটুম্বিতার সূত্রেই আলাপ। তখনকার দিনে যুবক-যুবতীদের দেখাশুনোর এই একমাত্র উপায় ছিলো। আমার কোন দূরসম্পর্কের মাসি ওর কোন দূরসম্পর্কের মাসি ছিলেন এবং ওর আর আমার সেতু ছিলো আমাদের বোন এবং বন্ধু রীণা! অর্থাৎ আমার মাসির মেয়ে। রীণা আমার সঙ্গে পড়তো।

আলাপটা প্রলাপে প্রলম্বিত করার ইচ্ছে সুব্রত সেনের ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা ছিলো, কিন্তু আমি ততদিনে আমার দাদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছি। সুতরাং তার ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছের কোন মিল হলো না। অবশ্যি তাতে সে বিরত হবার ছেলে নয়। আর কিছু না পারুক বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চড়ে সতেরো বার যেতে আসতে তো আর কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। সুব্রত ঢাকার

লক্ষ্মীবাজারের ছেলে, আমি ঢাকার ওয়ারীর মেয়ে। লক্ষ্মীবাজার থেকে ওয়ারীর দূরত্ব ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট, তাছাড়া সেটা কোন উপলক্ষেই তার যাতায়াতের পথ হতে পারে না। ওর কাণ্ড দেখে আমি হেসেছি, তখন স্বীকার করিনি কিন্তু এখন স্বীকার করছি, আমার ভালোও লেগেছে। উদাস ভাব দিয়ে আমিও গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াতাম বৈকি, দেখি না দেখি না করে দেখতাম বৈকি। দু'একবার যে চোখাচোখিও হয়ে যেতো না এমনও নয়।

ঐটুকু সূত্র ধরেই সেই বছর দোলের দিন রীণাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোল খেলতে এলো। আমার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিলো না, জমিয়ে নিল এক মুহূর্তে। আমি তখন স্নানটান করে দোতলায় আমার নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে গীতাপাঠে মগ্ন ছিলাম। আমার জীবনযাপন তখন আমাদের সঙ্ঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। তখন আমার মাত্র এক দাদাই নয় সকল দাদাই অভিভাবক! রক্তের অক্ষরে অনেক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। দেশ ধ্যান, দেশ জ্ঞান, দেশই জীবনেব একমাত্র লক্ষ্য, এই মন্ত্র জপানো হচ্ছে সবেগে। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ব্যায়াম, প্রাণায়াম, এই সবের মধ্যে বিকিয়ে আছি, দোলখেলার মত একটা কুসংস্কারের আনন্দে নিজেকে ডালি দেব তত ছোট কথা ভাবতেই পারছি না। রীণা এসে 'এই দরজা খোল, খোল শিগ্‌গির,' বলে চেঁচাতে লাগলো।

রীণার আগে আরো দু'চার দল এসেছে, তাদের ভাগিয়েছি, রীণাকেও বললাম, 'আমি ওসব ভালোবাসি না, আমি স্নান করেছি—'

'তুই না বাসিস আমি বাসি, খোল—' রীণা দুম দুম করে ধাক্কা দিল। রীণার দাদাটিও যে পিছনে দণ্ডায়মান তা আমার কল্পনায়ও আসেনি। নিচে সিঁড়ির মুখ থেকে আমার মায়ের গলা ভেসে এলো, 'ও কি অসভ্যতা, বন্ধু এসেছে আর তুই দরজা বন্ধ করে বসে আছিস?' আরো কী গজগজ করলেন তিনি।

এক সময়ে রীণার ধাক্কা থামলো, পায়ের শব্দে অনুমান করলাম রাগ করে নেমে গেল সে।

এবার ঈষৎ অনুশোচনা হলো আমার। হাজার হোক রীণা আমার বন্ধু, এভাবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই আমার উচিত হলো না ভেবেই আমি দরজা খুললাম এবং বারান্দার চৌকাঠে পা দিয়েই চমকে গেলাম।

সুব্রত হাসলো, বললো 'রীণা নিচে গেছে জল খেতে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। রীণা বিরক্ত হতে পারে, তৃষ্ণার্ত হতে পারে, ধৈর্য হারাতে পারে কিন্তু আমি তার কোনটাই পারি না। আমাকে যতক্ষণ খুশি অপেক্ষায় রাখুন দেখবেন ঠিক অবিচল আছি। আসুন একটু আবির মাখিয়ে দি।'

পকেট ভর্তি সুগন্ধি আবিরের সৌরভে ভুরভুর করছে জায়গাটা। পাতলা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোকিল পাড় ঢাকাই ধুতি পরে বাবু মাধব সেজে দোল খেলতে এসেছেন।

একটুও লজ্জা নেই, অনুমতির অপেক্ষা নেই, মুঠো মুঠো আবির সে আমার মুখে মাথায় মাখিয়ে দিতে লাগলো। তার বলিষ্ঠ হাতের সবেগ অনধিকার স্পর্শে আমি প্রায় দিশাহারা। হাত তুলে বাধা দিতে গিয়েছিলাম তাতে তার আরো সুবিধে হলো। বাঁ হাত দিয়ে আমাকে বেষ্টনীর মধ্যে চেপে রেখে ডান হাতে একাই একশো হয়ে তচনচ করে দিল আমার সদ্য স্নানের সুচিতা—আমি তার বুকের ছোঁওয়ায় পায়রার মত কাঁপছিলাম। অত্যন্ত উদভ্রান্ত আর অস্থির কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, 'কী? রাগ?

দোলের দিন রাগ করতে নেই।' নেমে গেল হাসতে হাসতে। যেন একটা দস্যু। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে জ্বলতে লাগলাম। কী একটা অসহ্য তাপে, বোধহয় ওর হৃৎপিণ্ডের তাপ।

মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এরপর আর ওকে ঠেকায় কে ? অছিলার কি অভাব আছে ? কত কারণ নিয়েই যে হাজির হতো এসে। কিন্তু আমি দেখা করতাম না, বসে থাকতাম নিজের ঘরে। মনে মনে বলতাম আমি কি আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত আর একজন যে এই সব চোখ ধাঁধানো যুবকদের কাছে প্রেম প্রণয়ের ফাঁদে পা দিয়ে আমার অনেক বড় হওয়াকে ছোট করে মাটিতে নামিয়ে আনবো ? হতাশ হয়ে সুব্রত চলে যেতো। কোন কোন দিন মরিয়া হয়ে ভদ্রতার সীমাও লঙ্ঘন করে ফেলত। চট করে কী বলতে বলতে ভীষণ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠে আসতো দোতলায়, বাইরে থেকে বলতো, একটা কথা ছিলো।

অগত্যা দরজায় এসে দাঁড়াতাম, চুপ করে থেকে বলত, 'যত কাজ সব আমি এলে, না ?'

আমি বলতাম, 'আপনি যে এসেছেন তা তো জানি না।'

সে বলতো, জানেন, আর জানেন বলেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন। 'নিজের উপর আপনার খুব ইয়ে দেখছি।'

'কী ?'

'ভাবছেন সবাই কত সচেতন আপনার জন্য, আপনাকে ভেবেই ঘরে বসে থাকা অথবা বাইরে বেরুনো। না তা নয়।'

'বেশ তো, তাই না হয় হলো। আপনি না হয় জানতেন না আমি এসেছি। এখন তো জানলেন, এখন কী করবেন ?'

'কী উদ্ভট প্রশ্ন। এর জবাব আছে নাকি কোন।'

'নিশ্চয়ই বলবেন, বসুন।'

এই বলে ঘরে ঢুকে আমার ছড়ানো ছিটানো বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লেগে যেতো।

তখন ছিলো আমার বয়েস সতেরো, সেই বয়েসের কাঁচা কোমল মনটাকে রাশ টানতে টানতেও সে অবাধ্য হয়ে অনেক দূর চলে গেছে, কিন্তু আই. এ. পাস করে যত দিনে আমি কুড়ি বছরে পা দিয়ে বি. এ. ক্লাসে পড়তে এলাম ততদিনে অনুশীলন সঙ্ঘের প্রভাবে এবং বয়েসের পরিপক্বতায় আমি অনেক বেশি শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছি। দেশের কাজে আমার আগ্রহ উৎসাহ, নেশা, ভালোবাসা, প্রেমভক্তি হৃদয় মন সব নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সুব্রত অবুঝ। এই সব ছোট সুখ দুঃখে আমার এমন গভীর অরুচি জেনেও তার উদ্যম এতটুকু কমলো না। আমি চেষ্টা করেই তার সঙ্গে দেখাশুনো করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কেন না হৃদয়কে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে পাপ। একটা ক্ষুদে পোকা অল্প বয়েসে ঢুকে গিয়েছিলো বুকের ভেতরে, মধ্যে মধ্যেই সে নানা কারণে জানান দিতো সে আছে সেই জন্যেই বেশি সাবধান ছিলাম, হয়তো সে জন্যই সুব্রতর উপর আমার কেমন একটা আক্রোশ হতো। আমি ক্রুদ্ধ হতাম। এবং সেই রাগ মাঝে মাঝেই প্রতিশোধের চেহারায় উগ্র হয়ে উঠতো।

একদিন কলেজে লম্বা করিডোরে মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

'এই যে, কী খবর।' খুব পিঠ চাপড়ানো সুরে আমিই সম্ভাষণ করলাম প্রথমে। এটাও আমার একটা সতর্কতার কৌশল।

'আপনার খবর কী?' যেতে যেতে থামলো সুব্রত।

'শুনলাম এবার আপনিই জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছেন?'

'আপত্তি আছে?'

'আপত্তি কেন হবে?'

'অ্যাসিসটেন্ট হবেন নাকি?'

'কার?'

'আমার?'

'আপনার?'

'দোষ কী?'

'না, দোষ আর কী? তবে সবাই কি আর সকলের সহকারী হবার যোগ্য?'

'যোগ্য করে নেবো।'

'অত কষ্টে কাজ নেই।' চলে যাচ্ছিলাম। ডাকলো।

'শুনুন।'

ইচ্ছে ছিলো না, তবু ঘুরে দাঁড়ালাম।

'আমি এখান থেকে চলে যাবো।'

'কোথা থেকে?'

'এই কলেজ থেকে, এই দেশ থেকে।'

'হঠাৎ এত বৈরাগ্য?'

আমার ঠাট্টার জবাবে, সে গভীর হয়ে বললো, 'আপনাকে দেখলে, আমার যন্ত্রণা হয়।'

'এ কী অদ্ভুত কথা?' আমি হেসে খুন।

'আপনাকে দেখা না দেখা দুইই আমার যন্ত্রণা।' সে তেমনি গম্ভীর।

'তা বিলেত যাচ্ছেন কবে?'

'গেলেই ভালো, নয়?'

'ভালো ছেলেরা তো তাই যায়।'

একটু তাকিয়ে রইলো সুব্রত, তারপর বিদায় না নিয়ে পার হয়ে গেল লম্বা করিডোর। তার কিছুদিনের মধ্যেই বোধহয় কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলো।

হঠাৎ একদিন রীণা এসে হাজির, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, 'শোন এলা তোর চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো আমাদের বাড়িতে মঙ্গলবার, চারটার সময় যাবি বুঝলি?'

'কেন রে? তোর জন্মদিন নাকি?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম।

সে বললো, 'বাইশ বছরের মেয়ের আর জন্মদিন হয় না। বিয়ে হচ্ছে না বলে ঘুম নেই তা আবার জন্মদিন। আমি নিবারণদাকে পাঠিয়ে দেব, সে তোকে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাবে।'

শনিবারের পরে মঙ্গলবার আসতে দেরি হলো না খুব। নিবারণদা রীণাদের সব অর্থেই অতি পুরনো লোক। বয়েসেও কাজেও। সে ঠিক মত এসে এক গাল হেসে নিয়ে গেল আমাকে। উয়ারী থেকে পুরানা পল্টন। রীণা গেটেই দাঁড়িয়েছিলো, ঘরে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম রীণার মা অর্থাৎ আমার মাসিমা সারাদিনের জন্য নারায়ণগঞ্জ গেছেন রীণার বাবাও আপিস থেকে যাবেন ফিরতে ফিরতে রাত হবে। রীণার ছোটো ভাইটিও গেছে মায়ের সঙ্গে। সুতরাং বাড়িতে রীণা একা। আর অভিভাবক নিবারণদা। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা দু'জন। একজন আমি, এসে গেছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্যজনও এলো।

দড়াম করে বাগানে সাইকেলটা ফেলে রেখে সুব্রত ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলো এসে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে যেন জানতো না আমি আসবো এমনই একটা ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরে আপনি! এ যে মেঘ না চাইতে জল।'

সুব্রতর হাত ভর্তি ফুল, টকটকে লাল গোলাপ। রীণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। নাও।'

রীণা সহাস্যে বললো, 'লজ্জা কী? সত্যি সত্যি যার জন্য এনেছ তাকেই দাও। কই এর আগে তো কখনো ফুলটুল দেখিনি তোমার হাতে। সব সময়ে তো র‍্যাকেটই দেখেছি। আবার কবিতা লিখতে শুরু করনি তো?'

সুব্রত বসলো। বললো, 'ফাজলামি না করে চা আন দেখি ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

রীণা চোখ টিপে ভিতরে চায়ের যোগাড়ে গেল। আমি আর সুব্রত একা হলাম। এবং সুব্রত এটাই চেয়েছিলো।

'পরীক্ষা কেমন হলো?' সহজভাবে আলাপ সুরু করলো সে।

বি-এ, ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পরীক্ষার খবর। চোখ টান করে বললাম, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?'

'উপস্থিত যখন আর কেউ নেই—'

'বছর থেকে বছরে উঠতে নেহাতই কেউ ফেল করে না নইলে তাই করতাম।'

'ভারি গৌরবের কথা। না?'

'কী আর করা! আপনার মত ভালো ছাত্র আর হতে পারলাম কই।'

'ছাত্রই যদি হতে পারলেন তো ভালো হওয়াই উচিত ছিলো।'

'ভালো মন্দের সংজ্ঞাটা তো আর সকলের কাছে সমান নয়?'

'আপনার সংজ্ঞাটা কী রকম?'

'সেটা তর্কের বিষয়।'

'আমার সঙ্গে তর্ক ছাড়া আর তো আপনার কোনো কথা নেই, সুতরাং সেটাই চলুক না।'

'প্রবৃত্তি নেই।'

'ঠাট্টা বিদ্রূপ করবার এমন একটা উৎকৃষ্ট সুযোগ হেলায় হারাবেন?'

'বাজে কথা।'

'তা হলে কাজের কথাটা বলে ফেলি।'

'আমার সঙ্গে আবার কী কাজের কথা?'

সুব্রতর মুখভরা হাসি, 'প্রথম কথা হচ্ছে এই যে দয়া করে একটু প্রসন্ন হোন।'

এ ধরনের কথায় আমি আরো অপ্রসন্ন ভঙ্গি করলাম।

সে বললো, 'আচ্ছা যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?'

'মানে?'

'যারা দেশোদ্ধার করতে, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে মিছিলে যায় তাদের হৃদয় কি একটু কোমল হতে পারে না?'

'এটাও বাজে কথা।'

'এটা ফাল্গুন মাস তা জানেন।'

'জানার মধ্যে কি কিছু বিশেষত্ব আছে?'

'পরশু সাতাশ তারিখ তা জানেন?'

'জানি না।'

'সাতাশ তারিখে যে দোল তাও জানেন না?'

'না। দোল খেলার চেয়ে অনেক জরুরী বিষয়ও অনেকের ভাববার থাকে, করবার থাকে।'

'আমার নেই। আমি দিনরাত ঐ দোলের কথাই ভাবছি। রাগ করে গেল বছর যাইনি, কিন্তু প্রথম বছরের দোলের দিনটা আমার কাছে সব চেয়ে, সুখের দিন। সেই সুখ আবার আমি ফিরে পেতে চাই।'

সুব্রতর আস্পর্ধার আমি সীমা দেখতে পেলাম না।

সুব্রত জানে না সে আগুন নিয়ে খেলছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললাম, 'সবাই জানে এবং আপনি জানেন, আমি ওসব দোল-খেলাটেলা পছন্দ করি না। আপনার কাছে যেটা সুখ আমার কাছে সেটা একটা অত্যন্ত ক্রুড এবং ভালগার ব্যাপার।'

সেও দাঁড়ালো, বললো, 'সে আপনি যাই বলুন আমি জানি দোল খেলা পছন্দ না করলেও আমাকে অপছন্দ করেন না।'

'সত্যি?' ভুরু বাঁকালাম আমি।

'হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু আরো কথা আছে আমার।'

'আর একদিন শুনবো।'

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন চায়ের নিমন্ত্রণ একটা অছিলা, রীণা আমাকে সুযোগ দিয়েছে?'

'আর তার আপনি এভাবে সদ্ব্যবহার করছেন, না?'

'কী করবো, প্রাণের দায়। আমি যে আপনাকে ভালবাসি।'

কথা শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত।

'বোঝেন না কেন আপনার এ রকম ব্যবহারে আমার কী ভীষণ কষ্ট হয়। রাগ করি আবার ভুলে যাই।'

'পথ ছাড়ুন, আমি ভিতরে যাবো।'

'না, আমার সব কথা আপনাকে শুনতে হবে আজ!'

'অসম্ভব।'

'আমি খুব শিগ্গিরই বিলেত যাচ্ছি।'

'বেশ তো।'

'তার আগে বিয়ে করে যেতে চাই।'

'সে তো আরো ভালো।'

'তা হলে আপনি রাজি?'

'যোগ্য পাত্র, বিয়ে করবেন এর মধ্যে আমার রাজি-গররাজির প্রশ্ন উঠছে কোথায় ?'

'পাত্রী তো আপনি।'

'কী।', বিদ্যুতের মত ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। ইচ্ছে করলো বেয়াদপ ছেলেটাকে একটা চড় লাগাই।

'অবাক হচ্ছেন কেন ?'

'শুনুন সুব্রত সেন, আমি আমার গলার গরমে ওকে পুড়িয়ে দিতে চাইলাম, আপনার মত একটি বাতুলকে কী ভাবে শিক্ষা দিতে হয় আমি তা জানি। কিন্তু আপনি আমার কাছে ততটুকুও নন যার জন্য সেই মনোযোগটুকুও আমি খরচ করতে পারি।' এক ঝটকায় পর্দাটা সরিয়ে আমি ভিতরে ঢুকে গেলাম। গিয়ে দেখলাম রীণা খাবার সাজাচ্ছে প্লেটে, স্টোভে চায়ের জল ফুটছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললো, 'জানিস আজ সুবুদার জন্মদিন, রাত্তিরে ওবাড়িতে খুব ধূমধাড়াক্কা হবে, আমিও একটু ছোট্টো করে আয়োজন করলুম। জানি চলে যাবে তো একটা উপহারও কিনেছি, দেখবি ?'

গম্ভীর মুখে বললাম, 'আমাকে ডাকার কোন দরকার ছিলো না এই আয়োজনে।'

'তোর জন্যই তো সব। তুই আসবি বলেই তো ওর জন্মদিন আজ ওর এ বাড়িতেই সার্থক হচ্ছে। আহা, তুই যেন আর জানিস না কিছু। মা বাবা বাড়ি নেই, আমরা খুব আড্ডা মারবো আজকে। ওদের নিজেদের বাড়িতে যদি পিসিমা আজ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা না করতেন, বেশ সিনেমায় যেতাম।'

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে রীণা উঠলো। 'আয়' বলে চলে গেল বাইরের ঘরে। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। রীণা ফিরে এলো তক্ষুনি ভুরু কুঁচকে বললো, 'সুবুদা কোথায় গেল রে ?'

'ও ঘরেই তো।' আমার কানের কাছটা তখনো তপ্ত মনে হচ্ছিলো।

রীণা বললো, 'কই কোথাও তো দেখলাম না। সাইকেলটাও তো নেই। কী ছেলেরে বাবা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না ?'

আমি বুঝতে পারলাম সে চলে গেছে।

চলে সে সত্যই গিয়েছিলো। রীণার বাড়ি থেকে গিয়েছিলো সেদিন, তার দু'মাস পরে গিয়েছিলো ঢাকা শহর থেকে। মনের কোনো আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম নয়, আমি তা চাইনি কিন্তু সে ঢাকা শহরে নেই এই অনুভব আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল, আমার হৃদয় আমার শত্রু হয়ে বিস্বাদ করে দিয়েছিলো সব, আমি সব ভুলে দিন রাত তাকেই ভেবেছি, নিঝুম রাতে চোখের জলে ভেজা বালিশে মুখ রেখে অনুচ্চারে বলেছি, 'সুব্রত আমিও তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে যা বলেছি তা আমার অহংকার, আমি নয়।'

কিন্তু সে সব তো আজকের কথা নয়। সে তো গতজন্মের। তারপরে কত ঋতু পার হয়ে গেল বয়সের উপর দিয়ে কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কর্মভার নিয়ে কত কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলাম, আর শেষে কিনা—

বছর পাঁচেক পরে সুব্রত আই. সি. এস. হয়ে ফিরে এসেছিলো ঢাকায়। একদিন সকালে, ছুটির দিনে এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আমার চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলো, 'পাঁচ বছর কি খুব বেশি সময় ?'

'আমি বলেছিলুম, আমার জীবনে পাঁচ যুগ চলে গেছে তারপর।'

'অর্থাৎ ধূ ধূও মনে পড়ে না কিছু ?'

আমি নিষ্ঠুরের মতো বলেছিলাম, 'ধূ ধূও কিছু ছিলো, এমনিও তো স্মৃতি নেই কোনো।'

আসলে আদর্শ নামক পদার্থটি বড় কঠিন, বড় ভীষণ, একবার যদি তার ফাঁদে পা দেওয়া যায় আর বেরুবার উপায় থাকে না। সেই গর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছিলাম আমি। নিজের সঙ্গে নিজে লুকোচুরি খেলছিলাম। নইলে সেবারও সুব্রত যখন ঢাকার বাস তুলে তার মা বাবাকে নিয়ে তার কর্মস্থলে চলে গেল আবার কেন আমার হৃদয় মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ? সেই মেঘ কি আবার অনেক রাতে জল হয়ে ঝরে পড়েনি বিছানার নির্জনে।

অদৃষ্টের কী পরিহাস, এতদিন পরে ঘুরে ফিরে শেষে সেই মানুষের খপ্পরেই পড়লাম এসে ? আর মানুষটা এখনো, এত বছর পরেও ঠিক তেমনি, রয়ে গেল।

কী জানি কী হলো আমার, আমি দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, আর সে চুপ করে দেখতে লাগলো সেই কান্না। অনেক পরে বললো, 'চলুন আপনাকে দিয়ে আসি। বলুন কোথায় যাবেন।'

আমি জবাব দিলাম না, আমার হাতটা তুলে নিল হাতে তারপর আমার পাশে বসলো সে, হঠাৎ উন্মত্ত আবেগে টেনে নিল বুকের মধ্যে চুম্বনে আলিঙ্গনে পিষ্ট করতে করতে বললো, 'আমি জানতাম পাষাণ একদিন গলবে। তুমি আসবে, নিজে থেকে আসবে।'

ডুবে যেতে যেতে আমি নিজেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ে বললাম, 'আমাকে তুমি নষ্ট করে দিলে, অশুচি করে দিলে, আমার সাধনা সঙ্কল্প সমস্ত তুমি ভেঙে দিলে। তুমি নিষ্ঠুর চরিত্রহীন। তুমি ইতর, তুমি কামুক। তুমি একজন মেয়েকে একা পেয়ে তার সুযোগ নিলে। এই তুমি। এই তোমার স্বভাব।'

সুব্রত বললো, 'হ্যাঁ এই আমি, আমার এই স্বভাব। আমি কাপুরুষ নই। আমি আমার সর্বস্বকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেব তত মূর্খ নই। আমার তেত্রিশ বছরের ক্ষুধিত যৌবন আমি শুধু তোমাকে পাবার জেদেই পবিত্র করে রেখে দিয়েছি, আর তুমি ছাড়া পাবে না কোনো দিন। কোনো দিন না। কোনো দিন না।'

সুব্রতর গলার আওয়াজ মেঘের মত গুম গুম করছিলো। আমি আমার আবাল্যের প্রেমিকের কাছে সেদিন সমর্পণ করেছিলাম নিজেকে।

সাতদিনের মধ্যেই আমরা আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত হয়ে ছিলাম। সুব্রত আমাকে সুখের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এতদিনের প্রতিহত তরঙ্গ উভয় দিক থেকেই আমাদের উত্তাল হয়ে উঠেছিলো। চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে, সেটা তার অনেক দিনেরই পরিকল্পনা। তখন জোর পেলো। আর হিংসার রাস্তা ছেড়ে আমিও ভেবেছিলাম মহাত্মাজীর আদর্শের কাছেই প্রণিপাত জানাবো।

বিয়ের ঠিক দশ দিনের মাথায় সুব্রতকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলো আমার দলের লোকেরা। নেতার আসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুকান্ত বক্সী, যার নাম তখন সকলের মুখে মুখে, কাজটা তাঁর আদেশেই হয়েছিলো। তারপর তিনি নিজে এসেছিলেন আমাকে ফিরিয়ে নিতে। নতমস্তকে এমন প্রস্তাবও করেছিলেন আমি ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে ভবিষ্যতে বিবাহের মর্যাদা দিতে রাজি আছেন, তখন আমরা স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে কাজ করতে পারবো। যদি আমি এ কাজ থেকে অবসর নিতে চাই তাতেও তাঁর আপত্তি নেই।

যদি আমি চাই তিনিও অবসর নিয়ে বাকি জীবন আমার সান্নিধ্যে একান্ত হয়ে থাকুন তাতেও তিনি রাজি আছেন। আর সব শেষে জানালেন আমাকে তিনি দেশের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

আমি কোনো কথারই জবাব দিইনি, কোনো প্রতিশোধ নেবার কথাও ভাবিনি। আমার বুক থেকে সে আমার হৃৎপিণ্ড খসিয়ে নিয়েছে। সেই সুকান্ত বক্সীর দিকে তাকাবার মত বল ছিলো না আমার।

কৃষ্ণ রায় পড়া থামালেন। চোখ বুজে রইলেন অনেকক্ষণ। ঢোঁক গিলে বললেন, 'তার পরের বছর দেশ স্বাধীন হয়েছিলো, আমি ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছিলাম। তখন পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হয়ে গেছে। এলা তখন এখানে, এই বাড়িতে বৈধব্য জীবন যাপন করছে। নিজের জীবন থেকে চিরদিনই বঞ্চিত ছিলো সে অল্প বয়স থেকে আমিই তাকে দেশোদ্ধারের দীক্ষায় সন্ন্যাসের মন্ত্র জপিয়ে জপিয়ে এই বঞ্চনার পথে নিয়ে এসেছিলাম, একটা রঙিন শাড়িও পরতে দিইনি কখনো, তারই প্রতিশোধ হলো।'

আমি দেখলাম আমার সেই অলোকসামান্য সুন্দরী বোনের দেহমন থেকে তার সমস্ত নির্যাস শুষে নিয়ে চলে গেছে সুব্রত। সুব্রতকে সে এক মিনিটের জন্যও ভুলে থাকতে পারছে না।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন ভারতের মাটিতে যেন ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করতে করতে এসে পা রেখেছিলুম। কিন্তু ঠেলে এগিয়ে যাবার শিক্ষা ছিলো না তাই জায়গা হলো না কোথাও। না আমার না বোনের। বিপ্লবের পথে ছেড়ে আমিও ততদিনে অহিংসার পথকেই প্রশস্ত বলে জেনেছি। একটা স্কুল খুললাম, এলাকে চোখ মুছিয়ে হাতে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলাম বাচ্চাদের সামনে। বললাম, 'এতে তোমার নিজের কতটুকু চলবে ভেবো না, ওদের চলতে শেখাও।' তারপর এই তো দেখছেন পরিণতি : এই ভাঙা ঘরেই আধপেটা খেয়ে সে সকল যন্ত্রণা জুড়োলো, আমি ওর থেকে সাত বছরের বড় হয়েও পড়ে রইলাম পিছনে।

সাংবাদিন দু'জন নিস্পৃহ মুখে যথাযথ সব টুকে নিয়ে 'আচ্ছা আসি' বলে বেরিয়ে এলো বাইরে। দু'হাতের আড়ালে সিগারেট ধরাতে ধরাতে একজন বললো, 'বেশ ফলাও করে লিখতে হবে হে ঘটনাটা। এখনো 'দৈনিক হরকরা' টের পায়নি এদের ঠিকানাটা।' অন্যজন বললো, 'উঃ, দিনের বেলাতেও ঘরটা কী অন্ধকার। এই থিকথিকে বর্ষায় এই জঘন্য পাড়াটার মধ্যে কে আর আসবে কষ্ট করতে ? এমন কিছু ইমপর্টেন্ট খবর নয়।'

ভেজানো দরজা

ছেলেবেলায় আমার মা আমাকে একটি খেলা শিখিয়েছিলেন তার নাম 'লেখা লেখা খেলা।' খুব অল্পবয়সে পড়তে শিখেছিলুম। কিন্তু লিখতে শিখেছিলুম অনেক পরে। আর লিখতে শেখার পরই মা বললেন, 'তুই আর আমি যেন দু'বাড়ির দুই বন্ধু। ধর, আমাদের অনেক দিন দেখা হয় না আর তাতে আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি, এই ভাবে দু ঘর থেকে দু'জনে দু'জনের কাছে চিঠি লিখব, কেমন?'

মা বলেছিলেন অভ্যাসের জন্য, কিন্তু খেলাটা আমার যে কী মনঃপুত হয়েছিল, বলতে পারি না। তখুনি গিয়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া অক্ষরে লিখলাম, 'আমার সবচেয়ে ভাল আর সুন্দর আর মিষ্টি মা বন্ধুগো ; তোমাকে যে আমি কতদিন দেখি না তার কি কিছু ঠিক আছে নাকি? আর সেই জন্য আমার মন কেবলই কেবলই কাঁদে। কিন্তু কাঁদতে আমার খুব লজ্জা, তাই ছাতের কোণে গিয়ে লুকিয়ে বসি। মাগো, মামণিগো, আমার যমুনা মাগো—'

আসলে মা-র পরামর্শ মত বন্ধুকেই লিখতে বসেছিলাম, কখন যে বন্ধু ভুলে মাকে এনে ফেলেছি কে জানে, আর এনে ফেলেই মা দূরে আছে ভেবে রীতিমত কান্না এসে যেতে লাগল।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই খেলাতেই আমার সবচেয়ে বেশি নেশা লেগে গিয়েছিল। কেননা কিছুদিনের মধ্যেই চিঠি লেখা ছেড়ে আমি গদ্য পদ্য লিখতে শুরু করেছিলাম। বিশ্রী বিশ্রী গল্প কবিতা লিখে খাতার পর খাতা ভরে ফেলছিলাম। অবশ্য গোপনে। সম্ভবত এই বদরোগের দরুনই, স্কুলের জীবনটা আমার কাছে সহনীয় ছিল না। সারাটা দুপুর মনে হত একটা কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছি। তাছাড়া স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ভাবও ছিল না তেমন। পড়াশুনোয়ও একদম ভাল ছিলাম না। সারাদিন গল্প উপন্যাস পড়ার নেশা আর লেখার নেশা আমাকে পাঠ্যপুস্তকের গন্ডি থেকে সব সময়ে বাইরে রেখে দিত। স্কুল খারাপ লাগুক আর ভাল লাগুক, ছাড়বার প্রশ্ন হয়তো কখনোই উঠত না, যদি না আমাদের বাংলা শিক্ষয়িত্রী সুধাদি আমাদের একটি ভ্রমণ বিষয়ে রচনা লিখতে দিতেন। এ কাজটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। মনোযোগ দিয়ে স্কুলের কোন কাজ সেই বোধহয় প্রথম। অন্য সকলের খাতার মত আমার লেখাটাও সুধাদি ভুরু কুঁচকে পাঠ করেছিলেন, তারপর খাতাটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'কাকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছ শুনি? নয়তো ঠিক করে বল কোন বই থেকে টুকেছ?'

আমি আকর্ণ লাল হয়ে ক্রন্দন্-বিজড়িত গলায় বলেছিলাম, 'আমি নিজে লিখেছি।'

সুধাদি দাঁতে দাঁত ঘষটে বললেন, 'ওরে আমার বঙ্কিম চাটুজ্যের নাতনি রে! তিনি নিজে লিখেছেন এই লেখা! আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে থাকো সারা পিরিয়ড।'

থাকলাম। স্কুলে তারপরের সময়গুলো যে কী ভাবে আমার কেটে ছিল সে শুধু

আমিই জানি। বাড়ি এসেই কান্নায় ভেঙে পড়লাম মায়ের কোলের মধ্যে। সব শুনে মা গরম হয়ে গেলেন, স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর ঈষৎ লাল চোখ আরো লাল হল। আর বাবা আপিস থেকে এলেই ঠিক হয়ে গেল এই অভদ্র অসভ্য মাস্টারনীদের স্কুলে আর পাঠানো চলবে না। বোধহয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আমি তখন। আর সেই সময়েই কোন একটা প্রদর্শনীর সূত্রে যোগাযোগ হয়ে গেল ঢাকার বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী বেলা নাগের সঙ্গে। কী কারণে জানি না আমাকে তিনি সুনজরে দেখলেন, আগ্রহের সঙ্গে দলভুক্ত করে নিলেন। এবং এই লেখার অভ্যাসই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাকে সকলের চেয়ে কিছু বেশি প্রতিষ্ঠা দিল।

সে সময়ে ঢাকা শহরে কিশোর, কিশোরী, তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী প্রায় সকলেরই এ বিষয়ে কিছুটা অবদান ছিল। কিন্তু যেহেতু আমার স্কুল নেই, ধরাবাঁধা কিছু করবার নেই, আমি সহজেই বেলাদির ডান হাত বাঁ হাত হয়ে উঠেছিলুম। সব কাজেই তিনি আমাকে সহযোগী করতেন। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়েরা খুব ছোট বলে গণ্য হত না। অন্তত আমার যদ্দূর মনে পড়ে। আমি নিজে নিজেকে ছোট জানতুম না। মাথায়ও লম্বা হয়ে গিয়েছিলুম অনেকটা, তাছাড়া বেলাদির সংস্পর্শে এসে দলের অনেক বেশি বয়সের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে মনটা সহজেই পরিণত হয়ে উঠেছিল।

রাজনীতি ব্যাপারটা বড উত্তেজক। তার উপরে সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদীরা ইংরেজ-বিতাড়নের জন্য নিজেদের এমন ভাবে উৎসর্গ করেছিল দেশমাতৃকার (তাদের ভাষায়) কাছে, যেটা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কেই অত্যন্ত জোরে নাড়া দিয়েছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সব ব্যাপারের সঙ্গে যতটা গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলুম ততটা সকলে ছিল না। প্রয়োজনমত চাঁদা তোলা, মিছিল করা, সভা করা, গান গেয়ে বেড়ানো এসব নিয়েই মগ্ন। বিশেষভাবে অর্জুন দত্তের ফাঁসি হবে শুনে তো আহার-নিদ্রাও আমার ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল। সহসা মা বাবা অনুভব করলেন তার ফলে আমার লেখাপড়ায় এমন ভাটা পড়েছে যে এক্ষুনি তা নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক না হলে পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

বস্তুত আমি নিজেও সেটা উপলব্ধি করেছিলাম। কিছুদিন থেকে আমিও সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। ষোলো বছর বয়সে একদিন নিজেই মনস্থির করে মা বাবাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ভেবো না, এ বছর পরীক্ষার পড়া ছাড়া আর আমি অন্য কিছুই করব না।' মা বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'তাহলে একজন ভাল মাস্টার ঠিক করতে হয়। তোকে তো প্রাইভেটেই দিতে হবে।'

সুরেশ্বর সেন নামে এক মাস্টারশাই ছিলেন ঢাকা শহরে, যিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পড়াবার জন্যই বিখ্যাত। আমরা থাকতাম ওয়াড়ি পাড়ার হেয়ার স্ট্রিটে, তিনি থাকতেন র‍্যাংকিন স্ট্রিটে। ঘুরে গেলে পথ একটু বেশি হয়, কিন্তু ভিতর দিকে খিড়কির দরজা দিয়ে একটা জলপাইবন পেরিয়ে এলেই মাস্টারমশায়ের দরজায় পৌঁছে যাওয়া যেত। তিনি কারো বাড়ি এসে পড়াতেন না। সকালের দিকে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত নিজের বাড়ির একতলাতেই একটা স্কুলের মত করেছিলেন সেখানে অবিশ্যি প্রাইভেট অপ্রাইভেট বহু ছেলেই পড়তে আসত। কিন্তু মেয়ে ছিল না কেউ।

প্রতিবেশী হিসেবে আলাপ ছিল বাবার সঙ্গে, তাছাড়া আমি এঁকে বেলাদির ওখানেও

অনেকবার দেখেছি। অনুরোধ জানিয়ে তাঁকেই ঠিক করা হল। তিনি আমাকে আর টুকুকে দুপুরে নিলেন।

টুকু আমার বন্ধু, প্রায় মুখোমুখি বাড়িতে বাস করি এবং দুজনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম মনে মনে। এই মাস্টারমশায়কে পেয়ে দুজনেই মহাখুশি। মাস্টারমশায়েরও আমরা দু'জন ছাড়া অন্য.কোন ছাত্রী না থাকায় খুব যত্ন নিতে পারতেন।

উনি সত্যি খুব সুন্দর পড়াতেন। একটুও পড়া পড়া লাগত না। এমন যে বিদঘুটে অঙ্ক আর ভূগোল তা পর্যন্ত ওঁর কাছে পড়ে সহজ হয়ে এল। আসলে মাস্টারমশায়ের বয়েস অল্প ছিল, দেখতে সুন্দর ছিলেন, একটুও বকতেন না—এই সব নানা কারণে আমরা ওঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম। মাসখানেক বেশ চলছিল হঠাৎ কোথা থেকে যে ওঁর এক দাদা এসে হাজির হলেন কে জানে। আমরা একতলার একটা কোণের ছোট ঘরে বসে পড়তুম। জানতুম না তার পাশে আরো একটা ছোট ঘর আছে যেখানে মাস্টারমশায়দের অতিথি-অভ্যাগত এলে থাকে। মাঝখানে দরজা ছিল একটা। গিয়ে থেকে আমরা সেটা তালা-বন্ধই দেখেছি বরাবর। হঠাৎ সেদিন ভেজানো দেখে টুকু বলল, 'ঘরের মধ্যে কে যেন নড়ছে চড়ছে, ভূত নাকি রে?'

ভূতের ভ শুনলেও আমি আঁতকে উঠি—সে দিনেই হোক আর রাতেই হোক। আর এমনিতেই মাস্টারমশায়ের বাড়িটা যা ভুতুড়ে-ভূতুড়ে। চেয়ার-বেঞ্চি-পাতা একা একা একতলাটা শাঁ-শাঁ করে দুপুরে—পাশেই ভাঙা দেয়ালের ব্যবধানে আধো-অন্ধকার মস্ত জলপাইবনের ছায়া-ছায়া নিয়ে যেন গিলে খেতে আসে। মাস্টারমশায়ের সব ভাল কিন্তু ভারি একটা দোষ ছিল। আমাদের যেতে বলেন কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় অথচ নিজে নামেন বেশ দেরি করে। এ নিয়ে নালিশ চলে না। মাস্টারমশায়কে কিছু বলা যায় নাকি? অবশ্য ঐ দেরিটুকুর জন্য আমাদের কিছু এসে যেতো না, দু'জন আছি, গল্পের অভাব কী?

কিন্তু ঐ ভেজানো দরজাটিই আমাদের সর্বনাশের কারণ হল। টুকুর কথামত সেই দরজায় দৃষ্টি মেলে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। দেখলাম ভেজানো দরজা আধ-ভেজানো হয়েছে, এবং তার ফাঁকে একজোড়া অনিমেষ চোখ সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। টুকু অত ভিতু নয়, সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'একটা লোক।' বলতে বলতেই মাস্টারমশায়ের চটির শব্দ পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটি। ভিতর থেকে খুট করে ছিটকিনি বন্ধ করার আওয়াজটিও পাওয়া গেল। টুকু ফিসফিস করল, 'নিশ্চয় চোর।'

আমি সাদা ঠোঁট নিয়ে নিঃশব্দ রইলাম।

মাস্টারমশায় এসেই আমাদের হোম-টাস্ক দেখতে লেগে গেলেন, তারপর পড়া। টুকু এমন একটু ফাঁক পাচ্ছিল না যে চোরের কথাটা বলতে পারে। কোন এক সময় আমিই কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'মাস্টারমশায়, ঐ ঘরটার মধ্যে কে যেন একজন—'

মাস্টারমশায় হেসে বললেন, 'আমার একজন দাদা।'

'আপনার দাদা?' এটা টুকু বলল। মাস্টারমশায় বললেন, 'কাল রাত্রে নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছেন। থাকবেন কদিন। তোমাদের অসুবিধে হয়েছে নাকি কিছু?'

'না, না—' আমরা বিনয়ে আনত হলুম।

পরের দিন দুপুরেও কিন্তু ঐ একই দৃশ্য। তেমনি ভেজানো দরজা, মানুষের সাড়া পেয়ে আধোভেজানো হওয়া, এবং তেমনি এক জোড়া অনিমেষ চোখ। আর মাস্টারমশায়ের

ভাই জেনেও আমার বুকের মধ্যে তেমনি শীতল ভয়। টুকু বলল, 'উঁকি মেরে কী দ্যাখে রে দাদাটা?'

আমি, থুতু দিয়ে কেবল ঠোঁট ভেজাচ্ছিলাম। জবাব দিলাম না।

পরের দিনও ঠিক তাই। কিন্তু তারপরের দিন দরজাটি প্রায় পুরো খুলে গেল। এবং মাস্টারমশায়ের বয়সী এক ভদ্রলোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেঞ্জি গায়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোমরা বুঝি সুরেশের ছাত্রী?'

টুকু বলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোকটি চকিতভাবে বারে বারে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছিলেন, মাস্টারমশায় এসে পড়ছেন কি না। একটু পরে বললেন, 'তোমাদের নাম কী?'

টুকু বলল, 'আমার নাম সুজাতা রায় আর ওর নাম রাধারাণী মিত্র।'

'রাধারাণী মিত্র? রাধারাণী মিত্র?' ছোট-ছোট চোখ করে কী যে তিনি ভাবতে লাগলেন কে জানে। এর মধ্যেই মাস্টারমশায়ের পদধ্বনি এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দাদার পলায়ন।

পলায়ন মানে সত্যিই পলায়ন। কেমন ভাবে যে নিজেকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তা দেখবার মত। আমি আর টুকু এই দৃশ্য দেখে হতবাক।

মাস্টারমশায় এসেই—তেমনি হোম-টাস্কের খাতা দেখলেন, হাসিমুখে পড়ালেন, আমাকে প্রতিদিনের মতই 'আমাদের লেখিকা কি বলে এ বিষয়ে?' বলে ঠাট্টা করলেন। তখন মাঝে-মাঝে দু' চারটে পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হত বলেই সেই পরিহাস। তারপর শেষ হল ক্লাস। উনিও উঠলেন, আমরাও উঠলাম।'

জলপাইবাগান পার হতে-হতে আমি আর টুকু মাস্টারমশায়ের দাদাকে নিয়েই কথা বলতে বলতে আসছিলাম। দু'জনেই কেমন যেন ভয়-ভয় পাচ্ছিলাম।

আবার পরের দিন। সেদিন আমরা একটু দেরি করে যাওয়াতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই মাস্টারমশায় এসে গেলেন। কিন্তু তার পরের দিন তো আছে? তারও তো পরে আছে? মাস্টারমশায়ের দাদা একেবারে ওৎ পেতে থাকেন বলা যায়। যাওয়া মাত্রই দরজা জুড়ে দাঁড়াবেন গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আর যত সব আজে-বাজে কথা। যেমন, 'রাধা, তুমি কোনদিন বিয়ে করবে?'

আমি ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতাম শুনিনি ভাব দেখিয়ে। টুকু বলত, 'কেন করবে না? নির্ঘাৎ করবে।'

উনি আবার বলতেন, 'রাধারাণী, তুমি কী ভালোবাসো?'

টুকু মুখরা। ও বলত, 'রাধা চুপ করে থাকতে ভালবাসে।'

উনি তবু কথা ছাড়তেন না। বলতেন, 'রাধে, তোমায় বয়স কত?'

একবার রাধা, একবার রাধারাণী একবার রাধে—আমার যে কী বিশ্রী লাগত বলতে পারি না। টুকুকে বলতাম সে কথা। টুকু বলত, 'হ্যাঁ রে, লোকটা যেন কেমন। আর দেখছিস কী রকম অদ্ভুত, কেবল তোর সঙ্গেই কথা বলে, আমার সঙ্গে বলে না।'

আমি বললাম, 'আয় আমরা মাস্টারমশায়কে বলে দিই।'

কিন্তু সত্যি বলতে, কী বলা যায়? কী নালিশ আছে ওঁর বিরুদ্ধে? একটু দরজা ফাঁক করে দাঁড়ান আর দুটো-একটা কথা বলেন এই তো ব্যাপার। সুতরাং এই ভাবেই চলতে লাগল দিন।

হঠাৎ এর মধ্যেই বেনামীতে আমার নামে একটি মূল্যবান উপহারের পার্সেল এল।

সই করে রাখা হল বটে কিন্তু বাড়ির সবাই ভাবতে বসে গেল কে পাঠাতে পারে। আমিও ভেবে পেলাম না আমার এমন কোন বড়লোক ভালবাসার জন আছে, যে আমাকে এত দামী একটা ওমেগা ঘড়ি পাঠিয়ে বাধিত করবে ? কিন্তু সেই সন্ধ্যায় মাস্টারমশায়ের এগারো-বারো বছরের ভাই দোনা এল। তার সঙ্গে এই এক দেড় মাসে আমাদের বেশ ভাব হয়েছে, প্রায়ই আসে। এসেই আমার পড়ার ঘরের টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বললাম, 'কী রে, সন্ধ্যাবেলা পড়াশুনো ফেলে চলে এসেছিস যে ?'

দোনা হাসল দাঁত বার করে তারপর বলল, 'তোমার রিস্টওয়াচ পেয়েছ রাধাদি ?'

'রিস্টওয়াচ !' বুকটা ধ্বক করে উঠল আমার, আমি তক্ষুনি বুঝতে পারলাম দোনা কার চর হয়ে খবর নিতে এসেছে। কিছু জবাব না দিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, 'বাড়ি যা, আমি পড়ছি।'

দোনা তবু যায় না, এটা নাড়ে ওটা নাড়ে। আমি তখন ওর হাত ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, 'আবার যদি ফের কারো হয়ে এখানে ওকালতি করতে আসবি, এমন এক চড় কষাব—'

পরের দিন মাস্টারমশায়ের কাছে পড়তে যেতে আর আমার ইচ্ছে করছিল না। টুকুর পীড়াপীড়িতে তবু যেতে হল। আর সেদিন গিয়েই আশ্বস্ত হয়ে দেখলাম মাস্টারমশায়ের দাদার দরজাটি আবার আগের মতো তালা ঝুলিয়ে বন্ধ করা।

টুকু সংবাদ দিল নারায়ণগঞ্জ থেকে দাদার বৌ এসে দাদাকে প্রায় ঝাঁটাপেটা করে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। বৌ-ও যে-সে বৌ নয়, একেবারে অনশন করা বৌ।

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'দাদার মা নাকি ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্যে অনশন করেছিলেন। বলেছিলেন, যতক্ষণ না তুই সম্মতি দিবি আমি জলস্পর্শ করব না। এবং সত্যি সত্যি সাতদিন না খেয়ে ছিলেন।'

হেসে ফেলে বললাম, 'বাব্বা !'

টুকুও হাসল, বলল, 'তারপরে এক খাণ্ডারণী বৌ ধরে এনেছে। বিয়ে করেছে মাত্র দুবছর।'

'একেবারে নববিবাহিত বুড়ো কার্তিক।'

'তবু টিট হচ্ছে কই ? ভদ্রলোকটা নাকি মাঝে মাঝেই এরকম না বলে-কয়ে বৌ ছেড়ে কোথায়, কোথায় চলে যায়, বৌ-ও তেমনি, ঠিক খুঁজে বার করে নিয়ে যায় এসে।'

'বৌটাকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এতো খবর তুই পেলি কোথায় ?'

'দোনা বলল।'

'দোনা ? দোনা কখন গিয়েছিল ?'

'কেন ? তোর এখান থেকেই তো গেল। তুই নাকি ওকে চড় মেরেছিস ?'

'মারিনি। মারতে চেয়েছিলাম।'

'কী করেছিল ?'

'বিচ্ছিরি পাকা ছেলেটা। আমার ভাল্লাগে না।'

'ঐ দাদাটা নাকি তোকে একটা হাজার টাকা দামের ঘড়ি দিয়েছে ?'

আমি সারা শরীর চমকে উঠে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম। আমার চোখ মুখ কান সব গরম রক্তে টগবগ করছিল।

হঠাৎ টুকু ফিসফিস করে উঠল, 'রাধা!'

'কী রে?' বলেই তাকিয়ে একেবারে হিম। সেই রকম একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে বাইরের দরজায় মাস্টারমশায়ের বদলে মাস্টারমশায়ের দাদা দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম। তিনি অন্যদিনের চেয়ে সাহসী ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু নিজের ঘরের তালা না খুলে মাস্টারমশায়ের চেয়ারে বসলেন। দুলে দুলে বললেন, 'আজ সুরেশ বাড়ি নেই, আজ আমি আছি।'

'আপনি আছেন?' টুকুর মুখ থেকে খসে পড়ল শব্দ দুটি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চল, আমরা চলে যাই।'

'যাবে? কেন যাবে? আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, যাওয়া তোমাদের এক্ষুনি হবে না।'

মাস্টারমশায়ের বাড়িটি পুরনো ধরনের, বার্মাসেগুনের বিশাল উঁচু উঁচু দরজা, আবার ছিটকিনিগুলো বেঁটে বেঁটে। নিতান্ত লম্বা লোক না হলে অতদূর পর্যন্ত হাত পাওয়া শক্ত। দাদাটা গিয়ে সত্যি-সত্যি সেই ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিলে। ভয়ে নীল হয়ে আমরা দুটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে কী যে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মাস্টারমশায়ের দাদা বেশ ঘেমে-টেমে এসেছিলেন, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আবার চেয়ারে এসে বসে দুলতে লাগলেন।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে টুকু বলল, 'দরজা খুলে দিন, আমরা যাব।'

'কেন যাবে, সুজাতা? আমি কি সুরেশের চেয়ে কম বিদ্বান যে একটা দিন তোমাদের পড়াতে পারব না? রাধে, তুমি কী বল?'

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'আপনার কাছে আমরা পড়ব না।'

'পড়বে না?'

'না।'

'তবে গল্প করো।'

'না।'

'গল্পও করবে না? কিন্তু আগে তুমি আমাকে খুব ভালবাসতে।' এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে কাছে চলে এলেন। আমার চুল খুব লম্বা ছিল, একটা বেণী বেঁধে রাখতাম সব সময়, সেই বেণীটা নাড়াচাড়া করতে-করতে 'আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকার' কবিতাটি আবৃত্তি শুরু করলেন।

আমি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালাম, চোখ লাল করে বললাম, 'আপনি যদি ফের আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করেন, আমরা মাস্টারমশায়কে বলে দেব।'

টুকুও দুর্জয় সাহসে তেরিয়া হয়ে বলল, 'ভাবছেন আমাদের গায়ে জোর নেই, যা খুশি তা-ই করলেই হল? আমরা দুজনে মিলে এক ঠ্যালায় আপনাকে মেঝেতে ফেলে দেব।'

ভদ্রলোক ভীষণভাবে হেসে উঠলেন, আমাদের কথা শুনে, মিষ্টি করে বললেন, 'বালিকাগণ, তাহলে এসো, এই খেলাটাই খেলা যাক। তোমরা আমাকে ঠেলবে আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এক ধরনের 'টাগ অব ওয়ার' কী বল?' এই বলে আমার বেণী ছেড়ে শার্ট খুলতে লাগলেন। আর সেই সুযোগে টুকু একটা বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে ছিটকিনি খুলতে চেষ্টা করল।

তাকিয়ে দেখে তাতেও উনি হাসলেন। এগিয়ে গিয়ে নিজেই খুলে দিয়ে বললেন, 'আজকের মত আমার খেলা এখানেই শেষ। আবার কাল, কী বল?'

আমরা আবার বলব কী ? দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচি। পথে আসতে-আসতে আমি আর টুকু দুজনেই ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে মা বাবাকে সব বলব। কিন্তু কী যে বলব সেটাই পরামর্শ করে স্থির করতে পারছিলাম না।

কী আশ্চর্য! সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দেখি মাস্টারমশায় তাঁর দাদাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন, 'শিবপদ দত্ত, আমার দাদা হন, কয়েক দিনের জন্য এসেছিলেন, কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে খুব আলাপ করবার ইচ্ছে ওঁর, তাই নিয়ে এলাম।' বাবা ব্যস্ত হয়ে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। আমাকেও ডেকে আনলেন বাইরের ঘরে। আমার বুক থরথর করে কাঁপছিল। অথচ সেই দাদা ভদ্রলোকটি সেদিন এমন সুন্দর সহজ এবং মধুর ব্যবহার করলেন যে আমি এই মানুষকে ভয় পাই ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। নিঃশঙ্ক চোখে তাকিয়ে এই প্রথম দেখলাম ভদ্রলোকটি লালচে-লালচে চুল আর রং নিয়ে শুধুই যে একজন সুন্দর মানুষ তা-ই নয়, ঘরে আর সকলের চাইতে তাকে আমার বিশেষ মানুষ বলেও মনে হচ্ছিল। নানা ধরনের গল্প করছিলেন, ভাল লাগছিল শুনতে। উঠলেন অনেকক্ষণ বাদে। যেতে-যেতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত রাখলেন, 'রাধা, একটা সারপ্রাইজ দিয়েছিলুম তোমাকে। ওমেগা ঘড়িটি আমি কী ভাবে পেয়েছিলুম জান ? লটারিতে। দেবার যোগ্য মেয়ে পাইনি এতদিন। ব্যবহার করছ তো ?'

অভ্যাসবশত একটা অমূলক ভয়ে আমি আবার কেঁপে উঠছিলাম প্রায়, কিন্তু সেই হাতে বা সেই কণ্ঠস্বরে স্নেহ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বাবা বললেন, 'অত দামী ঘড়িটা ওকে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি। আমরা তো প্রথম বেনামীতে ঘড়িটি দেখে ভেবেই পাই না কী ব্যাপার। শেষে শুনলাম—'

'কোন ঘড়িটা দাদা ?' মাস্টারমশায় এখানে একটু বিস্ময়ের চোখে তাকালেন। দাদা বললেন, 'তুমি জান না, বাড়ি গিয়ে বলব সব।'

চলে গেলেন ওঁরা। আর যাবার সঙ্গে-সঙ্গে মা বাবার কী প্রশংসা। সত্যি বলতে আমার নিজেকে তখন একটু বেশি বেশি সন্দেহাকুল মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল। রাত্তিরে বেশ ভাল ঘুম হল এবং পরের দিন পড়তে যেতে একটুও ভয় করল না। আর টুকুও সব শুনে খুশি হল। তাছাড়া লোকটা তো সকালেই চলে যাচ্ছে। ভয়ের প্রশ্নই বা কী ?

হায় হতভাগ্য, সাড়া পেয়ে দাদাটির তেমনি গেঞ্জি গায়ে আবির্ভাব এবং চোখের দৃষ্টিতে চিরতুষারের শীতল ভয়। কে বলবে এই মানুষই সেই মানুষ, যিনি কাল রাত্রিবেলা আমাদের বাড়ি গিয়ে অমন মন মাতিয়ে এসেছেন সকলের, আমার সুদ্ধ।

কেমন একরকম হেসে বললেন, 'বালিকাগণ, এসেছ ?'

আমরা বই হাতে নিয়ে চুপ।

'আজও তোমরা আমার হাতে বন্দী, সুরেশ আজও বাড়ি নেই।'

আমরা গুটি-গুটি পা বাড়ালুম।

'উঁহু, ওটি হচ্ছে না। ভাল সঙ্গীদের আমি অত সহজে ছেড়ে দিই না। বল, আজ আমাদের কোন খেলাটা ভাল জমবে। কানামাছি ? না, আবার সেই টাগ অব ওয়ার ? না না, কানামাছিই ভাল। আমার চোখ বেঁধে দাও, রাধা, আমি ঠিক চিনে নিয়ে তোমাকে জাপটে ধরব।'

আমরা প্রায় ছুটে এগুচ্ছিলাম দরজার দিকে, উনি আমাদের পথ বন্ধ করতে এসে

প্রায় ছিটকিনির দিকে হাত তুলেছিলেন। ইতিমধ্যেই বজ্রপতন হল। ফিতে বাঁধা জুতোর মশমশ শব্দ করে মাস্টারমশায় এসে ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষের মত দাঁড়ালেন আমাদের সামনে।

'এ কী! কী ব্যাপার?'

প্রথমটায় মাস্টারমশায়ের দাদা কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, পরমুহূর্তেই প্রশান্ত হাস্যে সহজ গলায় বললেন, 'তোমার ছাত্রী দুটিকে বলছিলাম আজও তুমি পড়াবে না। চলে যাচ্ছিল ওরা।'

'আপনি কী করছিলেন? আপনি আবার ফিরে এলেন যে?'

'ভারি একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল স্টেশনে গিয়ে। সেটা সেরে এই তো ফিরলুম।'

মাস্টারমশায় অনেকক্ষণ তার দাদার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাদের বললেন, 'দোনা তোমাদের বলেনি যে আমি দু'দিন এ সময়টায় বাড়ি থাকব না? আমাকে একটা মামলার জুরি হয়ে কোর্টে যেতে হচ্ছে দুপুরে।'

টুকু বলল, 'না তো!'

'তোমরা কি কালও এসেছিলে?'

আমরা নিঃশব্দে মাথা নাড়লুম।

'তারপর?'

তারপর কী সে কথা না বলে আমরা চুপ করে থাকলুম। মাস্টারমশায়ও খানিকক্ষণ চুপ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, বাড়ি যাও। কাল এসো।'

চলে এলুম বাড়ি। বাড়ি এসে দেখি মা গালে হাত দিয়ে কী ভাবছেন, সামনে একখানা লাল টুকটুকে রংয়ের জুরির বুটিদার ঢাকাই শাড়ি। শাড়ি দেখে আমি সব মন খারাপ ভুলে লাফিয়ে উঠলাম। বই ফেলে ছুটে গিয়ে শাড়িটা বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'কার মা? নিশ্চয় আমার! কী সুন্দর! কে এনেছে?'

মা বললেন, 'তোরই এটা—কিন্তু ভদ্রলোক কেন এমন সব দামী দামী জিনিস পাঠাচ্ছেন তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'ভদ্রলোক! কে!' আমার ভিতরকার কুণ্ডলী পাকানো ভয় আবার জেগে উঠল।

মা বললেন, 'তোর মাস্টারমশায়ের দাদা। দোনা এসে দিয়ে গেল। কোথায় অর্ডার দিয়ে করিয়েছেন। আমি কত বারণ করলাম, দোনাটা শুনল না।'

শাড়িটা আমি তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। উঁচু গলায় বললাম, 'দুই থাপ্পড়ে ওর গালটা ফাটিয়ে দিতে পারলে না? বদ ছেলে, অসভ্য ছেলে, দোনাটা চোর, দোনাটা ঘুষ নেয়—'

'কী বলছিস তুই পাগলের মত? মাথা খারাপের মত করছিস কেন? ঐটুকু ছেলে ঘুষ নেয় কী কথা?'

'হ্যাঁ, নেয়। ঐ দাদাটার কাছ থেকে নেয়। ওর পকেটে আমি সব সময় টাকা দেখি। সেদিন বলছিল, চাইলে ও নাকি পাঁচটাকা দশটাকা ধার দিতে পারে। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তা হলে তো তুই মস্ত বড়লোক।' বলে, 'এখন আমি রোজ ক্যাডবেরির চকোলেট খাই, স্কুলের ফিরতি পথে বড় বড় রাজভোগ খাই, বড়দা আমাকে কত টাকা দেয়।' বললাম, 'কেন?' বলে, 'আমি যে সব কথা শুনি। যা বলে দেন চুপি চুপি তাই করি, কাউকে কিচ্ছু বলি না—'

মা বললেন, 'তা বেশ তো! আদরের জনকে ওরকম দিয়েই থাকে মানুষ। তাছাড়া

এই ভদ্রলোক শুনেছি মাস্টারমশায়ের আসলে কিছুই হন না, মাস্টারমশায় দাদা ডাকেন এইমাত্র। উঠেছেন এসে, এভাবেই কিছু ভদ্রতা করেন।'

'না, না, না,' আমি মাথা ঝাঁকড়ে হাত-পা ছুঁড়ে দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে হিস্টিরিক হয়ে উঠলাম, 'তুমি ওসব বুঝবে না। দোনাটাকে উনি নষ্ট করে ফেলছেন, উনি মাস্টারমশায়ের ক্ষতি করছেন, আমাদের ক্ষতি করছেন।'

শাড়িটা দু'পায়ে মাড়িয়ে দিলুম আমি, ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলুম। মা একেবারে থ।

অবশ্য খানিক বাদে এ-রকম করার জন্যে খারাপ লাগছিল। চায়ের টেবিলে বসে মাকে আমি আমার মনের কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাষাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্রথমে বললাম, 'ভদ্রলোকটা ভীষণ বিশ্রী।' তারপরে বললাম, 'আমাদের দেখলেই দরজা খুলে এগিয়ে আসেন আলাপ করতে।' তারপর বললাম, 'আবার বলে এসো কানামাছি খেলি।' থেমে থেমে বললাম, 'আর চোখ দুটো কী ভীষণ, দেখলে ভয় করে—'

আরো হয়তো কিছু বলেছিলাম, কিন্তু মা-র মুখের ভাব দেখে মনে হল না আমার এসব কথায় উনি কণামাত্রও বিচলিত হয়েছেন। চা ঢালা শেষ করে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজকের কাগজ দেখেছি—জয়দীপ, সুশান্ত আর হেমনলিনী ধরা পড়েছে। এখন আবার এই তিনজনকে নিয়ে কী করবে কে জানে। এরাও তো সবাই সেই একই মামলার আসামী। হয়তো এদেরও ফাঁসির হুকুম দিয়ে দেবে। এখন তো একেবারে খ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠেছে ইংরেজ প্রভুরা।'

কোণের দিক থেকে দাদা বলল, 'আসল মাথাটা ছাড়া পেয়েছে, যতই ধরুক যাই করুক, গোপন ষড়যন্ত্র তেমনিই চলতে থাকবে। আর রক্ষে নেই এদের।'

মা বললেন, 'অর্জুন দত্তর কথা বলছিস তো ? তার তো আর পাত্তাই নেই দেখছি। ছাড়া পেয়েছে তো বছর দুই হল।'

'আরে ওসব লোক কি আর জানিয়ে কিছু করে ? সব আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে।'

এদের কথাবার্তা সব অন্য খাতে বইছিল। আমি বলতে গেলে রাগ করেই উঠে চলে গেলাম টেবিল থেকে। শেষে রাত্তিরে শুয়ে নিরুপায়ভাবে ভগবানের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করলাম ঐ দাদাটা মরে যাক, এবং কালই মরে যাক।

পরের দিন পড়তে যেতে যেতে টুকু বলল, 'কী হয়েছে জানিস ?'

'কী রে ?'

'বাবা কাল মাস্টারমশায়কে মাইনেটা দিতে গিয়েছিলেন, দেখেন ভীষণ চিৎকার চ্যাঁচামেচি হচ্ছে দোতলার বারান্দায়। সব ঐ দাদাকে নিয়ে। দাদাটা নাকি রোজ যাচ্ছি বলে বিদায় নিয়ে চলে যান, আবার ঠিক ফিরে আসেন দুপুরে। যেদিন বৌয়ের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, সেদিনও ঠিক তাই করেছিলেন। বৌকে ট্রেনে বসিয়ে, আসছি বলে নেমে গেছেন। বৌ আবার কাল এসেছিল, তখনি ঝগড়াটা হচ্ছিল। বাবা আর দোতলায় না উঠে একতলা থেকেই সব শুনতে শুনতে ফিরে এসেছেন। বললেন, ঐ ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে গিয়ে পড়ায় বড় লজ্জা করল।'

সব শুনে আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আজ আর তাহলে লোকটা কিছুতেই নেই, মাস্টারমশায় ঠিক তাড়িয়ে দিয়েছেন। আর বৌ-ও এবার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে।'

টুকু বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

আমরা জলপাইবাগান পার হয়ে মাস্টারমশায়ের কম্পাউন্ডে ঢুকলাম। বেলা দুটোর

রোদ কেঁপে কেঁপে বেড়াচ্ছিল চারদিকে, ফড়িং উড়ছিল অনেক। আমাদের গরম লাগছিল খুব। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে প্রথমেই মাস্টারমশায়ের দাদার দরজার দিকে তাকালাম। আনন্দে আটখানা হয়ে দেখলাম যদিও দরজাটি সাপটে খোলা তবুও দাদাটা নেই। শূন্য ঘর হা-হা করছে। টুকু তবু একটু ফিসফিস করল। বলল, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই। হয়তো দেখবি এখুনি সামনের দরজা দিয়ে এসে হাজির হয়েছে।'

'তাহলে?' আমি আবার কাতর।

টুকু বলল, 'ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিই আয়।'

'বাঃ, মাস্টারমশায় আসবেন না?'

'সিঁড়ি দিয়ে নামবেন, চটির শব্দ পাব, তখুনি আস্তে করে খুলে দেব।'

'তাই ভাল।'

মাস্টারমশায়ের চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে টুকুই লাগিয়ে দিল ছিটকিনিটা, চেয়ারটা ওখানেই রেখে দিল, যাতে জুতোর শব্দ পাওয়া মাত্রই উঠে খুলে দিতে পারে। কিন্তু এই কাজটি করে আমাদের মনে একটা ভয়ের উদয় হল। কে জানে ঐ শূন্য ঘর থেকেই হয়তো মাস্টারমশায়ের দাদা গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এসে সেই ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে হেসে বলবেন, 'বালিকাগণ, এসেছ?' ভেবে দু'জনেই আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু না, ঘর সত্যি শূন্য। তা নইলে এতক্ষণ দেরি হত না আবির্ভূত হতে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ঘরটায় উঁকি মারলাম আমরা। না, নেই। কেউ নেই। টুকু স্ফূর্তিতে গান গেয়ে উঠল, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে এক পাক নেচেও নিয়েছিল টুকু, আমিও কোরাসে যোগ দিয়ে ঢুকেছিলাম ভিতরে, তারপরেই আমাদের ভয়ার্ত চিৎকারে ভরে গেল ঘরটা।

এখন যেমন পাখার আংটা ঝোলে, তখন কোণের দিকে শীতের শেষে বস্তাবন্দী করে লেপ তুলে রাখবার জন্যে আংটা ঝোলানো থাকত। দেখলাম, সেই আংটায় মাস্টারমশায়ের দাদা ঝুলে আছেন লম্বা হয়ে, পুরো জিবটা কাৎ হয়ে আছে একপাশে, গালের দুই কষ বেয়ে রক্তের ধারা, পায়ের তলায় বাঁকা ভাবে পড়ে আছে একটা টুল।

আমরা জড়াজড়ি করে হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম সেই ঘর থেকে। ছিটকিনি খুলে বারান্দায় আসতেই মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। মাস্টারমশায় অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী! কী হয়েছে? ছুটছ কেন?'

'আপনার দাদা—আপনার দাদা—' টুকুর গলা আটকে গেল। আমি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে নিজেকে পতন থেকে বাঁচালাম।

আতঙ্কিত গলায় মাস্টারমশায় বললেন, 'আমার দাদা—কী? তিনি তো নেই এখানে। আমি তো নিজে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি।'

আমাদের আর কথা বলবার মত শক্তি ছিল না। সাঙ্ঘাতিক ভয়ে আমাদের যে কেমন দেখাচ্ছিল জানি না। মাস্টারমশায় আমাদের দাঁড়াতে বলে নিজে ঘরে ঢুকলেন। আমরা খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম ভুরু কুঁচকে তিনি আমাদের মতই প্রথমে শূন্য ঘর দেখলেন, তারপর কোণের দিকে তাকিয়েই প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, কিন্তু তক্ষুনি দাঁতে দাঁত আটকে চোয়াল চেপে নিজেকে সংযত করলেন। দরজাটা আস্তে বন্ধ করে শিকল টেনে দিলেন। তারপর বাইরে এসে বললেন, 'আগে তোমাদের বাড়ি দিয়ে আসি চল। তারপর যা করার করা যাবে।'

আমার আর টুকুর বাড়ি মুখোমুখি। টুকু আগে ঢুকে গেল, দু' পা এগিয়ে আমি একটু পরে।

মাস্টারমশায় দাঁড়ালেন, চোখের জল মুছলেন, থেমে থেমে বললেন, 'রাধা, অর্জুন দত্ত বলে কারো নাম মনে পড়ে তোমার ?'

কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'আমি একজন অর্জুন দত্তের নামই জানি--'

'যাঁর ফাঁসির মামলা রদ করতে আমরা না করতে পারতুম এমন কিছু নেই, যার জন্য তুমি ঝড়-জল রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সারাদিন চাঁদা তুলে বেড়িয়েছ বেলা নাগের সঙ্গে—' মাস্টারমশায় পাদপূরণ করলেন।

আমি বললাম, 'সেই টেররিস্ট, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের—'

'ঠিক তাই। দশহাজার টাকা তুলেছিলে তোমরা, একটা পদ্যও লিখেছিলে তুমি মনে আছে ?'

একটু লাল হলাম। পদ্যটা বড় বেশি আবেগ বিজড়িত ছিল। প্রায় প্রেমের মত। বেলাদি ঠাট্টাও করেছিলেন। সেই পদ্যটা পাঠ করা হয়েছিল আমাদের সবচেয়ে বড় মিটিংটায়। আমি চুপ করে রইলাম।

ভাঙা-ভাঙা গলায় মাস্টারমশায় বললেন, 'ইনিই তিনি !'

'ইনিই তিনি।'

'শিবপদ নাম ওঁর পিতৃদত্ত, অর্জুন দত্ত নাম ওঁর নিজের নেওয়া।' মাস্টারমশায় থামলেন, বোঝা যাচ্ছিল কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওঁর। বললেন, 'জেলে ছিলেন যখন, তোমার কবিতাটা আমি ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এটা নিয়ে অনেক পত্র-বিনিময় হয়েছিল, ঐ যুবক বয়সের কিঞ্চিৎ বোকামিও বলতে পার। সামান্য ঠাট্টা-তামাশা আর কি। হঠাৎ উনি তোমার একটা ছবি চেয়ে পাঠালেন। দিইনি। দেওয়ার প্রশ্নও ছিল না। বেলা নাগের দলে ছিলাম বটে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তখনো তো তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। ছাপার অক্ষরে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে তোমার দু'একটা কবিতা পড়ে নামটা জেনেছিলাম।' মাস্টারমশায় দম নিলেন, নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'জেলে থাকতে শাস্তি দিয়ে দিয়ে তো আর কিছু রাখেনি, অসুস্থ হয়েই ফিরেছিলেন, কিন্তু মানসিক ভাবেও যে সুস্থ নেই সেটা এবারই টের পাচ্ছিলাম। একটা অদ্ভুত অবসেশন হয়েছিল, বলতে গেলে সেদিন রাত্রে একরকম জোর করেই এলেন তোমাদের বাড়ি, আমি অনেক বারণ করেছিলাম, আর সত্যি বলতে আমার সেদিনই প্রথম মনে হয়েছিল ওঁর ব্যবহার, অন্তত তোমার সম্পর্কে, ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাক সে কথা, যা হবার তা হয়েই গেল। আমি চলি, এতক্ষণে কী হচ্ছে কে জানে।'

লম্বা শরীর নিয়ে একটু ঝুঁকে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন মাস্টারমশায়।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম দরজায়। দু'বছর আগে আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় এই দেশবরেণ্য বিখ্যাত বীর যুবকটিকে আমি কল্পনায় মাল্যদান করেছিলাম। আমার প্রথম যৌবন এই মানুষটির কাল্পনিক সংস্পর্শে ধন্য হয়ে আমাকে এক পবিত্র প্রেমের দিগন্তে নিয়ে গিয়েছিল। এঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি নিজের প্রাণ বিনিময় করেছিলাম। আর কাল আমি একান্ত মনে এঁরই মৃত্যুর জন্য—সহসা আমার চৌদ্দ বছর বয়সের কাঁচা টাটকা নিষ্পাপ বলিষ্ঠ হৃৎপিণ্ডটা আমার সমস্ত শরীর মন ভেঙেচুরে দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল আমার ষোল বছরের বুকটার মধ্যে। একটা ভীষণ যন্ত্রণার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত কান্নার স্রোত হয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাকে।

সত্যাসত্য

কোন এক ছুটিতে ছোট বোনের কাছে বেড়াতে এসেছিল নন্দিতা, আজ ফিরে যাচ্ছে। অবশ্য একেবারে নির্জলা ছুটি কাটাতেই যে এসেছিল তা নয় কোথাও বেড়ানো-টেড়ানোর অভ্যেস তার বরাবরই কম ছিল, বছর কয়েক যাবৎ তো একেবারেই নেই। বরং কিছুকাল নিজেকে এত বেশি ঘরকুনো করে রেখেছিল যে মা বাবা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এ অভ্যেস দূর করাতে। নিজেরাই শেষে বেরিয়ে পড়তেন মেয়েকে নিয়ে।

বন্দনা লিখেছিল তার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, টুকুনের কষ্ট হচ্ছে খুব। দিদি যদি এই ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য আসতে পারে অত্যন্ত উপকার হয়। বোনের সেই চিঠি পেয়েই এই বেড়ানো। বোন ভগ্নীপতির চেয়ে তাদের পাঁচবছর পুত্র টুকুনই নন্দিতার আসল আকর্ষণ। সেই টুকুনের যেখানে মায়ের অসুস্থতার জন্য অসুবিধে হচ্ছে সেখানে আর নন্দিতা বসে থাকে কেমন করে?

আজ চলে যাচ্ছে। ভগ্নীপতি তুলে দিতে এসেছে স্টেশনে। টুকুনও এসেছে। টুকুনের মা আসেনি, তার কোলের বাচ্চাটির বয়েস আট মাস। প্রায়ই দাঁত ওঠার কারণে পেটের অসুখে ভুগছে আজকাল, খুশিমত যখন তখন যেখানে সেখানে তাই যেতে পারে না বন্দনা। বলাই বাহুল্য, আজও সেই কারণেই সে আটকে পড়ে গিয়েছে।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেল, রঞ্জন বলল, 'উঠে পড় এবার।' নন্দিতা শেষবারের মত টুকুনকে চুমু খেয়ে চলে এল। খুব মন খারাপ লাগছিল, এই বাচ্চাটার প্রতি তার বিষম টান, বন্দনার চেয়েও বোধহয় বেশি। বলেও ছিল, তুই তো আজকাল ফুটকুনকে নিয়েই ব্যস্ত থাকিস সারাক্ষণ, দে, আমি ওকে কলকাতা নিয়ে যাই। বেশ ইচ্ছের সঙ্গেই চেয়েছিল। বন্দনা হেসে হেসে বলেছিল, নাও না, নিলে তো বেঁচে যাই। দিনকে দিন যা পাজী হচ্ছে না, অসম্ভব। বন্দনারটা কথার কথা।

স্টেশনে তুলে দিতে আরো একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন রঞ্জনের সঙ্গে, তিনি ওখানকার ডাক্তার। ডক্টর এম. কে. মজুমদার, এফ. আর. সি. এস। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, মাথায় সামান্য টাক, চেহারা সম্ভ্রান্ত, হালচালে কেতাদুরস্ত।

নন্দিতা ট্রেনে উঠলে তিনি এসে খুব হাত ঝাঁকালেন, 'আশা করি আবার শিগগিরই দেখা হবে।'

নন্দিতা সহাস্যে বলল, 'কলকাতা এলে আসবেন আমাদের বাড়ি।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—' পা-দানি থেকে লাফিয়ে নামলেন তিনি, হুইসিল বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

রঞ্জন খুব রুমাল নাড়ছিল, ভদ্রলোকও নাড়ছিলেন, হঠাৎ টুকুন 'মাসি' বলে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। গাড়ি চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে।

আসলে বন্দনা এই ডাক্তার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যই পরামর্শ করে

অসুখের ছুতো দিয়ে ডেকে এনেছিল নন্দিতাকে। বিবাহে অনিচ্ছুক দিদিকে বিবাহিত করার জন্য বন্দনা সবসময়েই ব্যস্ত। বিশেষত নিজের বিয়ের পরে আরও। এই ভদ্রলোকটিব সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি, এবং ইনিও অবিবাহিত শুনেই সে চনমনিয়ে উঠেছে, তক্ষুনি রঞ্জনকে বলেছে, 'দ্যাখ, এঁর সঙ্গে দিদিকে কিন্তু বেশ মানায়।'

বঞ্জন বলেছে, 'মন্দ কী।'

'মন্দ কী মানে? প্রায চ্যালেঞ্জের সুর ফুটিযে জোব গলায বন্দনা বলেছে, বল খুব ভাল।'

'কিন্তু তোমার দিদি কি রাজি হবে?'

'হওয়া উচিত।'

'উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন তো উঠছে না, যে ঘটনাটা ঘটে গেছে জীবনে—'

'বাজে—' তৎক্ষণাৎ উড়িযে দিযেছে বন্দনা--'মনে রাখবে বলেই মনে রেখেছে। কিন্তু প্রতিশোধটা কার উপরে নিচ্ছে শুনি? নিজেকে ছাডা আব কাকে শাস্তি দিচ্ছে?'

'সেটা অবশ্য সত্য কথা, কিন্তু—'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই।'

'তবে তোমার দিদির মনোবলের কিন্তু প্রশংসা করতেই হয। এই জেদ্ আমার খুব ভাল লাগে, ওর কথা আমি বুঝি।'

'স্ত্রীর কথা ছাডা আর সকলের কথাই তো তুমি খুব ভাল কবে বোঝ।' মুখ ভার করেছে বন্দনা। তারপর গিযে চিঠি লিখতে বসেছে।

কলকাতা থেকে দুর্গাপুর, দূর তো কিছু নয। চলে এসেছে নন্দিতা। এবং আসার সঙ্গে সঙ্গেই; মানে ট্রেন থেকে নেমেই সুস্থ সবল ভগ্নীকে স্টেশনে গাড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে দেখেই বুঝতে পেরেছে অসুখের সংবাদটা ছলনা। তখুনি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে ফিরে যাবার ট্রেন ধবার জন্য স্টেশনে বসে থাকতে চেযেছিল, বন্দনা এসে গাডিতে বসিয়ে দিয়েছে।

এসে পৌঁছেছিল বিকেল বিকেল, সন্ধ্যা হতেই টের পেল শুধু শুধুই বন্দনা তার দিদিকে নিযে আসেনি এখানে, উদ্দেশ্য আরও গভীর। সেই রাত্তিরেই ডাক্তার সাহেবটিকে ওরা ডিনারে আহ্বান জানিয়েছিল এবং তিনি সাতটা বাজতেই এসে হাজির হযেছিলেন। এবং বন্দনা যে তার দিদির বিষয়ে অনেক আগে থেকেই এঁকে অবহিত করে রেখেছে, মিনিট মাত্র আলাপেই সে বুঝে নিতে তিলমাত্র অসুবিধে হযনি।

তবে ভদ্রলোকটি সত্যিই পছন্দের যোগ্য। কথাবার্তা সুন্দর, চালচলন চমৎকার, অতিশয শান্ত এবং ভদ্র। দ্বিতীয দিনেই তিনি জানিয়ে দিলেন নন্দিতাকে যে তাঁর পছন্দ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে, এটাও বললেন, 'আমার বযেস আটতিরিশ, আমি মনে মনে কিছুদিন যাবৎ এই বিবাহ করা বিযযে সিরিয়াসলিই ভাবছিলাম, কাজেই আমার আপত্তি নেই, তবে বযসের তফাত বোধহয কিছু বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

তা হয়তো একটু যাচ্ছিল, নন্দিতা এই সবে তিরিশ পূর্ণ করল। আট বছরের ছোট কম ছোট নয় আজলকাল দিনে। তবে ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্য এত সুন্দর যে সেটা কোন প্রশ্ন বলেই ভাবল না কেউ।

এই কেউর মধ্যে অবিশ্যি নন্দিতা পড়ে না, কেননা সে বরাবরই এত নির্লিপ্ত ছিল

যে তার মনের কথা ধরা সম্ভবই ছিল না। রঞ্জন বন্দনাই সারাদিন বলাবলি করত, সে ধৈর্য ধরে শুনত।

নন্দিতাকে পছন্দ করা ভদ্রলোকের পক্ষে কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা গুণ যোগ্যতা চেহারা কোন দিক থেকেই কোন বিষয়ে, খাটো ছিল না সে। একটা স্পনসর্ড কলেজে পড়ায়, ভাল পড়ায় বলে তার সুনাম আছে সেখানে। ছাত্রীরা ভালবাসে, স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত শান্ত, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, একটু লেখার হাতও আছে। দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও, উল্লেখযোগ্য রকমের লাবণ্যের অধিকারী নিশ্চয়ই।

দুই বোনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ঠিক তিন বছরের। বিবাহের আগে পর্যন্ত বন্দনা দিদির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, একনিষ্ঠা চ্যালা ছিল, এখন দিদির আগেই বিবাহ করে, ভার-ভারিক্কি হয়ে সমান তো বটেই, অনেক বিষয়ে সেই দিদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, অনেক ভালমন্দ পরামর্শ দেয়, অবশ্য সবই বিবাহের উপযোগিতা বিষয়ে। নন্দিতা হাসে। বোনের পাকা পাকা কথা শুনতে ভারি মজা লাগে তার।

অবশ্য বন্দনার নিজের বিয়েটা খুবই সফল হয়েছে। রঞ্জনের মত যোগ্য এবং ভাল ছেলে কমই দেখা যায়। পত্নী-প্রেমিকও বটে। ইঞ্জিনিয়র, খুব উঁচু পোস্টে আছে এখানে, গাড়ি বাড়ি বয় বেয়াবা সব নিয়ে বন্দনা পরিপূর্ণভাবে সুখী। বাবা তাকে দেখেশুনে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছেন। এই বিয়েতে তখন খুব আপত্তি করেছিল বন্দনা, নন্দিতাই তাকে বুঝিযে পটিয়ে রাজি করিয়েছে। নিজের নির্বাচনই যে অব্যর্থ হয না তার প্রমাণ দূরে ছিল না, কাজেই সেটাও বোঝাতে পেরেছে।

বিয়ের পরে চলে যাবার সময় দিদিকে জড়িয়ে ধরে বন্দনা খুব কেঁদেছিল, কৃতজ্ঞতায বিগলিত হয়ে বলেছিল, 'দিদি, তুই আমাকে যত ভালবাসিস আমিও তোকে ততই ভালবাসি, কিন্তু আমি তোর মত ভাল না, আমার ভালবাসার মধ্যে কোন ত্যাগ নেই, তোকে আমি ভেঙে দিয়েছি, তুই আমাকে জুড়ে দিলি।

ভুরু কুঁচকে নন্দিতা বলেছিল, 'বোকামি করিস না তো।'

সম্বন্ধটা অবশ্য বাবা প্রথম নন্দিতার জন্যেই এনেছিলেন, অনুরোধ, উপরোধ, অনশন কিছুই বাকি রাখেননি মেয়েকে রাজি করাবার জন্যে। মা বাবা দুজনেই যৌথভাবে এটা করেছেন।

নন্দিতা অসহায়ভাবে মাথা নেড়েছে আর বলেছে, 'আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার উপর তোমরা রাগ করো না, নির্দয় হয়ো না, আমার মন এখনও প্রস্তুত নয়, আরো কিছুদিন সময় দাও।'

মা বলেছেন, 'এমন পাত্র কি সহজে পাব?'

'বন্দনা আছে।'

'তোর বিয়ে না দিয়ে বন্দনাকে কেমন করে বিয়ে দেব? তুই বড় বোন।'

'আমি যদি সারাজীবন বিয়ে না করি, তাহলে বন্দনাও কি সারাজীবন অবিবাহিত থাকবে?'

তারপর নিজেই উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ঘটনাটা ঘটিয়ে দিয়েছে। ঘটিয়ে বোনকেও সুখী করেছে, নিজেও সুখী হয়েছে। মা-বাবাও মাঝখানকার ব্যাপারটা ভুলতে পেরেছে অনেকখানি।

নন্দিতার বাবা নেহাতই একজন সাদাসিধে ভালমানুষ, এ. জি. বেঙ্গলে ভাল কাজ করেন, স্ত্রীও সুশিক্ষিত। এই দুটি মেয়েকে নিয়ে জীবনটা বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিল। নন্দিতা বন্দনা দুজনেই দেখতে ভাল। ছাত্রী ভাল, অসাধারণ না হলেও সাধারণও ঠিক বলা যায় না। নন্দিতার যেমন লেখার হাত আছে, বন্দনা তেমনি ছবি আঁকে।

মেয়েদের নিয়ে মা বাবা মিলে চারটি মানুষের সংসার এত মসৃণভাবে চলছিল যে মাঝে মাঝে নিজেদের সুখে নিজেরাই অবাক হয়ে যেতেন।

যেহেতু এই বিশ্বসংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয় তাই একদিন এই সুখও মাটির বাসনের মত ভেঙে গেল। ঝড়টা সকলের উপরেই প্রথমে সমানভাবে বর্ষিত হয়েছিল, ধীরে-ধীরে যখন প্রলেপ পড়ল দেখা গেল নন্দিতাকে বড় বেশি জখম করে দিয়ে গেছে। একটা হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকোর মত নিস্তেজ নিরুত্তাপ হয়ে গেছে তার জীবন। যে ঠোঁটের বাঁকে স্বভাবতই একটি মিষ্টি হাসি অবিরত ফুটে থাকত, সেটি সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে যেত মা বাবার, বন্দনা বিব্রত অপ্রস্তুতভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত। দিদির জন্যে তার দুঃখও মা-বাবার চাইতে তিলমাত্র কম ছিল না।

এবং সেই কারণেই নিজের বিয়েতে অত আপত্তি ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেটাই অনেকখানি শান্তি ফিরিয়ে এনেছে পরিবারে, আর টুকুন জন্মাবার পরে তো নিশ্চয়ই। দিন বসে থাকে না, দেখতে দেখতে সেই টুকুনের পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেল, ফুটকুন জন্মে গেল, বিয়ের সাত পূর্ণ হয়ে গেল, তবু সে এতদিনে নন্দিতাকে বিবাহিত করতে পারল না, এটা ভেবে বন্দনার প্রায়ই অত্যন্ত খারাপ লাগে। তবে কি দিদি চিরকালই এভাবে থাকবে নাকি ? এই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কলেজে পড়িয়েই জীবন যাবে ? আগে তবু একটু লেখার অভ্যেস ছিল, খুশি রাখার জন্য বাবা নিজে খরচ পর্যন্ত করে একটা বইও ছাপিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর আর কই ?

অবশ্য এই দুর্গাপুরে বসে বন্দনা ভাবনা ছাড়া আর কী করতে পারে ? বাবা-মারই উচিত এখন জোর করে, দেখে-শুনে পাত্রস্থ করা। তবে এমনিতে শান্ত হলে কী হবে, দিদির জেদও বড় প্রচণ্ড। না তো না, হ্যাঁ তো হ্যাঁ, সুতরাং মা বাবাকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না।

এদিকে পছন্দসই মানুষ পাওয়াও দুষ্কর। নইলে বন্দনা তো আর কম চেষ্টা করে না, কম ভাবে না, কম সচেতন নয় ? বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, পরিচিত, কতজন তো কতদিকে ছড়িয়ে আছে, একটা মানুষের কথাও মনে করা যায় না দিদির সঙ্গে যাকে মানায়। এই ডাক্তার ভদ্রলোকটিই প্রথম মানুষ, যাকে একেবারে ঠিক খাপে-খাপে ভাবা গেল। এবার দয়া করে দিদি সম্মতিটুকু জানালেই সুন্দরভাবে সব হয়ে যেতে পারে।

ফিরে যাবার মুখে দিদিকে সে বলল, 'এসব কথা।' তারপর দিদির নিঃশব্দ মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হতাশ লাগল। তবু জোর দিল গলায়, 'তাহলে তাই ঠিক, কেমন ?'

মৃদুস্বরে নন্দিতা বলল, 'চিঠি লিখে জানাব।' বলেই উঠে পড়ল গাড়িতে।

কী শক্ত মেয়ে! বাপরে বাপ! মাঝে-মাঝে রাগই হয় বন্দনার। না ভেবে পারে

না, দিদিকে সুখী করার জন্য তার কী এত দায় পড়েছে ? তার কিসের মাথা-ব্যথা। বিয়ে না করে দিদি যদি থাকতেই পারে, তাহলে তাই থাকুক না, বিয়ে দেবার দরকারই বা কী ?

কিন্তু কী যে দরকার সে-কথা তো সে জীবনেও কাউকে বলতে পারবে না ? আর দিদিকে যে সত্যি ভালবাসে সে বিষয়েই কী কোন সন্দেহ আছে ?

ছোট্ট ফার্স্ট ক্লাস কামরা। ট্রেনে দরজা থেকে গলি বেয়ে সেখানে এসে নন্দিতা নিজের আসনে বসল। মনটা ভার লাগছিল, ওদের জন্য বেশ কষ্ট হচ্ছিল, টুকুনের শেষ মুহূর্তের কান্নাটা লেগে ছিল কানে।

আর ছুটে এসে হাতে চাপ দিয়ে ভদ্রলোকের হাত ঝাঁকানিটাও মন্দ রেখাপাত করেনি। বোঝাই যাচ্ছিল তাঁর মনের কথাটা। নন্দিতার প্রতি সত্যিই তিনি আকৃষ্ট। যদিও ভেবে-চিন্তেই বিয়ে করছেন, তবু তারই মধ্যে রং লেগেছে খানিকটা। সেটা নিশ্চয়ই উপুরি পাওনা।

কিন্তু নন্দিতা কেন কিছুই পায় না কারও মধ্যে ? স্বামী শব্দটা ভাবলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মানুষকে বিশ্বাস করবার শক্তিটাই হারিয়ে গেছে হৃদয় থেকে।

কিন্তু তিরিশ বছর বয়েস হয়েছে, বিয়ের কথা ভেবে দেখতে গেলে (যেমন ডাক্তার ভদ্রলোকটি আটতিরিশ বছর বয়সে দেখছে) এখনই একটা সমাধানে পৌঁছানো দরকার। আর সত্যি বলতে বিয়ে না করে সমস্ত জীবন নিঃসঙ্গ ভাবে কাটানো সম্ভব কি না সেটাও মন্দ ভাববার বিষয় নয়।

মা-বাবা চিরকাল বেঁচে থাকবেন না, মা বাবার মৃত্যুর পর তার আয়ু তাকে আরও অনেকদূর নিয়ে যাবে, তারপর ? তারপর কী ? বন্দনা যে-সব যুক্তি দেয়, খুব অবহেলার যোগ্য নয়, সে-সব কথা। এগুলো বন্দনারই যুক্তি। বন্দনা আরো বলেছে, দিদি, আর কিছুর জন্য না হোক তুই না হয় একজন মা হবার জন্যই বিয়ে কর। টুকুনকে নিয়ে এমন পাগল-পাগল করিস, তবু তো সে পরের ছেলে। নিজের হলে ভেবে দ্যাখ তো কী রকম লাগবে ?

নন্দিতা খুব হেসেছে এরপরে, বোনের চুল টেনে বলেছে, 'উঃ, তোর গিন্নিগিরি আর তো আমি সইতে পারি না।'

'গিন্নি-গিরি কী ? বন্দনা নিজেও হেসেছে, যা ঠিক তাই বলছি।'

'থাম তো। তার চেয়ে চল, তোদের নতুন বাজারটায় ঘুরে আসি একবার।'

'দিদি, আমারও তো বিয়েতে কম অমত ছিল না ?'

'তোর আর আমার !' নন্দিতার গলা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে, সে দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারে না।

মুখ নিচু করে বন্দনা বলে, 'জানি তুলনা হয় না। কিন্তু দিদি, তোকে বলা হয়নি, রঞ্জনই প্রথম পুরুষ নয় আমার জীবনে, আমি আরও একজনকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু এখন তো রঞ্জনকে আমি চোখে হারাই।'

'সে কী রে ! কবে ? নন্দিতা আবহাওয়াটা লঘু করে দিয়ে কৃত্রিম কৌতূহলে ফেটে পড়ে, কখনও তো বলিসনি ! দিব্যি তো চেপে গিয়েছিস ! কম মেয়ে নও তো তুমি !' তারপর মাথা নেড়ে বলে, 'জানি, জানি, কার কথা বলছিস।'

'কে ?' হঠাৎ যেন চমকে ওঠে বন্দনা ; তারপরই স্বাভাবিক হয়ে বলে, 'বল তো কে ?'

'মলয় তালুকদার।'

'মলয়! হাসতে হাসতে মরে যায়, শেষে তুমি আমাকে মলয়টার প্রেমে ফেললে?'

'কেন, মলয় খারাপ কিসে? তোদের গ্রুপে সবচেয়ে ভাল ছেলে। কী রকম ফরমাশ খাটত তোর।'

'থাক, আমার প্রেমের গল্প শুনে তোমার কাজ নেই। যা বলছি তা শোন। এই ডাক্তারটিকে তুমি বিয়ে কর। আমি বলছি তুমি সুখী হবে, সব ভুলে যাবে।'

'সব ভুলে যাব?'

'নন্দিতা!'

নিজের আসনে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বোনের সঙ্গে এইসব কথোপকথনের টুকরো-টুকরো অংশ ভাবতে ভাবতে নন্দিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। উল্টোদিকের ভদ্রলোকটিকে আর খেয়াল করতে পারেনি। তাছাড়া ভদ্রলোকটি এতক্ষণ একখানা ইংরেজি খবরের কাগজে মুখ ঢেকে কি যে পাঠ করছিলেন অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কে জানে।

ডাক শুনে নন্দিতা চমকে ফিরে তাকাল, তারপরেই যেন জমে গেল বরফের মত।

'চিনতে পারছ?'

নন্দিতা নড়ে-চড়ে বসে একবার হিম চোখে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'কী কাণ্ড, না? শেষে এভাবে দেখা হয়ে গেল?'

'নন্দিতা পাথর।'

'কিন্তু আমি জানতাম দেখা হবে।'

ঈশ্‌শ্‌! কী নির্লজ্জ! গাল গলা ঘামে জবজবে হয়ে যাচ্ছিল নন্দিতার।

'আমি সাত বছর ধরে এই সুযোগটিই খুঁজছিলাম। যদি সারাজীবন এই অপেক্ষায় বসে থাকতে হত তাই থাকতাম।'

স্কাউন্ড্রেল! সত্যি স্কাউন্ড্রেল। নন্দিতার নিশ্বাস ঘন হয়।

'খুব আশ্চর্য যে সাত বছর আগে ঠিক এই মাসের এই তারিখটিতেই তোমার আমার শেষ দেখা হয়েছিল, মনে আছে?'

এবার মুখ খুলল নন্দিতা। লাল হয়ে বলল, 'দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না, আপনি আর কারও সঙ্গে ভুল করে যদি ক্রমাগত আজে-বাজে কথা বলতে চেষ্টা করেন, বাধ্য হয়েই আমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হবে।'

'অন্যকে তুমি পাচ্ছ কোথায়? কামরায় তো আমরা মাত্রই দুজন। আর যে দুজন ছিলেন, আমারই ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে এই স্টেশনে নেমে গেলেন তাঁরা।'

'আমি—আমিও পরের স্টেশনে নেমে যাব।'

'তারও তো ঢের দেরি আছে। আর চলন্ত ট্রেন থেকে যদি লাফিয়ে পড়তে চাও আমি তা হতে দেব কেন? অন্য কিছুতে না পারি, শরীরের শক্তিতে আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব।'

'হ্যাঁ, শুধু ঐ শরীরেরই শক্তি আছে, আর কিছু নেই।'

'কে বলেছে নেই? তাহলে এতদিন বাদে ঐ হৃদয়হীন বালিকাটিকে আমি মনে রাখলাম কেমন করে?'

'হৃদয়হীন!'

'স্টেশনে তোমাকে কে তুলে দিতে এসেছিল?'
'কথা বলবার মত আমার প্রবৃত্তি নেই।'
'বল না। স্বামী? পুত্রটি কার? তোমার?'
নন্দিতা মুখ ফিরিয়ে বসল।
'আমার যদ্দূর ইনটুইশন, হাসল সে, বন্দনার স্বামী এবং পুত্রটিও তার। ঠিক?'
নন্দিতা জবাব দিল না।
আর যে ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে ছুটে তোমার এসে হাত ঝাঁকালেন, 'সেটি তোমার প্রেমিক। ঠিক?'
নন্দিতা জবাব দিল না।
'বল না, ঠিক বলেছি?'
'দেখুন—'
'কি দেখুন দেখুন করছ তখন থেকে? তোমার চরিত্রে তো কখনও কোন ভান ছিল না, কে তোমাকে এমন বদলে দিল?'
নন্দিতার দাঁতে দাঁত আটকে গেল।
'আমি অভিজিৎ রায়, তুমি নন্দিতা দত্ত, নাকি নও, পদবী বদলেছ? যদি বদলেও থাক তাতেও কিছু হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই, কেননা পরিচয়টা তো আমাদের ঐ একই থাকছে, বল, সত্যি কি না?'
নন্দিতা নিঃশব্দ।
'তোমার একটা গল্প পড়েছিলুম কয়েক বছর আগে, গল্পের নাম ছিল অনন্য এবং সেই অনন্য যে তুমি আমাকে ভেবেই লিখেছ, সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, যদিও তার আগের ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষীই দিয়েছিল।'
নন্দিতা নিঃশব্দ।
'কিন্তু আমার অনন্যা এখনও আমার কাছে অনন্যাই আছে।'
'অনন্যা!' গলা চিরে শব্দ বার করল নন্দিতা।
'নিশ্চয়ই। একশোবার, হাজারবার, লক্ষ কোটিবার। কেন, বিশ্বাস কর না?'
'না।'
'এই অবিশ্বাসের জন্য কে দায়ী, নন্দিতা?'
'কেউ না, কেউ না, আমি নিজেই আর কাউকে বিশ্বাস করি না।'
'কেন?'
'কোন কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।'
'কৈফিয়ত তোমাকে দিতেই হবে। এই কৈফিয়তের জন্যই আমার এতদিনের অপেক্ষা।'
'আমি সব ভুলে গেছি।'
'ভোলোনি। একতিলও ভোলোনি। আজ তোমাকে দেখে তোমার মুখ দেখে আমার এই উপলব্ধি হল তোমারও একটা অপেক্ষা ছিল আমার জন্য।'
'না না।'
'নিশ্চয়ই।'
'না না। কক্ষনো না।'
'নিশ্চয়ই।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে শক্ত করে হাত ধরল, 'শোন, আমি দিনের পব দিন

টেলিফোন করেছি, পাইনি, দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি তোমাদের গলিটাতে, দেখা হয়নি। আমি রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি, পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি, চাকরি ছেড়েছি, কলকাতা ছেড়েছি—'

'আমি শুনতে চাই না, শুনতে চাই না—'

'বল কেন ? কী হয়েছিল ?'

'সে-কথা কি আমার চেয়ে প্রশ্নকর্তারই বেশি ভাল করে জানার কথা নয় ?'

'না। অপমানিত হওয়া, অসম্মানিত হওয়া আর ঠকে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই জানি নে আমি।'

নন্দিতা ঢোঁক গিলল। বুঝতে পারল না, কোন্ খুঁটিতে পা রেখে এতকাল পরে এমন ভাবে কথা বলছে এই লোকটি। ভয়-ডর ওর কোন কালেই ছিল না সে কথা সত্য, তা বলে মিথ্যেবাদীও তো ছিল না।

উত্তেজিত ভাবে বলল, 'গলায় জোর থাকলেই কি সব ক্ষেত্রে সব দোষের খণ্ডন হয়ে যায় ?'

'দোষ ? দোষ তুমি কোথায় দেখতে পেয়েছ ? কী দোষ ?'

'আমি আর কথা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু পারতেই হবে, আমার প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে তোমাকে।'

হঠাৎ দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল নন্দিতার, ঝাপসা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে একটি উজ্জ্বল আনন্দময় বিয়েবাড়ির দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল চোখে।

লোকজন, হৈ-হল্লা, গানবাজনা, আমোদ-প্রমোদ—কী সুখ সকলের মনে। কত ঘটা-পটা করেই না বিয়ে হচ্ছে বাড়ির বড় মেয়েটির। নিঃসন্তান পিসি এসেছেন, চিরকুমার জ্যাঠামশায় এসেছেন, তিন পুত্রের জনক জননী মাসি মেসো এসেছেন, দুই পুত্রের জনক-জননী দুই মামা দুই মামী এসেছেন, দলে-দলে ভাগ হয়ে পরচর্চা থেকে শুরু করে হেন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আবার তর্ক হচ্ছে খুব, কেউ তর্ক করছে রাজনীতি নিয়ে, কেউ বা ফুটবল ক্রিকেট, মেয়েরা একজোটে বসে সিনেমা।

মস্ত এক বাড়ি আলাদা করে ভাড়া নেওয়া হয়েছে একমাসের জন্যে, বাড়িটাতে ঘরের অন্ত নেই, জায়গার অন্ত নেই।

পিতৃকুলে মাতৃকুলে এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, ধুম-ধাড়াক্কা যে হবেই সে তো জানা কথা। শুধু তো প্রথম মেয়ের বিয়ে বলেই কথা নয়, মামা মাসীর মেয়েই নেই, এদিকে পিসি বন্ধ্যা। জ্যাঠামশায় অবিবাহিত। মাঝখান থেকে তারা দুটি বোন জন্মিয়ে দুই কুল একেবারে উচ্ছ্বসিত করে ফেলেছে। ভবতোষবাবু খরচপাতি করছেন খুব, মনোমত জামাই পেয়ে উৎসাহ তাঁর আরও বেড়ে গেছে।

শুধু মা বাবাই নেই, তাছাড়া আর কী নেই অভিজিতের। বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জন, চেহারা চরিত্র এতটুকু খুঁতও কি কেউ বার করতে পারবে ? শুধু মামা একবার বলেছিলেন, 'বারো চোদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়েছে, ওখানে আবার কিছু বাধিয়ে এসেছে কি না ভাল করে খবর নিয়েছ তো ?'

মা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছেন, 'তুই বলছিস কি ভানু, দুদিন মেলামেশা করে দ্যাখ না, কী রত্ন। ওর দিদি জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন, আমি সুধীনবাবুকে লিখে দিয়েছিলাম

একটু টিপে দেখতে, তাছাড়া পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কি সেখানে আমাদের কম ? সব খবর নিয়েছি।'

মামা' বললেন, 'দিদি, জামাইবাবু লন্ডনে থাকেন বুঝি ?'

'তাঁরা সেখানকারই প্রবাসী, বাড়ি-টাড়ি কিনে একেবারে কায়েমী হয়ে বসেছেন। মাতৃপিতৃহীন ভাইকে তার দিদিই নিয়ে যায় প্রথমে অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. পাশ করবার পরে চাকরিও নিয়েছিল সেখানে, তারপর কী খেয়ালে চলে এসেছে দেশে। আর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট চাকরি পেয়েছে ইন্ডিয়া টোবাকোতে। বয়েসটা কী বল ? নন্দুর তেইশ, অভিজিতের আটাশ। সবদিক থেকে এ রকম যোগাযোগ সত্যি দেখা যায় না। কী শুভক্ষণেই যে ওদের দেখা হয়েছিল।'

শুভক্ষণের দিনটির কথাও ভাবল নন্দিতা। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন, এবং শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশে এই বৃষ্টির আগমন হঠাৎই হয়েছিল। দুই বোনে মিলে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল ফিরতি পথে এই কাণ্ড।

ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দৌড়ে গাছের তলায় এল, তারপর ট্যাক্সি ধরার জন্য ছুটে এল বড় রাস্তার উপর। ট্যাক্সি পাওয়া গেল না কিন্তু গাড়ি থামল একটি, চালকটি মুখ বার করে জানালো, সে লিফ্ট দিতে প্রস্তুত। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল দু'বোনে, অভিজিৎ সামনের দরজাটা খুলে ধরে বলল, 'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, একেবারে ভিজে যাচ্ছেন যে।' উঠে পড়ল ওরা, সামনের আসনেই এঁটে গেল দুই বোন।

নন্দিতা লজ্জিত মুখে বলল, 'আপনার সিটটা আমরা ভিজিয়ে দিলুম।'

অভিজিৎ বলল, 'আগে বলুন কোনদিকে।'

এই হল আলাপের সূত্রপাত। অভিজিৎ সেদিন তাদের রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ির দরজাতেই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। তারা ছাড়েনি, ভদ্রতা করে ডেকে এনেছিল ঘরে, বাবা ছিলেন না, মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, চা খেতে খেতে বলেছিল, খুব সহজেই একটা বন্ধুত্বর ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। নন্দিতা তখন সদ্য এম. এ. পাস করে বেরিয়েছে, আর বন্দনা তখন বি. এ. দেবে।

বিদায় দেবার সময় বন্দনা বলেছিল, 'আজ চা খেলেন না, আর একদিন কিন্তু আসতে হবে।'

নন্দিতার অত মুখ ফোটে না, সে শুধু তাকিয়ে সেই প্রস্তাবে সায় জানিয়েছিল। দেখা গেল, সত্যি আর একদিন চা খেতে এল অভিজিৎ, তারপরে আর একদিন, আর একদিন। আর তারপর কী থেকে যে কী হয়ে গেল, কখন যে নিঃশব্দে দুজনে গভীর প্রেমে মগ্ন হয়ে গেল কে জানে।

কথাবার্তা বন্দনাই বলত বেশি, আদর যত্নও বন্দনাই করত তারপর চলে গেলে ক্ষ্যাপাতো। এই করতে করতে একদিন অভিজিৎ বিয়ের প্রস্তাব করে ফেলল মা বাবার কাছে। এবং মা বাবার সম্মতি পেতে এক মুহূর্তও দেরি হল না।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে কয়েকটা দিন যে অভিজিৎ কী উদ্দাম হয়ে উঠেছিল তা বলা যায় না। আর বিয়ে হবে বলে মা-বাবাও ওদের দুজনকেই যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

আপিস-টাপিস সব তার মাথায় উঠে গেল, কেবল যখন তখন ফোন আর যখন

তখন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। নন্দিতাও তখন বেকার, অসুবিধে ছিল না কিছু। বন্দনা আটকে থাকত। হয় তার কলেজ নয় তার আসন্ন পরীক্ষার পড়া। তাছাড়া একটু একটু করে সে যেন কেমন বদলেও যাচ্ছিল। তার সেই চালাক চতুর কথাবার্তা ব্যবহার সব যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। নন্দিতা রাত্তিরে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে বলত, 'তোর কী হয়েছে রে বন্দনা, কী রকম চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে থাকিস ?'

বন্দনা বলত, 'কই, না তো।'

'নিশ্চয়ই।'

বন্দনা তখন মৃদু হেসে বলত, 'তোর বিয়ে আর আমার পরীক্ষা, দুটোয় মিল আছে নাকি কিছু বল ?'

'তাহলে বিয়েটা পেছিয়ে দিতে বল না মা-বাবাকে।'

'পাগল !'

'না সত্যি, পরীক্ষার সময় এ ধরনের গোলমাল খুব খারাপ।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তা নিয়ে আর তোকে অত ভাবতে হবে না। আজ কোথায় গিয়েছিলি বল।'

'দ্যাখ না, পাগলের মত সব কী যা-তা কিনছে। আমার এত লজ্জা করে—'

'কী কিনছে রে ?'

'যা-তা। শাড়ি গয়না ফার্নিচার, কী যে করছে না—'

'ভাল তো—' এই বলে বেডল্যাম্প নিবিয়ে বন্দনা পাশ ফিরত।

এমনি করেই ঘনিয়ে এল দিন, সাতদিন আগে থেকেই বাড়ি ভরে গেল আত্মীয় স্বজনে। মা অভিজিৎকে বলে দিলেন ; 'তুমি কিন্তু কটা দিন আর এস না। একেবারে বিয়ের পরে দেখা হবে আবার।'

অভিজিৎ হেসে বলল, 'নন্দিতাও যাবে না ?'

'তোমার দিদি আসবেন, ওরও না যাওয়া ভাল। আর চিরকালের জন্যই তো যাচ্ছে তোমার কাছে, আমার কাছে আর ক'দিন ?' বলতে বলতে সজল হয়ে ওঠেন মা।

কিন্তু মাকে আর সেই কারণে সজল থাকতে হল না বেশি দিন, বিয়ের দুদিন আগে সব বন্ধ হয়ে গেল, বাবা তাদের দুই বোন আর মাকে টিকিট কিনে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দিল্লি পাঠিয়ে দিলেন।

উঃ ! সে দিনটার কথা ভাবা যায় না। ভাবা যায় না। সেই লজ্জা, সেই দুঃখ, সেই মর্মান্তিক বেদনা—তার কি কোন তুলনা আছে ? আর যার জন্য এই কাণ্ড সেই কিনা মুখোমুখি বসে চোখে চোখে তাকিয়ে আজ কৈফিয়ত তলব করছে ?

অনেক কথা অভিজিতের বুকের মধ্যেও তোলপাড় করছিল। প্রথম মনে পড়ল, নন্দিতার বাবার সেই গম্ভীর গলার নির্দেশ, 'এ বিয়ে হবে না !'

ফোনের ভিতর দিয়ে যেন বজ্রপতন হল।

'কেন ?' আকাশ থেকে পড়েছিল অভিজিৎ।

ওপিঠ থেকে কোন জবাব এল না, ফোন কেটে গেল।

নিশ্চয়ই আপিস থেকে করেছেন। আর এটা আপিসেরই সময়। নম্বর দেখে সে

দ্রুত হাতে সেখানেই ফোন করল, পাওয়া গেল না, শোনা গেল সেদিন তিনি আপিসেই যাননি। [illegible]রিয়া হয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছিল ওদের বাড়িতে, নতুন বাড়ি পুরনো বাড়ি কোন 'বাড়িই বাদ দেয়নি, কিন্তু কোনখানেই কোন হদিস মিলল না।

কি হল, কেন হল, কোথায় গেল কিছুই বুঝতে না পেরে নিজেকে তার বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে হচ্ছিল। সে যে তারপর এই মেয়েটিকে পাবার জন্য কি করেছিল আর না করেছিল তার কি কোন হিসেব আছে?'

সেই সঙ্গে একটা গভীর সন্দেহও আক্রমণ করেছিল তাকে, মনে পড়ল যে কদিন নন্দিতার মা তাকে নন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছিলেন না, নিয়মিত ভাবে বন্দনা আসছিল খোঁজ-খবর নিতে। যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ, নন্দিতার বদলে বন্দনাকে দেখেও তার বিরহ অনেক প্রশমিত হয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে নিয়ে ঘুরত ফিরত খাওয়াতো, তারপর সময়মত পৌঁছে দিয়ে আসত বাড়ির কাছাকাছি। কেননা বন্দনা বলত, 'না মশাই, দরজা পর্যন্ত যাবেন না, মা বকবেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় খুব সেজে-গুজে এল বন্দনা। আপিস থেকে ফিরে চান-টান করে বলা যায়, বন্দনার অপেক্ষাতেই বসেছিল অভিজিৎ। বন্দনা সবসময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই আসত। দুপুরে সে টেলিফোন করত আপিসে, তারপর স্থান কাল নির্দিষ্ট হত। বন্দনাকে খুব অন্যমনস্ক আর ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। অভিজিতের মনে সেই সময়ে এমন একটা অপার্থিব সুখের নদী অনবরতই বয়ে চলত যে অন্যের দিকে তেমন লক্ষ্য করার মত মন থাকত না। ফুর্তির সুরে বলল, 'চল, একটু মার্কেটটা ঘুরে আসি।'

বন্দনা বলল, 'মার্কেটে কী?'

'আর বল কেন, সিগারেট ধরাল অভিজিৎ, দিদি টাকা পাঠিয়েছেন, অনেক হুকুম তাঁর ভ্রাতৃবধুর জন্যে, শাড়ি গয়না—হিন্দু বিয়েতে নাকি কী একটা অধিবাস-টধিবাস আছে?'

বন্দনা বলল, 'ওসব আমি জানি না। তবে আপনার দিদি যখন নিজেই আসছেন তখন আর আপনাকে দিয়ে কেন?'

'দিদি আসবেন একেবারে বিয়ের দিন দুপুরে, তখন আর কেনা-কাটার সময় কই?'

'কেন, অত দেরিতে কেন?'

'সে-সব কথা আমি বিশদভাবে কিছু বুঝতে পারলাম না চিঠি থেকে, তার যদ্দূর মনে হচ্ছে, ঐ তারিখে বোধ হয় প্লেনে কোন মোটা কনসেসন পাচ্ছে। সপরিবারে আসছে তো? কনসেসন পেলে অনেক টাকা বাঁচবে।'

'ও।'

'তা হলে যাবে নাকি? তোমার দিদির পছন্দ আর তোমার পছন্দ এক রকম হবে।'

'আজ আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাব, আমার মাথা ধরেছে, কথা দিয়েছিলাম বলেই আসতে হল। আমি বরং এখনই উঠি—' সত্যিই উঠেছিল বন্দনা। অভিজিৎ হাত ধরে বসিয়ে দিল, 'এই এলে, এই উঠবে কী? পাগল না ক্ষ্যাপা—'

তখন সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল, ঐটুকু টানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অভিজিতের গায়ের উপরে, তারপরেই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল, 'অভিজিৎ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে এমন ভাবে পরিত্যাগ কোরো না। আমি মরে যাবো, আমি বিষ খাবো।'

অভিজিৎ একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এই অপ্রত্যাশিত আচম্বিত ব্যবহারে। একটু পরেই ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, বন্দনাকে বসিয়ে দিল সোজা করে, আস্তে বলল, 'চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ তুমি সত্যিই সুস্থ নেই।'

এটা বোধহয় বিয়ের চারদিন আগের ঘটনা। পরের দিনটা একটা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কেটে গেল, আর তারপর দিন দুপুরেই নন্দিতার বাবার বজ্রনির্ঘোষ—এ বিয়ে হবে না।

সুতরাং এ-দুটোর মধ্যে যে কোথাও একটা গভীর মিল আছে, সেই সন্দেহ হওয়াটা অভিজিতের পক্ষে কিছু আশ্চর্য ছিল না, কিন্তু তা বলে—

'আরে, এর মধ্যেই বর্ধমান স্টেশন এসে গেল নাকি। এই বেয়ারা—বেয়ারা— চিন্তা ভাবনা ছেড়ে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে অভিজিৎ চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

ফার্স্টক্লাসের যাত্রী, ছুটে এল তকমা আঁটা বেয়ারা, চা এসে গেল মুহূর্তে।

অভিজিৎ খুশি হয়ে বলল, 'আঃ, এই সময়ে চা না হলে চলে ? ঢালো, শিগগির ঢালো, তোমারটা পাতলা আমারটা ঘন। না কি অভ্যেস বদলেছ কিছু ?'

নন্দিতা ওর ভাবভঙ্গি দেখতে দেখতে মাঝখানকার সময়টা হারিয়ে ফেলেছিল, তার মনে হচ্ছিল, এই দেখা যেন সাতবছর উত্তীর্ণ করে নয়, অনেক আগুন মাড়িয়ে নয়, যন্ত্রণার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে নয়, যেন কালকের পরে আজ। কোন আড়ষ্টতা নেই, লজ্জা নেই, অন্যায়ের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই ব্যবহারে।

'তোমাকে দেখে আমার কী যে ভাল লাগছে—' দুই চোখ ভরা আলো নিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে, 'আমি ভেবে পাচ্ছি না, কী করব, কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাব ঈশ্বরকে। তুমি ঠিক সে রকম আছো, ঠিক সে রকম। আমি জানতাম তুমি তাই থাকবে, তুমি কখনও অন্য রকম হতে পারো ?'

'এই লোকের সঙ্গে আর কী করে কঠিন ব্যবহার করা যায় ?' কম্পিত হাতে চা ঢালল নন্দিতা।

'তুমি তো জানতে, তুমি ছাড়া আমার জগতে আর কিছু ছিল না, তবে কেন অমন করে সব বন্ধ করে দিলে ? কে তোমাকে উধাও করে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে ? বল, কী হয়েছিল, বল, বল—'

সন্ধে ঘন হয়ে আসছিল, নন্দিতা ভেবে পাচ্ছিল না, এখন তার কী করা উচিত। শুধু ইচ্ছে করছিল অনন্তকালের মধ্যে এই ক্ষণকালটিকে চিরন্তন করে ধরে রাখতে। হোক মিথ্যে, তবু এর মাধুর্যে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, তার একান্তে লালিত ভালবাসা আর অভিমানের দুঃখ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

অনেক পরে এক সময় অধীর হয়ে সে বলে উঠল, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি কিছু বলতে পারবো না, আমার ভাগ্যই আমাকে বঞ্চনা করেছে, আমি কাউকেই এজন্য দায়ী করছি না।'

অভিজিৎ গলায় জোর দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ে থাক, আমিও আমার পুরুষকার প্রয়োগ করি, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি আর আছে কি না দেখ তুমি, যা আমার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে !'

নন্দিতা মুখ ঢাকল দু'হাতে।

আর সেই সময়ে দুর্গাপুরে বসে বন্দনা ভাবল, দিদির সুমতি হোক, দিদি যেন আর অমন না করে এই বিয়েতে। তারপর অনেকদিন পরে তার অভিজিৎকে মনে পড়ল, মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা, যখন দিদিকে নিয়ে সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে এসেছিল বলেছিল, 'একটা কথা আছে, দিদি।'

নন্দিতা তার অস্বাভাবিক চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কী রে ?'

সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'অভিজিৎ—'

'অভিজিৎ কী ?'

আজ আমার সঙ্গে কলেজে দেখা করেছিল।'

'কিছু বলল ?'

'সন্ধ্যাবেলা যেতে বলেছিল ওর ফ্ল্যাটে।'

'গিয়েছিলি ?'

'গিয়েছিলাম।'

'ও ভাল আছে তো ?'

বন্দনা চুপ করে থেকে বলল, 'দিদি, তুমি এ-বিয়ে কোরো না।' এ-কথা বলতে বুকটা ধক ধক করছিল।

নন্দিতা অধীর ভাবে বলল, 'কেন ?'

'ও ভাল না !'

'কী বলছিস তুই ?'

'তোমাকে ও ভালবাসে না, মিথ্যে কথা বলে।'

'বন্দনা—'

'আজ আমাকে ও অপমান করেছে।'

'তোকে ? অপমান করেছে ?'

'আমাকে—আমাকে—ওর ফ্ল্যাটের মধ্যে একা পেয়ে—'

'কী—কী—'

'জোর করে খারাপ কাজ করেছে, আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে, আমার নারীত্ব কেড়ে নিয়েছে—'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, মা উঠে এসেছেন, হাতে ভেজা শাড়ি, কাজ সেরে স্নান করে এলেন বোধহয়, ছাদে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। নন্দিতা ঠিক মরা মানুষের মত দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল চোখ বুজে, বন্দনা নিজের মিথ্যাপটুতায় নিজেই স্তম্ভিত হয়ে শব্দ করে কাঁদছিল।

'কী রে ?' মা ঝুঁকে পড়লেন তাদের দিকে, 'কী হয়েছে ? কী করছিস তোরা ?'

তারপর ? তারপর আর কী ? বন্দনা যা চেয়েছিল তাই হল। মা তখুনি তাদের নিয়ে আত্মীয় কুটুম্বের ভিড় থেকে চলে এলেন পুরনো বাড়িতে। চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে পড়ল নন্দিতা, একটা শব্দও আর কেউ শুনতে পেল না তার মুখে, তাকে খাওয়ানো গেল না, ওঠানো গেল না, আর মধ্যরাত্তিরে দেখা গেল বিছানা থেকে নেমে সে শিশিভরা অ্যাসপিরিন, বিলিতি অ্যাসপিরিন, মা'র সর্বদা মাথা ধরে বলে অভিজিৎই যেটা দিয়েছিল একদিন, মুঠো করে নিয়ে, জল মুখে দিয়ে হাঁ করেছে খাবার জন্য। লাফিয়ে নেমে এল

বন্দনা, ভাগ্যিস চোখে তার ঘুম আসেনি সেদিন, এক ধাক্কায় সব ফেলে দিল। মেঝেতে অজ্ঞান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নন্দিতা, আর তার সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না।

পরের দিনই অসুস্থ দিদিকে আর তাকে নিয়ে মা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের কর্মস্থান দিল্লীতে চলে এলেন।

সামলে উঠতে নন্দিতা অনেকটা সময় নিয়েছিল, অনেকদিন, থাকতে হল দিল্লীতে। বাবা মা জ্যাঠামশায় সবদিক বিবেচনা করেই কলকাতা আসতে দেননি, যখন এল, দেখা গেল, বাবা বাড়ি বদলেছেন।

কিন্তু কেন এই ভীষণ কাজ করেছিল সে ? কোন শয়তান চালিত করেছিল তাকে ? অথচ অভিজিতের সঙ্গে তার বন্ধুত্বয় আগে তো কোন মালিন্য ছিল না। বিলেত প্রবাসী ছেলে, ধরন-ধারণ অভ্যেস সবকিছুর মধ্যেই এ-দেশের চেয়ে সে-দেশের ছাপই বেশি স্পষ্ট, আচার আচরণ এত সহজ সরল সুন্দর ছিল যে কখনই মনে হয়নি এই বন্ধুত্বর মধ্যে কোন স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান আছে। বন্দনা সে ভাবেই গ্রহণ করেছিল তাকে, আর বন্ধুত্বটা তার সঙ্গেই গাঢ় ছিল বেশি। দিদি স্বভাবতই একটু লাজুক প্রকৃতির। কারও সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠতে সময় লাগে ওর, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে ওরা যে কখন বন্ধুত্বর গন্ডি ছাপিয়ে স্ত্রী-পুরুষের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি বন্দনা। যদি অভিজিৎ দুম করে একটা বিয়ের প্রস্তাব করে না বসত, বন্দনা সারাজীবনেও জানত না যে অভিজিৎ শুধু বন্ধু নয় একজন পুরুষ বন্ধু, যার সঙ্গে প্রেমে পড়া যায়, বিয়ে করা যায়। সেই প্রস্তাবটাই তার কুড়ি বছরের সতেজ সবল হৃৎপিণ্ডে একটা ঘা দিল বিষম জোরে, তক্ষুনি মনে হল, এই প্রস্তাবের নায়িকা তো আমিও হতে পারতাম। ভাব তো আমার সঙ্গেই বেশি। কতদিন তো এমনও হয় সারাক্ষণই ও আর আমি গল্প করি, দিদি আসে যায় বসে চা আনে, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে সঙ্গ দেয় না। তবে কখন ও এই জয়ের মুকুট কেড়ে নিল ? একটা হেরে যাওয়ার গ্লানি কষ্ট দিয়েছিল তাকে, আর সেই কষ্ট থেকেই কখন যেন একটি ছোট্ট প্রেমের অঙ্কুর মাথা তুলল উপর দিকে। কিন্তু কে জানত সেই অঙ্কুর এমন সাপ হয়ে ছোবল দেবে।

শেষের দিকে বন্দনা সত্যিই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। নইলে অমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা সে ঘটাতে পারল কেমন করে ? অভিজিতের বিয়ে বন্ধ করার জন্য তখন তার এমন কোন কর্মই ছিল না যা সে না করতে পারে ! শেষ পর্যন্ত করলও তো ! অভিজিতের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবার প্রতিশোধ তো নিল !

অথচ এখন তো ভুলেও একবারও মনে পড়ে না ওকে। দিদি চোখের সামনে একটা জ্বলন্ত চিহ্ন হয়ে বসে না থাকলে এই মুহূর্তেই বা তার মনে করবার দরকার ছিল কী ? একটা অপরাধবোধ। এই অপরাধবোধই মাঝে মাঝে কুরে কুরে খায় তাকে। অনুতাপ দগ্ধ করে হৃদয়কে। হে ভগবান, দিদি যেন এবার সত্যি বিবাহিত হয়ে আমাকে মুক্তি দেয়। এই যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

ট্রেন তত্ক্ষণে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। ব্যাকুল হয়ে অভিজিৎ বলল, 'তুমি এখনও মুখ ভার করে থাকবে ? এখনও আমাকে বলবে না কী হয়েছিল ? কেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল সব ?'

একই প্রশ্ন বারবার। নন্দিতা অসহিষ্ণু বোধ করল।

'তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে তুমি আমাকেই দায়ী করতে চাইছ, আমার উপরই তোমার সমস্ত অভিযোগ, অভিমান—'

নন্দিতা, হাত মুঠো করল।

'বল তো, এর মধ্যে বন্দনা কোনভাবে জড়িত ছিল কি না?'

এবার সে আপাদমস্তক চমকে উঠে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

চোখে চোখ রেখে অভিজিৎ ঝুঁকে বসল একটু, 'তাহলে আমার সন্দেহ অমূলক নয়? ভগ্নীর জন্য আত্মত্যাগের মহিমাই তবে এর মূল কারণ?'

'আত্মত্যাগ!' নন্দিতা ভুরু কুঁচকাল।

'কী করেছিল বন্দনা? বিষ-টিষ খেয়েছিল নাকি?' অভিজিতের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নন্দিতা বলল, 'অমানুষিকতার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'ত্যাগেরও একটা সীমা থাকা উচিত, ভান করে তো আর কেউ কাউকে ভালবাসতে পাবে না?' অভিজিৎকেও সমান ক্রুদ্ধ মনে হল।

'ভালবাসার প্রশ্ন উঠছে কোথায়?'

'আমি তার একটা চিঠিও পেযেছিলাম।'

'চিঠি!'

'যার নাম প্রেমপত্র। তাতে কোন ঠিকানা ছিল না, তলায় নাম ছিল না, কিন্তু দিল্লির ছাপ ছিল।'

'চিঠি লিখেছিল সে? বন্দনা?'

'যদিও আমি ওর হাতের লেখা চিনতাম না, তবু আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এটা ওরই চিঠি। ক্ষমা কর, তোমার ভগ্নীর প্রেম নিবেদনের ভঙ্গিটা আমার একটুও রুচিসঙ্গত মনে হয়নি।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'কি আবাব! যখন বোঝা যাচ্ছে বিয়েটা ওর জন্যেই ভেঙে গিযেছিল, আমার কোন সহানুভূতি নেই ওর ওপরে। সে তুমি রাগই কর আর যা-ই কর। আমি ভেবেছিলাম, কথাটা বিয়ের পরেও তোমাকে বলব না, ছেলেমানুষি ঝোঁকে সে যা করেছে তা নিয়ে কখনও লজ্জা দেব না তাকে—'

'কি করেছিল সে?' আর্তের মত বলে উঠল নন্দিতা।

ছোট কামরার মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল অভিজিৎ; 'আমি যখন তাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিযে দিযে এসেছিলাম, তখন সত্যি তার জন্য কষ্ট হচ্ছিল আমার, তোমার সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ হযে যাবার পরে রোজই সে আসত, আমার কত ভাল লাগত, আমি তাকে কত ভালবাসতাম—'

'অভিজিৎ—'

'আমি চিঠিটা তোমাকে দেখাবো?'

'তবে কি ও সব কথাই বানিয়ে বলেছিল?' যেন ঠোঁট থেকে স্খলিত হল কথাগুলো, ফিসফিস করে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল নন্দিতা।

আগেকার দিনের নাইটদের ভঙ্গিতে তার পায়ের কাছে এক হাঁটু ভেঙে বসে অভিজিৎ মাথা ঝেঁকে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়া জানি না, জানি না। তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। কথা দাও আর তুমি হারিযে যাবে না আমার জীবন থেকে।'

মোহাচ্ছন্নের মত নন্দিতা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যাব তোমার কাছে, আমি চিঠিটা দেখব।'

হাতটা মুঠোয় ভরে নিল অভিজিৎ, আমি গ্রেট ইস্টার্নে উঠব, সাতদিন থাকব, এখন যদিও আসানসোল থেকে আসছি, আসলে বম্বে আমার কর্মস্থল, সেই যে তোমাকে না পেয়ে কলকাতা ছেড়েছিলাম, সাত বছর বাদে এই আবার ফিরছি। আর পথেই তুমি। কি আশ্চর্য! সে উঠে দাঁড়াল। বন্দনা তোমাকে কি বলেছিল আমি জানি না, চিঠি পড়লে সবই তুমি বুঝতে পারবে। এটাও দৈব যে চিঠিটা আমার সঙ্গে আছে। মনেই ছিল না, আসার আগে স্যুটকেশটা গুছোতে গিয়ে দেখি তার পকেটে কখন থেকে গেছে ওটা। ভাবলাম আছে থাক; এও তো তোমারই চিহ্ন। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবার জন্য কি তোমার সাক্ষীসাবুদের দরকার ?'

'না।'

'তবে ?'

'বিয়েটা তো সাক্ষীসাবুদ ডেকেই হবে, হয়তো তখন কাজে লাগবে ওটা।'

প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে নন্দিতা দেখল, তার বাবা উৎসুক চোখে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। গাড়ি নিয়ে এসেছেন বোধহয়। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে শান্তভাবে বলল, 'যাই, আমি কাল সকাল আটটায় পৌঁছে যাব তোমার কাছে। বেশি বেলায় উঠ না। ঘরের নম্বরটা দাও।'

'নম্বরটা এখনও জানি না—' দ্রুত গলায় বলল অভিজিৎ, 'পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি কিন্তু ঠিক এসো।'

তা এল। আসবার আগে ঐ সকালেই একখানা চিঠি লিখল সে।

বন্দনা, তোর ওখানে সাতদিন কাটিয়ে অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরেছি। টুকুন ফুটকুনের জন্যে খুব মন কেমন করছিল। আশা করি ফুটকুন সেরে উঠেছে, টুকুনও আর মাসির বিরহে তেমন কাতর নেই।

তোর ডাক্তার সাহেবটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু বিয়ে আমি অভিজিৎকেই করব। ট্রেনে তার সঙ্গেই কলকাতা এলাম। এখন নিশ্চয়ই তোর কোন আপত্তি হবে না। একটা চিঠির কথা বোধহয় তুই ভুলে গিয়েছিস। বোকা মেয়ে! খুনের আগে কখনও কি এ-রকম কোন প্রমাণ রাখতে হয় ? ভাল থাকিস।

ন্যায় অন্যায়

'আরেঃ! আসুন, আসুন। কী আশ্চর্য! এইমাত্র দিদির কাছে আমি আপনার কথা বলছিলাম।'

'দিদি!'

'আমার দিদি! চেনেন না? চেনেন তো। শর্মিষ্ঠা সেন, তখন তো আপনিও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।'

'ও শর্মিষ্ঠা সেন? নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই চিনি। তিনি এসেছেন বুঝি?'

'মাত্র দুদিনের জন্য। ভিয়েনা থেকে আসছে। যাবে কলকাতা।'

'ও, ওঁরা আজকাল ভিয়েনাতে আছেন?'

'দয়া করে দিল্লীতে নেমে ভগ্নির বাড়িতে পদার্পণ। রাগ ধরে কি না বলুন তো?'

'খুব। তা রেখে দিন না কদিন।'

'আসবে কিনা।'

'কেন আসবেন না?'

'আবার মা যে ওদিকে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে।'

'ট্রাঙ্ক কল করে দিন।'

'মার মন খারাপ হবে যে।'

'তাহলে দিদির সঙ্গে আপনিও কলকাতা ঘুরে আসুন। সে তো আপনার জল ভাত। রোজই তো যাচ্ছেন।'

'না মশাই, মোটেও রোজ যাই না। সকলেই আপনারা বিপক্ষে।'

'কেন, আমি আবার কবে বিপক্ষে হলুম। বরং একটু বেশিই তো পক্ষে সর্বদা।'

'তাই না আরো কিছু। নিরঞ্জন কী বলে জানেন?'

'সেটা ভিতরে গিয়ে শুনলে হয় না? নাকি দরজা থেকেই বিদায় দেবেন।'

'ও মা, তাই তো! তাই তো! আসুন, আসুন।'

এতক্ষণে পারমিতা দরজাটা সম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়ে বিকাশরঞ্জনকে আসবার রাস্তা প্রশস্ত করে দিল। সুসজ্জিত বৃহৎ ড্রইংরুম পেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চলুন, লনে গিয়ে বসি, ওরা ওখানেই আছে।'

দিল্লীর উপকণ্ঠে সুন্দর এই বাড়িটি, এ বাড়ির লন বাগান বিখ্যাত। পারমিতার স্বামী নিরঞ্জন চৌধুরী এ বিষয়ে উৎসাহী, এবং অধৈর্যহীন। মালিদেরও খাটান নিজেও খাটেন। তিনি ফুল চেনেন, গাছ চেনেন, মাটি চেনেন।

স্ত্রীর সঙ্গে বিকাশরঞ্জনকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, 'ডক্টর নাগ? আমার কেমন মনে হচ্ছিলো স্বদেশ খাস্তগীর।'

বিকাশরঞ্জন আসন গ্রহণ করলেন, হেসে বললেন, 'ডক্টর খাস্তগীরকেই বোধহয় মনে মনে চাইছিলেন। আমি আসতে একটু হতাশ হলেন।'

নিরঞ্জন চৌধুরী শব্দ করে হাসলেন, 'কাকে চাই আর কাকে চাই না তা আপনি ভালো করেই জানেন।'

'ওঁর কি আজ এখানে আসার কথা?'

'না না, উনি আসবেন কখন? সময় কোথায়? নতুন ডিরেক্টার এসেছেন না? সেখানে তেল মাখাচ্ছেন না?'

দুজনেই একসঙ্গে হাসলেন। পারমিতা বললো, 'দিদি, বিকাশরঞ্জন, সেই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হওয়া ছেলে। তোমাকে বলেছিলাম, এখন এখানে ইতিহাসের চেয়ারম্যান হয়ে এসেছেন।'

'আমি চিনতে পেরেছি।' শর্মিষ্ঠা মৃদু হাস্যে নড়েচড়ে বসে যুক্তকর হলো।

'আমিও দেখেই বুঝতে পেরেছি।' বিকাশরঞ্জনও যুক্তকর হলেন।

'ভালো আছেন?' আলাপ করলো শর্মিষ্ঠা।

'আপনারা তাহলে এখনো বাইরে বাইরেই ঘুরছেন?'

'নিশীথের খেয়াল।'

'ও কেমন আছে?'

'ভালো।'

'প্রথমে তো রাষ্ট্রপুঞ্জের চাকরি নিয়ে গেল, এখন?'

'ছেড়েছে। এখন আছে একটা সংবাদপত্রে। এটাও ছাড়বে ছাড়বে করছে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমি সোজাসুজি আপিসের কেরানি।'

পারমিতা বললো, 'দিদির ধারণা ছিলো আপনি এখনো লন্ডনেই আছেন।'

বিকাশরঞ্জন হাসলেন, 'না, সে পাট চুকিয়েছি।'

'দিদির আরো একটা ধারণা, আপনি নাকি খুব ফর্সা।'

'ভালোই তো। তা দিদির বোনের কি ধারণা?'

'ও মা, আপনি আবার ফর্সা কোথায়?'

'নই বুঝি?'

'কিন্তু আপনার ঝোঁক সব ফর্সা মেয়েদের দিকে।'

'কে বললো?'

'কে আবার বলবে? আমি দেখিনি? কলেজে আমাদের দলটা একটু কালো ছিলো বলে আমাদের দিকে তাকাতেনই না ভালো করে।'

'কী তাজ্জব কথা।'

'যত বন্ধু ঐ সাদা মালিনী।'

শর্মিষ্ঠা হেসে ফেললো, 'কী রে, তুই জেলাস ছিলি নাকি? বেশ রাগ রাগ ভাব?'

'মোটেও না।' পারমিতা মুখ ঝাঁকালো, তার বেঁটে করে কাটা ঘন ঝাঁকড়া চুলে ঢেউ উঠলো।

'তোর প্রতিবাদটাই কিন্তু তোর বিপরীত সাক্ষী দিচ্ছে। কী বলো নিরঞ্জন?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

বিকাশরঞ্জন বললেন, 'কিন্তু কালোর দল বলে আপনাদের দিকে তাকাতাম না এই তথ্যটি আপনি কোথায় পেলেন, বলুন তো ? দলটা কী রকম ছিলো তা যদিও মনে নেই, তবে দলটিকে যিনি চালনা করতেন তাঁকে তো এই মুহূর্তেও দেখছি, সুতরাং বিস্মৃতির কারণ নেই কোনো। অন্তত তিনি তো কালো নন।'

'নই বুঝি ?' পারমিতা সরল গলায় হাসলো, 'শোনো দিদি, শোনো নিরঞ্জন, ডক্টর নাগ কী বলছেন।'

নিরঞ্জন চৌধুরী হেসে বললেন, 'আমার আর শুনে কী হবে ? তুমিই ডবল কান হয়ে শোনো।'

শর্মিষ্ঠা বললো, 'ডবল কান কেন, তুই চার কান হয়েই শোন। আমরা ততক্ষণ ঘুরে আসি। চলো নিরঞ্জন।' উঠে দাঁড়ালো।

'আপনারা বেরুচ্ছেন ?' বিকাশরঞ্জনও উঠে দাঁড়ালেন।

'আর বলেন কেন, দিদিটা এখানে এসেও একটা প্রেমিক খুঁজে বার করেছে, বলছে ছাত্রজীবনের বন্ধু। উহ্, কত যে ওর বন্ধু তার আর সীমা নেই।'

'আপনি চিনবেন তাকে— ?' বিকাশরঞ্জনের দিকে তাকালো শর্মিষ্ঠা, 'আমাদের কলেজেই পড়তো, অহিভূষণ মিত্র, গোয়েঙ্কা কলেজেও পড়াতো। আপনিও তো প্রথম গোয়েঙ্কা কলেজেই ছিলেন, না ?'

'আপনারা যখন বিয়ে করলেন, আমি তখনই সদ্য ঢুকেছি ওখানে। অহিভূষণ নামটা চেনা চেনাই লাগছে।'

'ফিলজফিতে ছিলো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'আপনি যে পরে প্রেসিডেন্সিতে এসেছিলেন, আমরা জানতামই না। মিতুই খানিকক্ষণ আগে সব সংবাদ সরবরাহ করেছিলো।'

নিরঞ্জন এগিয়ে গেলেন গাড়ি বার করতে।

বিকাশরঞ্জন পারমিতার দিকে তাকালেন, 'আপনি যাচ্ছেন না ?'

'আমি ? তবেই হয়েছে। যাচ্ছে বন্ধুত্ব করতে, আমাকে নিলে তো একেবারে হংস মধ্যে বকো যথা।'

'তা, তোর স্বামী তো যাচ্ছে পাহারা দিতে।'

'পাহারা ! কে কাকে পাহারা দেয়। সেই অহিভূষণ ব্যক্তিটির স্ত্রী নাকি আবার নিরঞ্জনের বোন না ভাগ্নি না কী মাথামুণ্ডু। আসলে কিছুই না, এক কালের প্রতিবেশিনী। যাও বাবা যাও ঘুরে এসো। দয়া করে তাড়াতাড়ি এসো।'

'বেশ তো, আমরা না হয় প্রেম করতেই যাচ্ছি, তোকেও তো বন্ধুহীন করে রেখে যাচ্ছি না ? সেই সাদা মালিনীকে নিয়ে এখন যত খুশি ঝগড়া কর।'

হাসতে হাসতে বিকাশরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিল শর্মিষ্ঠা, 'চলি, আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এলেন বিকাশরঞ্জন, 'বসবো ? না কি কাজে ব্যস্ত ?'

পারমিতা ভ্রূকুটি করলো, 'আহা !' তারপর চা আনতে গেল।

পারমিতা যতক্ষণে চা নিয়ে এলো, বিকাশরঞ্জন বসে রইলেন একা একা। সুন্দর চাঁদ উঠেছে, ফুটফুট্ করছে জ্যোৎস্না, গোলাপ ফুলের গন্ধে বাগান ভরপুর। নিরঞ্জন চৌধুরী এ বছর গোলাপই করেছেন বাগান ভর্তি। আর তার উপরে চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায় বিকাশরঞ্জনের মনটা কোথায় উধাও হয়ে গেল।

অনতি পরেই চা নিয়ে এলো পারমিতা, 'কী ভাবছেন ?'

'আপনার দিদির কথা।'

'ওরে সব্বোনাশ !'

'ওঁর চেহারা কিন্তু খুব বেশি বদলায়নি। আমার এক বছরের জুনিয়ার ছিলেন, কিন্তু নিশীথ আমার সহপাঠী ছিলো।'

'তাই নাকি ? আপনি নিশীথদার সহপাঠী ছিলেন ?'

'বি. এ. পাস করেই অক্সফোর্ডে চলে গেল, তারপর থেকে তো বিদেশে বিদেশেই ঘুরছে, মাঝখানে এসে একবার বিয়ে করে গেল—'

'সত্যি, দিদিটা কী তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিল, না—'

'পৃথিবীটা খুব বড় নয়।'

'নয়ই তো। কেমন ঘুরে ফিরে সব দেখা হয়ে যায়।'

'আপনার দিদিকে দেখে হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আপনিও দিদির প্রেমিক ছিলেন।'

'সব যুবকই সব যুবতীর প্রেমিক। আর আপনার দিদি তো কলেজের মক্ষীরাণী ছিলেন। তা নিয়ে আর বচসা করে লাভ কী ? তবে নিশীথ বা হিমন্ময় যে অর্থে প্রেমিক, আমি সে অর্থে নই।'

'হিমন্ময় ! হিমন্ময় কে ?'

'সবাই আমরা সহপাঠী, শুধু বিষয়টাই আলাদা। নিশীথ ইকনমিক্সে, আমি হিস্ট্রিতে আর হিমন্ময় ইংরেজিতে। কিন্তু নিশীথের সঙ্গে হিমন্ময় হেরে গেল, অত 'সংস্কৃতি সম্মেলন' করেও বেচারা কিছু করতে পারলো না।'

'আর আপনি ?'

'আমি ? আমি গলি ঘুপচির মানুষ, ঐ রাজপথে হাঁটার সাহস আমার ছিলোই না।'

'আহা !'

'তা যদি থাকতোই তা হলে দিদির বোনটির সঙ্গেই কি এই শহরে এসে প্রথম বন্ধুত্ব হয় ?'

'তখন যে মাস্টারমশাই।'

'সে জন্যেই তো বেশি সুযোগ।'

'কিন্তু আপনি একদিন আমাকে ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি ?'

'একটা শিরীষ গাছ ছিলো না লাইব্রেরির কোণে ? আমি মৃদুলা আর সর্বাণী একটা ফুলওলা ডাল ধরবার জন্য লাফাচ্ছিলাম, গাছটা কী রকম নিচু নিচু মত ছিলো, মনে আছে ?'

'আছে বৈকি।'

'আপনি যাচ্ছিলেন, তাকালেন, হাসলেন, তারপর ডালটা হাত বাড়িয়ে ভেঙে আমার হাতে দিলেন। আমার যা গর্ব হচ্ছিলো না।'

'গর্ব হচ্ছিলো বুঝি ?'

'হবে না ?'

'কেন ?'

'কেন আবার কী ? একজন প্রফেসরের এত পক্ষপাত ?'

'পক্ষপাত ?'

'আর তো কারো হাতে দেননি। অবশ্য আমিই সামনে ছিলাম তাই যাকে কাছে পেলেন তাকেই দিলেন। কিন্তু আমি বললাম, না বাপু, ওটা পারপাস্‌লিই আমাকে দেওয়া।' পারমিতা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চোখে মুখে হাসতে লাগলো।

চুপ করে থাকলেন বিকাশরঞ্জন। পরে বললেন, 'ঘটনাটা মনে রাখার জন্য ধন্যবাদ।'

'আপনার আবার ধন্যবাদ কিসের ? আমারই তখন সেটা দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আপনি মোটে দাঁড়ালেনই না। তারপরে—না থাক, বলবো না।'

'বলুন না।'

'দূর! সে কবেকার কথা।'

'বলুন না।'

'ভাবলাম এই ধন্যবাদ দেওয়ার ছুতোয় আপনার সঙ্গে গিয়ে বেশ আলাপ করে আসি।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

'কেন এলেন না ?'

'যা গম্ভীর, সাহসই পেলাম না।'

'গম্ভীর ?'

'আমাকে দেখলেই চোখ অন্যদিকে, সাধ্য কী সেই চোখে চোখ ফেলে একটু হাস্য বিনিময় করি।'

'অমন বিদ্যুতের সামনে পড়ে গেলে কোনো মানুষই মাথা ঠিক রাখতে পারে না।'

'ঈশ্‌। কথায় একেবারে মধু।'

'সত্যি কথা।'

'আমি ভাবতেই পারি না সেই আপনি আর এই আপনি এক মানুষ।'

'বদলে গেছি ?'

'বিলকুল। কে বলবে এক সময়ে ছাত্রী ছিলুম। এক সময়ে এই মাস্টারমশায়টি ভুলেও ফিরে তাকাননি।'

'ফিরে না তাকানোটাই দেখেছেন, কেন তাকায়নি তা কেন ভাবেননি কখনো ?'

'ঐ তো বললাম, কালো মেয়ে আপনার পছন্দ নয়। পাঞ্জাবি মেয়ে ফর্সা মালিনীর সঙ্গে আপনার প্রেম।'

'প্রেম! মালিনীর সঙ্গে প্রেম ? হায় ভগবান।'

'সারাক্ষণ তো একসঙ্গে।'

'বা রে, আমার সহকর্মী না ? মালিনীও তো হিস্ট্রি পড়াতো।'

'তা হলেই একসঙ্গে ঘুরতে হবে?'

'একসঙ্গে কি শুধু মালিনীর সঙ্গেই ঘুরতুম? আর কাউকে দেখেননি?'

'তারপর যখন শুনলুম বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছেন—'

'সে কি! এও রটেছিলো নাকি?'

'শুনে যায় রাগ হলো না!'

'রাগ কেন?'

'এখানে মালিনী খান্না, আবার বিলেতে গিয়েই মেম দেখে মূর্ছা—'

বিকাশরঞ্জন হাসলেন।

পারমিতাও হাসলেন। বললো, 'আসলে বেশ কষ্ট হয়েছিলো।'

'মালিনী খান্নার জন্য এত দরদ?'

'মোটেও মালিনী খান্নার জন্য নয়।'

'তবে?'

'বাঃ, অত সুন্দর একজন যুবক মাস্টারমশাই, বলা নেই কওয়া নেই অন্যের গলায় মালা দিয়ে দিলে কষ্ট হবে না?'

'তাই নাকি? এ রকম একটা কষ্ট কারো হতে পারে জানলে তো দেখছি জীবনের ছবিটা একেবারেই বদলে যেতো।'

'তা হলে ঐ রটনাটা সর্বতোভাবেই মিথ্যে?'

'কোন্ রটনা?'

'বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছেন, ছ'মাসের মধ্যে ডিভোর্স করেছেন—'

'লোকেদের কি খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই?'

'আমি তো কদ্দিন নিরঞ্জনকে বলেছি, এখন তো মাস্টার নন, এখন তো বন্ধু, একদিন জিজ্ঞেস করি না, এক ধমক লাগিয়ে দিয়েছে, বলে ও সব ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাজে কথা কক্ষনো বলবে না।'

'তা হলে এতদিনে জানলেন যে কথাটা একান্ত মিথ্যে?'

'কে রটিয়েছিলো জানেন? পূরবী। পূরবী চট্টোপাধ্যায়। মনে নেই পূরবীকে? ওর বাবা তো আপনাকে জামাই করতে চেয়েছিলেন। আর পূরবীরও মনে মনে খুব ইচ্ছে ছিলো। কেন বিয়ে করলেন না?'

'আপনার কষ্ট হতো যে।'

'আমার কেন কষ্ট হতে যাবে?'

'ঐ যে বললেন, বিলেতে বিয়ে করেছি শুনে কষ্ট হচ্ছিলো।'

বাতাসে হাসি ছড়িযে পড়লো পারমিতার, 'ফাজিল। মাস্টার হয়ে ছাত্রীর সঙ্গে ইয়ার্কি, না? আর সেই দুঃখে তো একেবারে চিরকুমার হয়ে বসে আছেন।'

'কুমারত্বের আয়ু মানুষের অচিরেই ধূলিসাৎ হতে পারে। কিন্তু প্রেমের আয়ু অখণ্ড।'

'ওরে বাবা আবার প্রেম-টেম এনে ফেলছেন দেখছি।'

'আজকে আপনার দিদিকে দেখে আমার অনেক পুরোনো ছবি মনে পড়ে গেল।'

'জানি জানি, ঐ নিশীথদা আর হিমঘ্নর মত আপনিও দিদির একজন প্রেমিক ছিলেন।'

'না।'

'তবে দিদিকে দেখে এমন স্মৃতির সমুদ্র উথলে উঠলো কেন?'

'জানি। তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুব প্রখর ছিলো।'

'আবাব ফাজলামি।'

'নইলে তখুনি কী করে বুঝলেন—'

'উঃ। শুনুন—'

'বলুন।'

'আমাকে নাম ধরে ডাকবেন।'

'নাম ধরে ডাকবো ?'

'আমি তো আপনাকে বিকাশরঞ্জনই বলি। আপনাদের সায়েন্সের প্রফেসর ডক্টর কার্লেকারকে মধু বলি—'

'মধু ! হানি ! ঈশ্ !'

পারমিতা আবার হাসতে হাসতে মরে গেল, 'আরে না না, আপনাদের বিলিতি অর্থে 'হানি' নয়, মধু, মধু। অর্থাৎ ওঁর নাম মধু।'

'তাই বলুন। বাঁচা গেল।'

'তারপর ফিলজফির ডক্টর সিংকে রমিন্দর বলি—'

'আপনাকে সবই মানায়।'

'আর আপনি তো আমার মাস্টারমশাই-ই ছিলেন। যদিও ডিরেক্ট নয়—'

'তা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রজ্ঞাটা ছাঁটলো কে ?'

'আমি, আবার কে। আপনি কি ভাবেন আমার কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই ? আমার বাবা কী বললেন জানেন ?' হাসলো।

'কী ?'

বললেন, 'প্রজ্ঞাটা ছেঁটে জীবনে ঐ একটাই সুবুদ্ধির কাজ করেছো। মাকে বললেন, তোমার কন্যা সম্পর্কে উচ্চাশাটা কিছু বেশি হয়ে পড়েছিলো এখন ঠিকঠাক হলো বটে তবে, পারমিতা শব্দটার আর মানে রইলো না কোনো।'

'তখন ?'

'ব্যস, আর যায় কোথায় ? মা বললেন প্রজ্ঞা থাক, পারমিতা যাক। আমি মাকে বোঝালাম, বাবার কথায় কান দিও না, আমার যখন প্রজ্ঞাই নেই তখন অভিধান খুঁজে পারমিতার অর্থ খুঁজে আর বেশি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দরকার নেই। মোট কথা আমি প্রজ্ঞা থাকবো না। তা নিয়ে কী ধস্তাধস্তি। শেষে দেখা গেল ঠাকুরবাড়ির কোন বউয়ের নাম প্রজ্ঞাসুন্দরী, অব্যাহতি পাওয়া গেল।'

'আর কারো নাম থাকলে বুঝি সে নাম আপনার হতে পারে না ?'

'ঠিক তা নয়, তবে ঐ আর কি। আসলে সব বাবা মা-ই চান তাদের সন্তানদের সব নির্মিত নাম হবে, মানে, যে নাম আর কখনো কেউ রাখেনি।'

'যা দেখছি ছোটো মেয়ের বেলাতেই আপনার বাবা মা বেশি সচেতন। প্রজ্ঞাপারমিতা নামটি সত্যিই বিশেষ, কিন্তু শর্মিষ্ঠা—'

'ও বাবা, এ নাম আমার দাদামশায়ের দেওয়া যে, তিনি আবার মধুসূদনের একনিষ্ঠ ভক্ত।'

'তা হলে কিন্তু আপনার নাম শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মিলিয়ে তন্নিষ্ঠা রাখা উচিত ছিলো।'

'ও মা, কী সুন্দর নামটা। ঈশ, তখন কেন আপনার সঙ্গে দেখা হলো না। তন্নিষ্ঠা

মানে তো তৎ নিষ্ঠা, অর্থাৎ তাঁতে যার নিষ্ঠা। আহা রে, কী সুন্দর নামটা। ঠিক আছে, আমার একটা মেয়ে হলেই নামটা নিয়ে নেবো।'

'চুরি করবেন না, দয়া করে বলে দেবেন এই নামকরণের গড ফাদারটি কে?'

'ভারি তো একটা নাম বলেছেন, তার অহংকার কত।'

'গরিবের কানাকড়িই সম্বল। কিন্তু এবার বোধহয় আমার ওঠা উচিত।'

'কেন?'

'আর কতক্ষণ?' .

'অনেকক্ষণ হয়েছে বুঝি?'

'মন্দ কী!' ঘড়ি দেখলেন, 'আপনার কাছে এলে তো আমার সময়ের জ্ঞান থাকে না।'

'তাই নাকি?'

'হুবহু তাই।'

'তা হলে গল্পটা বলুন।'

'কিসের গল্প?'

'যার যোগ্য হবার জন্য বিলেতের গন্ধ মাখতে গিয়েছিলেন—'

'জীবনে দুটো একটা কথা গোপন থাকা ভালো।'

'বলুন না বাবা—'

'মানুষের একান্ত বলেও তো কিছু থাকা উচিত?'

হঠাৎ হাসিখুশি পারমিতা একটু অন্যমনস্ক হলো। একটু পরে বললো, 'আপনার যাবার দিনটা আমার খুব মনে আছে।'

'আমার ফেয়ারওয়েলের দিন আপনি যে গানটা করেছিলেন মনে আছে সে কথা?'

'স্মৃতি কি আমার এতই দুর্বল?'

আমি কিন্তু ফিরে এসেই আপনার খোঁজ করেছিলাম।'

'তা হলে ভুলে যাননি?'

'সম্ভব হলে ভুলতাম, পারা গেল কই?'

'ঈশ্!'

'তিন বছর বিলিতি ছেলেমেয়েদের মাস্টারি করে আমার অকারণ সংকোচের আবরণ অনেকটাই খুলে গিয়েছিলো, আত্মবিশ্বাসের যে অভাবে একদা ইংরেজ আমলের একজন জাঁদরেল আই. সি. এস কন্যার সম্মোহনে মরে গিয়েও একদিন মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পাইনি, গটমটিয়ে চলে গেলুম তাদের বাড়ি।'

'তা হলে বিলেত আপনাকে বেশ ধুয়ে মুছে দিয়েছিলো?'

'তা দিয়েছিলো। অন্তত এ কথাটা ভুলতে পেরেছিলাম, বণিকের পুত্র হওয়াটা কিছু লজ্জার নয়। আমার বাবা চালের ব্যবসায়ী ছিলেন, পরিবারটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো এটাও যেমন সত্য কথা আমাকে যে অতি যত্নে মানুষ করেছিলেন সেটাও তেমনি সত্য কথা।'

'তাই তো।'

'আমাকে তো তিনি চোদ্দ বছর বয়সেই গদিতে বসাননি, বসালে কী করতে পারতাম বলুন?'

'তাই তো।'

'আপনার মা বাড়ি ছিলেন না, উনি ছিলেন। গেট খুলে বাগান পেরিয়ে বেল দিতে উনিই খুলে দিলেন, অবশ্য চিনতে পারলেন না। কী করে পারবেন ? আর তো কখনো যাইনি, আর তো কখনো দেখেননি আমাকে ?'

'কী বললেন বাবা ?'

'নিজের পরিচয় নিজেই দিলুম, খুব আদর সমাদর করলেন। আপনি যে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন, বললেন সে কথা। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গেছেন সেটাও শোনা হল—'

'তারপর ?'

'দুই মেয়েই ভারতবর্ষের বাইরে সেটা বোধহয় পীড়া দিচ্ছিলো মনকে, হাসতে হাসতে বললেন, এত একা হয়ে গিয়েছি মেয়ে দুটো চলে গিয়ে—'

'সত্যি !'

'আমি নির্বোধের মত মুখ করে বসে থেকে সব শুনলাম, চা খেলাম, কেক খেলাম, তারপর আলগা আলগা হেসে ফিরে এলাম।'

'তারপর ?'

'তারপর আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলো।'

'কেন ?'

'সেটা আপনি নিজের মনেই ভেবে দেখুন না।'

'না মশাই, আমার কল্পনাশক্তি অত প্রবল নয়।'

'আচ্ছা বলুন তো, ফেয়ারওয়েলের দিন কোন গানটা করেছিলেন ?'

'স্মরণশক্তির পরীক্ষা ?'

'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো।'

'এ রাম কী সব বলছি—'

'ঠিক কিনা ?'

'সবাই শুনতে চাইলো যে—'

'সবাই ঐ গানটা আপনার মুখে শুনতে চায় ?'

'আমি মায়ার খেলায় শান্তার পার্ট করেছিলাম, না ? আপনি তো টিকিট কিনেছিলেন।'

'আপনি করবেন আর আমি টিকিট কিনবো না, তা হয় ?'

'থাক থাক কেবল ইয়ে। ওটা ফেয়ারওয়েলের অন্তর্গত গান ছিলো না, বুঝেছেন ?'

'না, বুঝিনি।'

'কেন বোঝেননি ?'

'ওটা বুঝলে আমার চলতো না।'

'আবার বাজে কথা। যতক্ষণ ফেয়ারওয়েল চলছিলো আমি অন্য দুটো গান গেয়েছিলাম। শেষ হয়ে যাবার পরে যখন সবাই ধরলো—'

'সে এখন যে কৈফিয়তই দিন না কেন, ঐ গানখানা সম্বল করেই সাগর পাড়ি দিয়েছিলাম আমি।'

'ধ্যেৎ !'

'লক্ষী ছেলের মত তিন বছরেই কাজটি সেরে চলে এলুম। আর এসে যখন দেখলুম খাঁচা শূন্য, চিড়িয়ারাণী ভাগ গিয়া—'

'উঃ কে বলবে প্রেসিডেন্সি কলেজের সর্বকনিষ্ঠ সেই সুশ্রী সুবেশ লাজুক প্রফেসরটি আর এই ব্যক্তি একই বিকাশরঞ্জন।'

'বদলেছি নাকি?'

'বদলাননি?'

'কোথায় বদলেছি বলুন তো?'

'আপনার লজ্জা নিয়েও আমরা নিজেদের মধ্যে কত ঠাট্টা করতাম।'

'অথচ কিছু কম লজ্জা থাকলে সব কেমন অন্যরকম হয়ে যেতো।'

'চিড়িয়ারাণীটি তাহলে আর ভেগে যেতে পারতো না, না?'

'ঠিক।'

'মনের দুঃখে তখন কী করলেন?'

'অন্ধকারে শুয়ে থাকলুম, সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করলুম, সমুদ্রের ধারে বিরহ যাপন করতে গেলুম, তারপর আবার মনস্থির করে পুরোনো চাকরিতেই ফিরে গেলুম লন্ডনে।'

'সেই থেকে টানা এতদিন ছিলেন?'

'ঐ ছুটিছাটায় যতটুকু আসা—।'

'চিড়িয়ারাণীটি কি মরে গিয়েছিলো? তার কি কোনো ঠিকানা ছিলো না?'

'থাকলে?'

'একটা চিঠি লিখতে পারতেন।'

'চিঠি! না, বিলিতি জল যতই ধুয়ে মুছে দিক না, তখনো সাহস অতখানি অগ্রসর হয়নি যে একটা চিঠি লিখে ফেলতে পারি।'

'ভীতু।'

'ভীষণ।'

'কিন্তু চিড়িয়াটির চোখ মুখ দেখে কি আপনি কোনোদিনই কিছু বুঝতে পারেননি?'

'ম্যাডাম, তার প্রতি প্রেম আমার এতই অদম্য ছিলো যে মুখ চোখ দেখবো কি দূর থেকে সে আসছে দেখলেই বুকের মধ্যে এমন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকতো যে পাশ দিয়ে যখন চলে যেতো, সেই বাতাসটুকুর ঘায়েই মূর্ছা যেতাম।'

'তাই না, আরো কিছু।'

'তারপর ক্লাসে গিয়ে কি আর পড়াতে পারি? কেবল জল খাই আর জল খাই, প্রাণ যাবার দশা।'

'সেই পাখিটির তা হলে সেই কলেজের গণ্ডিতেই গতিবিধি ছিলো?'

'ধরা পড়েছি যখন মিথ্যে বলে আর লাভ নেই।'

'সে পাখির নাম কী?'

'একেবারে তোতা; সকলের সঙ্গেই তার হাসি, গল্প, গান। বাদে আমি।'

'আহারে—'

'তার মনটা যেন সারাদিন আকাশে উড্ডীন থাকতো। চোখ দুটি যেন দু চামচে নীল জল।'

'সেই জলে কার ছায়া ভাসতো?'

'কে জানে! একটি শিরীষ ফুলের ডাল এগিয়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম বসবে।'

'বসলো না?'

'না।'

'আমি কিন্তু অন্য কথা জানি।'

'কী কথা?'

'একটি নিষ্ঠুর লোকই তাকে ভুলে, অনেক দূরে চলে গেল একদিন।'

'তাকে ভুলে?'

'দিন যায় রাত যায় মাস যায় ঋতু যায়, আর সে ফেরে না।'

'তারপর?'

'আর পাখির কিছুই ভালো লাগে না—'

'তারপর?'

ততদিনে তার পাঠ সমাপ্ত হলো, বিরহের পাথারে ডুবে যেতে যেতে একটা জাহাজের মাস্তুল পেয়ে পাড়ি দিল সমুদ্র।'

'ঈশ্‌শ্‌—'

'জাহাজ গিয়ে একদিন যে মাটিতে ভিড়লো সেই নিষ্ঠুর লোকটি সেখানেই ছিলো।'

'তবে কেন সে একবার তার সেই দুঃখী অক্ষম লাজুক আত্মবিশ্বাসহীন বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করলো না?'

'কেমন করে দেখা করবে?'

'কেন? সে তো জানতো কোথায় আছে সে। আসবার আগে তা তো সে সকলকেই জানিয়ে এসেছিলো।'

'জানতো, কিন্তু ততোদিনে শোনা গেছে স্বদেশের তোতা ময়না নয়, বিদেশের দামী পেঙ্গুইন এসে গেছে তার ঘরে।'

'কী মিথ্যে, কী মিথ্যে।'

'সুতরাং দিশি তোতা চোরের মত সেই মাটি ছুঁয়ে চলে গেল অন্য দেশে।'

'আশ্চর্য! সত্যি কি মিথ্যে সেটা একবার প্রমাণ চাইতে পারলো না?'

'অবধারিত ভাবেই সে কথা সে বিশ্বাস করেছিলো।'

'খুব অন্যায়। তারপর?'

'তারপর আমার কথাটি ফুরালো নটেগাছটি মুড়োলো।'

'না, নটেগাছটি মুড়োয়নি।'

'তবে?'

'আবার যবনিকা উঠলো অনেক বছর বাদে—'

'তখন?'

'আবার দেখা হলো তাদের। কিন্তু সম্পূর্ণ এক অন্য পরিবেশে, অন্য শহরে, অন্য অবস্থায়।'

'যখন দুজনেই বয়স্ক—'

'হ্যাঁ। ছেলেটি অবাক হয়ে বললো, আপনি!'

'মেয়েটিও অবাক হয়ে বললো, আপনি!'

'মেয়েটি ঠিক সেই রকমই আছে, তেমনি সরল, সহজ, আনন্দে সারল্যে ভরপুর, এবং আর একটু বেশি সুন্দর।'

'আর ছেলেটি উত্তর চল্লিশে পৌঁছে আরো পরিণত, আরো ভদ্র আরো পণ্ডিত।'

'সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যে কাষ্ঠে আগুন ঠিকরে বেরুলো। কতক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা তাপটি চকিত চমকে ছড়িয়ে পড়লো বুকের মধ্যে। আনন্দে বিষাদে তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটির কিছুই হলো না। সে সুখী তার সুখ তার চোখে মুখে সারা শরীরে মাখামাখি। অবশ্য তার চরিত্রই তাই। সরবে সবেগে সে অভ্যর্থনা করলো। দৌড়ে খাবার নিয়ে এলো, চা নিয়ে এলো, আন্তরিক ভাবে খুশি হয়ে উঠলো। ততক্ষণে ছেলেটি তার বিবেক বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা সতর্কতা ইত্যাদি জাগতিক বৃত্তি দিয়ে সংযত করলো নিজেকে, তারপর স্বাভাবিক সহজ হয়ে গল্প করলো অনেকক্ষণ।'

'এতদিন ধরে এত প্রেম! বিশ্বাস কী— ?'

'এতদিন ধরে কেন হবে ?'

'তবে ?'

'ধরুন, একটা কৌটোর মুখ হারিয়ে গেছে, অথচ সেটা ঢাকা দরকার, আপনি কী করবেন ?'

'জানি না।'

'নিশ্চয়ই দেখে শুনে মোটামুটি ঠিক মত আর একটা ঢাকনা যোগাড় করে ফাঁকটা ভরে দেবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর আস্তে আস্তে সেই আসল ঢাকনাটার কথা ভুলে গিয়ে সেটাকেই আদি এবং অকৃত্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ ছেলেটিরও ঠিক তাই হলো। বয়েস বাড়তে বাড়তে ফাঁকটা ভরে নিল একদিন। যে মেয়েটি তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে এলো, বিদেশে সেও তার ছাত্রী ছিলো। বোধহয় প্রথম প্রেম একটি ছাত্রীর প্রতিই প্লাবিত এবং ধাবিত ছিলো বলে, দ্বিতীয় প্রেমাস্পদাও একজন ছাত্রীই হলো, কোনো অভাব বোধও হলো না, জীবন বেশ মসৃণ গতিতেই চলছিলো। যবনিকা না উঠলে জানাই যেতো না পাদপ্রদীপের আলোয় তখনো এত জোর, এত ঔজ্জ্বল্য। পারমিতা—

'বলুন—'

'বুদ্ধির অগম্য বলেও যে কিছু আছে তা কি আপনি মানেন ?'

'বলুন, কী বলতে চান।'

'তা নৈলে আজ যে সাহস আমাকে উদ্বুদ্ধ করলো, সে সাহস তো আমাকে তখনো এই শক্তি জোগাতে পারতো। কেন জোগালো না ?'

পারমিতা সহসা চায়ের বাসন কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

'দিন তো তারপরেও বেশ কাটছিলো, সুখে দুঃখে মধুর বন্ধুত্বর সংস্পর্শে এই শহরের দিনগুলোতে কোনো গ্লানিই ছিলো না বলা যায়। আমার এখানকার অবস্থান প্রায় বছর খানেক হলো, তাই না ?'

'হ্যাঁ—'

'এর মধ্যে আমার কোনো আচরণে কি আমি একদিনও আপনাকে বিরক্ত করার মত—'

'কী আশ্চর্য, বিরক্ত কেন ?' পারমিতা সামান্য হাসলো।

'কিন্তু এই মুহূর্তে একটা দুর্জয় ইচ্ছের চাপে আমার হৃৎপিণ্ড কেন এমন দপ দপ করছে ?'

'এগুলো রেখে আসি, কেমন ?' পারমিতা ট্রেটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বিকাশরঞ্জন সে কথায় কান দিলেন না, নিজের কথার জের টেনে বললেন, 'কোন্‌টা উচিত এবং কোন্‌টা অনুচিত আমি তা জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, মনুষ্য সমাজের ঔচিত্যবোধ, আর ঐশ্বরিক ঔচিত্যবোধ কখনোই এক নয়।'

'বিকাশরঞ্জন—'

'যা বুদ্ধি অগম্য এখন আমি সেই অগম্যেরই শিকার। তার মানে এখন আমি ঈশ্বরের হাতের পুতুল। সত্যি কি না ?'

'জানি না।'

'পাপ পুণ্য ন্যায় অন্যায় এইসব সামাজিক শিক্ষার আবরণ এখন উন্মুক্ত। সেই খোলস থেকে তিনিই আমাকে এই মুহূর্তে এই নির্জন আকাশের তলায় একেবারে মুক্ত করে দিয়েছেন।'

'ভীষণ কবিত্ব করছেন তো।' পারমিতা সহজ হবার চেষ্টায় হাসলো।

'আমি এখন আমার কবিতারই সম্মুখীন।'

'আপনি তারা চেনেন ?'

'ঐ তারার যিনি রচয়িতা তিনিই অলক্ষ্যে বসে আবেগে রোমাঞ্চে প্রেমে আমাকে প্রজ্বলিত করেছেন।'

'সেদিন যে আমাদের ল্যাবরেটরিতে চাঁদের টুকরো নিয়ে আসা হয়েছিলো, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন ?'

'পারমিতা—'

'বলুন—'

'যা সত্য তা সত্যিই।'

'নিশ্চয়ই।'

'যা মানুষের হাতে নেই, তা তো নেই-ই।'

'নেই-ই তো।'

অতএব এই হৃদয়াবেগও আমার হাতে নেই।'

হৃদয়াবেগ আবার কারো হাতে থাকে নাকি ? হৃদয় কি কেউ দেখতে পায় ? ছুঁতে পায় ?'

'ঠিক। এই যে এই মুহূর্তে আমি ঘন ঘন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হচ্ছি, বুকের মধ্যে সেই কলকাঠি তো তিনিই নেড়ে দিচ্ছেন।'

'দিদিকে দেখে আজ আপনার হলো কী ?'

'দিদির বোনটি কেন আমাকে ফাঁকি দিল সেই দুঃখ উথলে উঠলো যে।'

'দিদির বোন ফাঁকি দিয়েছে না দিদির ব্যর্থ প্রেমিকটিই ফাঁকি দিয়েছে ?'

'ব্যর্থ প্রেমিক ! না, কক্ষনো না। আমি কখনো কোনদিন কোন মুহূর্তেও নিজেকে

তাঁর প্রেমিক ভাবিনি। তাঁর বোনকে দেখার আগে কারো দিকেই আমি তাকাইনি। তিনিই আমার প্রথমা, হয়তো শেষতমাও।'

পারমিতা লাল হলো।

'হয়তো এই ভালো হয়েছে, কে জানে—' বিকাশরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন।

পারমিতা তার চরিত্রবিরোধী ভাবে স্তিমিত গলায় বললো, 'কী ভালো হয়েছে?'

'প্রাত্যহিকতা আমাদের জীবনকে সর্বতোভাবেই নিরুত্তেজ আর নিরুত্তাপ করে ফেলে, কখন যে আগুন নিবিয়ে শীতল করে দিয়ে অভ্যাসের দাসে পরিণত করে জানতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। কিন্তু আগুন তো থাকে, সেই প্রেম, যার সমাধি বিবাহে।'

'বিবাহ তার সমাধি?'

'নয়?'

'সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ?'

'এক সময়ে যে লোকটি আপনার আঙুলের ডগাটি ছুঁলেও আপনি শত শিখায় জ্বলে উঠতেন, এখন কি তার তিলতমটুকুও অবশিষ্ট আছে?'

'চুপ করে আছেন কেন? সত্য কথা বলুন।' নিঃশব্দ স্তম্ভিত পারমিতার দিকে এগিয়ে এলেন বিকাশরঞ্জন, মুখোমুখি দাঁড়ালেন, চোখে চোখ রাখলেন, প্রায় ধর্মযাজকের গলায় বললেন, 'আপনি আর পাঁচটি মেয়ের মত সাধারণ নন, দুর্বল নন, সংস্কারাচ্ছন্ন নন, গোপনতাপ্রিয় নন, বলুন ঠিক কিনা।' বলতে বলতে স্বর গাঢ় হলো, নিবিড় হলো বহুদূর থেকে ভেসে এলো কথা, 'যদি আবার শতধারে জ্বলে উঠতে চান, বুকভাঙা সুখে ভেসে যেতে চান, আমি তা দিতে পারি।'

ভীত সন্ত্রস্ত পারমিতা তাড়াতাড়ি চায়ের বাসন রাখতে ঘরে চলে গেল। বন্ বন্ করে পাখা ছেড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। যে সুখ বিকাশরঞ্জন তাকে দিতে চেয়েছিলেন দেখা গেল সেই সুখ তার বুকের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের বেগ দমন করতে ঘেমে উঠছে কপাল।

অনেক পরে যখন সাব্যস্ত হয়ে আবার ফিরে এলো লনে, দেখলো বিকাশরঞ্জন চলে গেছেন। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল গেটের কাছে, চলে গেল গেটের বাইরে, রাস্তায় এলো। নেই। কোথাও নেই। শুধু অনেক দূরে কে যেন মোড় নিল বাঁয়ে। বুকের মধ্যে তখন বিদ্যুৎ। কী অন্যায়।

মাধবীর জন্য

হঠাৎ মাধবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলো। আমি নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে গিয়েছিলাম, দেখি এক ভদ্রমহিলা ওজন নিচ্ছেন দাঁড়িয়ে। ওজন নেবার মতই বটে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন ভদ্রমহিলার যতখানি বাড়া সম্ভব, উনি ঠিক ততখানি বেড়েছেন। আগে লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ চোখে পড়লো। সাহেবি পোশাকে সজ্জিত পুরুষটিকে দেখে, ওঁকে তাঁরই স্ত্রী ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলুম ভদ্রমহিলাটি আমাদেরই মাধবী এবং ভদ্রলোকটি মাধবীর স্বামী। স্তম্ভিত হলাম।

'এ কী বকুল যে—'

'বাঃ, তুমি কোত্থেকে।' এই হল আলাপের সূত্রপাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাধবী আমাকে রেহাই দিলো না, জোর করে নিয়ে এলো ওর বাড়িতে ; বললো, 'আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে, আমি যে একটা অমানুষ বা পাষণ্ড নই, সে-কথা তোমার জানা দরকার।'

বাড়িটি বেশ। একতলা ছোটো বাড়ি, সাজানো-গুছোনো—মাধবীর নিখুঁত হাতের ছাপ সর্বত্র। বছর দশেকের একটি মেয়েকে ও নিয়ে এলো—'মাসিমাকে প্রণাম কর, লক্ষ্মী।'

আমি দুই চোখ মেলে লক্ষ্মীকে দেখতে লাগলাম—দেখতে লাগলাম বললে ভুল হয়, গিলতে লাগলাম, আর আমার চোখের তলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে মরে যেতে লাগলো। অবশেষে দুই হাতে ওকে কোলের উপর টেনে এনে মাথায় অজস্র চুমো খেয়ে বললাম, 'ওকে তো আমার কিছু দেওয়া উচিত, না মাধবী ? আমি হলাম মাসিমা!' হাত থেকে অতি প্রিয় এবং অতি দামী একমাত্র গহনা আমার হীরের আংটিটি ওর কচি নরম আঙুলে পরিয়ে দিলাম। ঢলঢল করতে লাগলো, মাধবী রাগ করতে লাগলো, কিন্তু তবু আমি কিছুতেই আর তা খুলে নিলাম না।

মাধবীর নতুন স্বামীটি দেখলাম বেশ ভালোমানুষ। চা খেতে খেতে সামান্য আলাপ হলো। কথাবার্তায় অতিশয় ভদ্র এবং মার্জিত। চা খেয়েই উনিই বেরিয়ে গেলেন কোথায়। মাধবী এবার ঘনিয়ে বসলো কাছে।—'লক্ষ্মী, যা তো বাবা—তোর মাসির সঙ্গে আমার কথা আছে।' আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগলো। কী বলবে মাধবী, কী কথা আছে ওর ?'

'তুমি নিশ্চয় ভয়ানক অবাক হয়েছো—'

মাথা নেড়ে বললাম, 'বলাই বাহুল্য।'

'তবে যে কিছু জিগ্যেস করছো না ?'

'কিছু একটা হয়েছে।' নেহাত উদাসীনভাবে কথাটা এড়াবার চেষ্টা করলাম। .

'তোমার কী মনে হয় ?' আমার যা মনে হয়েছিলো তা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে যেন হঠাৎ আমি সন্দিগ্ধ হলাম। বললাম, 'তুমি যা বলবে বলো না।'

মাধবী কথা ঘোরালো, 'আমার স্বামীকে তোমার কেমন লাগলো ?'

'ভালোই তো।'

'কে বেশি ভালো—অশোক, না এই ভদ্রলোক ?'

এ নামটা আমার সয় না। শুনলে ভিতরে ভিতরে বিশ্রীরকম একটা যন্ত্রণা হয়। জবাব যে কী দেবো ভাবতে একটু সময় নিয়ে বললাম, 'আমার চেয়ে তা তুমিই ভালো জানো।'

মাধবী একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছর পরে দেখা, এই ক'বছরে যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকে তা কি খুব আশ্চর্য ?' একটু থেমে, 'আর মৃত্যুর পরে যদি আমি বিয়ে করি সেটা কি খুব অন্যায় ?'

মাধবীর কথার ধরনে প্রথমে যে বিষয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম তা ধূলিসাৎ হলো। অশোকের মৃত্যু যে আমার পক্ষে বেদনাদায়ক হবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু সে বেদনা যে এত গভীরেও নাড়া দিতে পারে তা আমি জানতাম না। অনেকদিন আগেকার আরেকটা দুঃখের স্বাদ মনে পড়লো। নতুন করে অভিভূত হলাম। মুখ নিচু করে জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছিলো ওর ?'

'খুব সম্ভব যক্ষ্মা।'

'যক্ষ্মা !'

'বোধ হয়।'

মুখ তুলে বললাম, 'বোধ হয় কেন ? অসুখটা কী তা কি শেষ পর্যন্তও জানা যায়নি ?'

'শেষ পর্যন্ত আমি জানিনে—কেননা আমার যখন সন্দেহ হতে শুরু হলো, তখনই আমি ওকে পরিত্যাগ করে আসি।'

'পরিত্যাগ ?' কথাটা আমার মুখ থেকে যেন সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়লো, 'তবে যে তুমি বললে অশোকের মৃত্যু হয়েছিলো ?'

'পরিহাস করেছি।'

'এ সব নিয়েও কি পরিহাস তোমার আসে ?'

'স্বচ্ছন্দে ! আমাকে নিয়েই বা অশোক কম পরিহাসটা করলো কী ?'

'অশোক বেঁচে আছে ?'

'তাই তো জানি।'

নড়ে-চড়ে সহজ হয়ে বসে বললাম, 'তবে ওর জীবদ্দশায় ওর মেয়েকে তুমি পেলে কী করে ?'

'সেটুকু দয়া করবার উদারতা ও শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিলো আমাকে।'

নিশ্বাস ফেলে নীরবে বসে রইলাম। মাধবী বলতে লাগলো, 'অশোকের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ভাঙা আর জুড়বে না, তালি আর টিঁকবে না। খুব অবাক হবে এবং বিশ্বাসও করবে না হয়তো যে বিয়ের পরে পুরো চার বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম, কিন্তু একদিনের জন্যেও আমরা একসঙ্গে শুইনি। প্রত্যেক রাত্রে একই ঘরে পাশাপাশি খাটে দুজনে দুজনের নিশ্বাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। একদিন আমি সারারাত কেঁদেছিলাম, আর সারারাত চুপ করে বসে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো। আমি বললাম, 'এরকম যন্ত্রণা কি জীবন ভরেই পাবো ?' বললে, 'কেন, আমি তোমাকে কষ্ট দিই, আমি কি ভালো ব্যবহার করিনে ?'

কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'ভয়ানক কষ্ট দাও—ভালো যদি না-ই বাসবে তবে কেন এরকম করলে ?'

বিষণ্ণ মুখে বললো, 'মাধবী, আমি লম্পট, আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু আমারও তো হৃদয় আছে, আমারও তো সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে—অনুতাপ আছে। কয়েকটা দিন, অন্তত আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও—একলা থাকার অবসর দাও—' দুই হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে ও কাঁদতে লাগলো পাগলের মত। আমি হাত ধরে উঠিয়ে বসালাম, শান্ত করলাম—বললাম, 'অশোক, আর আমি তোমাকে পীড়ন করবো না, যেদিন মনে পড়বে আমার কথা সেদিনই তুমি আমার কাছে এসো, আমাকে ডেকো—কিন্তু দায়ে পড়ে ভালোবাসার ভান দেখিও না, সে আমার সইবে না।'

'তার পরদিনই আমি মার কাছে চলে এলাম।'

'টানা ছ'মাস ছিলাম কিন্তু তবুও সে আমাকে ডাকলো না। ফিরে যেতে সে লিখেছিলো, কিন্তু আমি জানতাম সেটা তার একান্তই আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেলে রাখতে তার রুচিতে বেধেছিলো। আমি ফিরে গিয়ে তার একটুও পরিবর্তন দেখলুম না। তবে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে কী হতো জানিনে, কেননা শেষের দিকে আমাকে যেন ও ভালোবাসতে শুরু করেছিলো মনে হতো। কিন্তু আমি তার অবসর দিলাম না। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, শুতে এসে দেখেছি, আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মেয়ে নিয়ে খেলা করছে। বলেছি, 'ওঠো, এবার আমি শোবো।' হাত দিয়ে নিজের পাশে দেখিয়ে দিয়েছে, 'শোও না।' 'ধ্যেৎ'—আমি অমনি প্রতিবাদ করেছি। 'তবে কিন্তু মেয়ে নিয়ে যাবো।' 'অনায়াসে,' সাংঘাতিক ঠাণ্ডাভাবে আমি জবাব দিয়েছি।

'ঈশ,' অশোক হেসে বলেছে, 'মেয়ে যদি সত্যিই নিয়ে যাই তখন আর ফুটুনি খাটবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী মাঝখানে শুয়ে থাক আমি আর তুমি দু পাশে শুয়ে থাকি।'

'পাগল!' আমি আমলেই আনিনি কথাটা।

'নিশ্বাস ফেলে ও উঠে গেছে নিজের বিছানায়, আর আমি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছি কেন আমার এই প্রতিশোধ নেবার এমন দুরন্ত অভিলাষ? বিবেক বলেছে, এত দম্ভ ভালো নয়,—কিন্তু তবু আমি নিজেকে খর্ব করে ওর ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, কেননা এটুকু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতাম এখনো ও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে ভোলেনি, ক্ষতের উপর সামান্য একটা প্রলেপ পড়েছে মাত্র। আর সেই প্রলেপটি হচ্ছে আমার সন্তান। অপমানের কথা নয়, তবু সন্তানের জন্যই আমার মূল্য এ কথা ভাবলে আমার দাহ হতো। ঠিক এই রকম সময়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন খনিবিদ্যা শিখে। মেজদার সতীর্থ, সেই সূত্রে আলাপ হতে হতেই যে কেমন করে এত সহজে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেলো তা নিজেও বুঝতে পারলাম না। প্রথম প্রথম কিছুটা ভান করতাম অশোককে দেখিয়ে, মনে হতো অশোকের ঈর্ষাবৃত্তিটা হয়তো জেগে উঠবে এ দেখে এবং ও কষ্ট পাবে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—তা ও পেতো না, বরং আমার ন্যাকামির আভাস পেলেই ও সরে পড়তো সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত দেখি আমার ভানকে বিনয়বাবু সত্যি মনে করে বসে আছেন, আর আমারও মনে হলো আমি অশোককে কখনোই ভালোবাসিনি—স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর নেই—আমি এতদিন সেই গ্লানিতেই পুড়ে পুড়ে সারা হয়েছি। আজ আমার দুয়ারে সত্যি সত্যিই যে প্রার্থী তাকে আমি ফেরাবোই বা কেন। বঞ্চিত হবার জন্য জীবন নয়—বঞ্চনা যে করে তাকে পুজো করবার জন্যও জীবন নয়। সুখ চাই, সমৃদ্ধি চাই, প্রেম চাই—কেন পড়ে থাকবো এখানে। কী আছে অশোকের, কী পেয়েছি আমি ওর কাছ থেকে। মনকে শক্ত করে ফেললাম

আমি। একদিন রাত্তিরে ঘুমুতে গিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' বই পড়ছিলো শুয়ে শুয়ে—মুখ তুলে তাকালো আমি বললাম, 'আর কতকাল ভার হয়ে থাকবো—তুমিই বা আর কতকাল তা বইবে!' 'কী হলো তোমার ?' অত্যন্ত মধুর করে ও হাসলো।

'তুমি তো জানো, হাসলে ওকে কী আশ্চর্য ভালো লাগে, মুহূর্তের জন্য মনটায় একটু মোহ এলো, আমল দিলাম না। অত্যন্ত সহজভাবে বললাম, 'বিনয়বাবু আমাকে ভালোবাসেন, তা বোধ হয় তুমি জানো না।'

'জানি—' কথাটা বলেই বইয়ে চোখ ডোবালো, আর আমি স্তব্ধ হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বুঝতেই পারো—মাস ছয়েক এইভাবে চললো, আর তারপর একদিন ওকে পরিত্যাগ করে চলে এলাম। সমস্যা হয়েছিলো মেয়ে নিয়ে—অশোক নিজে থেকেই বললো, 'বিনয়বাবু রাজি থাকলে মেয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার আয়ু হয়তো শেষ হয়ে এসেছে, কেননা ভিতরে ভিতরে আমি বড় শ্রান্ত, আমার এই ঘুষঘুষে জ্বর আর ঘুরে ঘুরে কাসি, এটা আমার ভালো মনে হয় না, এজন্যেও লক্ষ্মীকে সরানো দরকার।'

মাধবী চুপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এমন একটা নিস্তব্ধতা এলো যে আমি ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জিগ্যেস করলাম, 'লক্ষ্মী তখন কত বড় ?'

ভাঙা ভাঙা গলায় মাধবী বললো, 'চার বছরের।'—একটু থেমে বললো, 'প্রথমটা খুব কাঁদতো বাপের জন্যে, কিন্তু বিনয়বাবু অসাধারণ লোক, তিনি স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে আমাদের মা মেয়েকে ভরে রেখেছেন।'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ আসছিলো না—কেশে বললাম, 'অশোক এত দিনও বেঁচে আছে কি না কী করে জানলে ?'

'পরশু কাগজে কি দ্যাখোনি তার ছবি বেরিয়েছে—সমস্ত সম্পত্তি সে গরিব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেছে, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি।'

না বলে পারলুম না, 'মাধবী, ছবিটা একটু দেখাতে পারো ?'

মাধবী তক্ষুনি উঠে ভিতরের ঘর থেকে কাগজখানা নিয়ে এলো, ছবিটার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিলো, একটুখানি চোখ বুলিয়েই এ-কথা সে-কথার পর অনেক সংকোচ নিয়ে বললাম, 'তোমার তো প্রয়োজন নেই বোধ হয়, ছবিটা আমি নিলে কি ক্ষতি হবে ?'

মাধবীর মনের ইচ্ছা বোঝা গেলো না, কিন্তু সহজভাবেই সে ছবিটা আমাকে দিলো। তারপরে আর বেশিক্ষণ সেখানে আমি ছিলাম না। হস্টেলে ফিরে এসেই অত রাত্তিরে স্নান করলাম, তারপর খাবো না বলে এসে ঘরে শুয়ে রইলাম। সমস্তটা রাত্তির একবিন্দু ঘুম এলো না, জানলা দিয়ে রাস্তার আলো আসতো বলে জানলাটা বন্ধ করেই রাখতাম রোজ, মধ্যরাত্রিতে উঠে সেটা খুলে দিলাম, তারপর আবছা আলোতে সন্তর্পণে বসে বার বার দেখতে লাগলাম অশোকের ছবিখানা। ছবিখানা বোধ হয় বর্তমান চেহারার, তাই এমন বিবর্ণ, বিষণ্ণ। মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগলো কত কথা, তন্নতন্ন করে যাচাই করতে লাগলাম কী সুখ আমি পেয়েছি এ-জীবনে। মা নেই, বাপ নেই—সাতকুলে কেউ নেই। দুটো ছোটো বোন আছে, তাদের তো কোন জন্মে বিয়ে হয়ে গেছে, দেখাও হয় না। থার্ড ক্লাসে উঠেই মাস্টারি করে করে পড়তে হয়েছে। মা-বাবার মৃত্যুর পরে কাকার আশ্রয়ে দু-বছর ছিলাম, কিন্তু দুটো যুগও মানুষের এর চেয়ে সহজে কাটে। কাকিমা মানুষ

ভালো ছিলেন, কিন্তু কাকা একটি মূর্তিমান শয়তান। আমরা তিন বোনে তাঁর কাঁধে যে কী ভীষণ বোঝা এ-কথা তিনি দিনে অন্তত তিরিশ বার শোনাতেন এবং ঝি-চাকর রাখবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই বলে আমাদের দিয়ে সব কাজ চালাতেন। কোনোরকমে ম্যাট্রিকটা পাস করেই আমি বোনেদের নিয়ে হস্টেলে এসে উঠলাম। দিনে তিনটে টিউশানি করে তবে বোনেদের খরচ চালিয়েছি, কাকার অর্ধ পয়সাও আর গ্রহণ করিনি। আই. এ. পাস করে যখন বি. এ.-তে ভর্তি হলাম, তখন আমার বন্ধুত্ব হয় মাধবীর সঙ্গে। সে-বন্ধুত্ব এমন প্রগাঢ় হয়েছিলো যে মাধবীর মা-বাবার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত আমার একটা সম্বন্ধ হয়ে গেলো।

আমি তখন বাইশ বছরের মেয়ে, বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি। সেই হস্টেলেই বোনেদের নিয়ে থাকি এবং সকাল-সন্ধ্যা দুটো টিউশানি করি। একদিন সন্ধ্যাবেলা টিউশানি সেরে ফেরবার পথে মাধবীদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম, মাধবীর মা বসবার ঘরে একটি যুবকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। আমি যেতেই বললেন, 'ও মা, তুই জানিস না বুঝি, মাধবী তো চুঁচড়ো গেছে ওর পিসি-বাড়ি।' আমি সংকুচিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়েই বললাম, 'তাই নাকি ?'

'তাই বলে কি ঘরেই ঢুকবিনে নাকি ?'—মাধবীর মা সস্নেহে আমাকে ডেকে আনলেন, তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অশোক, এই দ্যাখো আমার আর একটি মেয়ে। অশোককে তো তুই দেখিসনি, না ? তুই যেমন আমার মেয়ে, এও তেমনি আমার আর এক ছেলে।'

আমি চোখ তুলেই দেখলাম অশোক নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি চোখ তোলাতেও ওর চোখ নামলো না। আমার মুখে কী দেখছিলো জানি না, পরে ওর মুখেই, শুনেছি, এ মুখ নাকি অতুলনীয়।

মাধবীর মা বললেন, 'মাস্টারি তো করে এলি, খাবিনে কিছু ? জড়সড় হয়ে বললাম, 'না, মাসিমা, আটটার মধ্যে আমাদের ফিরতে হয় জানেন তো।'

'ওঃ, আটটার এখনো ঢের দেরি—' মাসিমা কথা শুনলেন না, খাবার আনতে উঠে গেলেন। অশোক আমাকে বললো, 'আপনার কথা মাধবীর কাছে অনেক শুনেছি।'

মৃদু হেসে চুপ করেই রইলাম। অশোকের কথা আমিও মাধবীর কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললো, 'শুনেছি পার্ট-টাইম একটা ইস্কুলেও পড়ান—এখনো তো দেখছি পড়িয়েই এলেন। এত পেরে ওঠেন আপনি ?'

আমি সকুণ্ঠে জবাব দিলাম, 'না পেরে উপায় কী ?'

'কেন ?' অতিশয় অসংগত এই প্রশ্ন, উচিত ছিলো রাগ করা, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রাগ করতে পারলুম না, ঈষৎ হেসে বললুম, 'যদি জানতেই চান, আরো দুটি ছোটো বোন আছে আমার।'

'ও—' অশোক চুপ করে গেলো। আমিও আর কথা বললুম না।

মাধবীর মা এলেন খাবার নিয়ে, 'এ কি অশোক, তুমি যে বড় চুপচাপ। বকুলের সঙ্গে বুঝি কিছুতেই জমাতে পারছো না ?'

অশোক মৃদু হাসলো। মাধবীর মা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চেনা-অচেনার বালাই তো ওর দেখিনি কখনো—আজকে কিন্তু তোকে খুব সমীহ করছে অশোক।'

হঠাৎ আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেলো এ কথার পরে।

মাধবীদের বাড়ি থেকে আমাদের হস্টেল মিনিট দশেকের রাস্তা। অশোক আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেলো। ফিরে যাবার সময় বললো, 'আশা করি আবার আপনার দেখা পাবো।'

'আপনি তো এখানে থাকেন না।'

'থাকি না বটে, কিন্তু আসি প্রায় রোজই। তা ছাড়া, সম্প্রতি দিনকয়েক তো এখানেই আছি। আসুন না এর মধ্যে আর একদিন ?'

'আচ্ছা।' নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

অবিবাহিত যুবক দেখলেই আমার তার সম্বন্ধে কৌতূহল হয়, কেননা সম্প্রতি আমার বোনের বিয়ে দেবার কথা আমি ভাবছিলাম। এদের দু-বোনের বিয়ে দিয়ে উঠতে পারলে আমার অনেক কষ্টের লাঘব। ছোটোটি পনেরো বছরের, থার্ড ক্লাসে পড়ছিলো, কিন্তু তার উপরেরটির সতেরো তো হলো। বিয়ের পক্ষে এমন সুন্দর বয়স আর নেই, সবে কুঁড়ি ফুটেছে। মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা করে দেখেছি, ও খুব উপভোগ করে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিলো, একটা টিউশানিও করে—নিজে এত কষ্ট করেছি বলে ওর কষ্টটা আমার লাগে বেশি। আমি বড়, দায়িত্ব আমার, ওকে কেন কষ্ট করতে দেবো। বাণী তা শোনে না, তাই আমি ভেবেছি ওকে এখনি বিয়ে দিয়ে দেবো।

বাণী বলে, 'বিয়ে তো দেবে, কিন্তু পয়সা পাবে কোথায় ?'

কথাটা ভাববার মতই, কিন্তু এমনও তো মানুষ আছে যারা পয়সা নেয় না। তা ছাড়া মার গহনা আমরা কিছু পেয়েছিলাম। সাবেকি—তাই শুধুই সোনা। তিন বোনেরটা দিয়ে এক বোনকে নিশ্চয়ই পার করা যাবে। বাণী বলে, 'নিজের কথা তো তুমি ভাবোই না, কিন্তু রানীকেও তো বিয়ে দিতে হবে ?' 'ওঃ রানী! রানীর জন্য ভাবনা নেই, ও বড় হতে হতে আমি বি. এ. পাস করে একটা ভালো চাকরি পাবোই, তারপর না খেয়ে টাকা জমাবো।' বাণী ভবিষ্যৎ শুনে হাসে।

অশোককে দেখে আমার মনে কেমন একটা আশা হলো। পরের দিন মাধবীকে কলেজে বললাম কথাটা। আমার যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকতো, তবে দেখতাম মাধবীর মুখ সাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু নিজের চিন্তাতেই আমি বিভোর। মাধবী বললো, 'খেপেছিস ? বাপের এক ছেলে—গাড়ি বাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল—সে কি আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে ?' ভয়ানক আঘাত লাগলো মাধবীর কথায়। চাপতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার মুখ গম্ভীর হলো, না-বলে পারলাম না, 'অনাথ মানে ? রাস্তার ভিখারিও নয়, কারো কৃপাপ্রার্থীও নয়।'

মাধবী অপ্রস্তুত হলো। যদিও কিছু না ভেবে ফস করে কথাটা বলে ফেলেছিলো, তবু আমার মর্মমূলে তা এমন বিদ্ধ হয়ে গেলো যে মাধবী অনেকবার ক্ষমা চেয়েও তা আর উপড়ে আনতে পারলো না। বুঝতে পারলো আমার মন মেঘমুক্ত করা সহজ হবে না, তাই হয়তো ভাবলো মার হাতে ফেলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—অগত্যা পরের দিন ওদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে চলে গেলো বিষণ্ণ মনে।

আবার আমার সঙ্গে অশোকের দেখা হলো।

প্রায় সমস্ত দিনটাই ওখানে কাটিয়ে যখন হস্টেলে ফিরে এলাম তখন কেবলি মনে হতে লাগলো, এত তাড়াতাড়ি দিন কাটলো কেমন করে ? আর আমিই বা এত শিগগির

চলে এলাম কেন ? ঘর থেকে ঘরে, বারান্দা থেকে বারান্দায়, জানলা থেকে জানলায় এমন চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম যে, হস্টেলের প্রত্যেকটি মানুষ আমার ভাবান্তরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

বড়মানুষের ছেলেদের সাধারণত যা হয়ে থাকে, অশোকেরও ঠিক তাই হয়েছিলো। বাপ মাইকার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন। চেহারা ভালো আর বাপের টাকা আছে এটাই তো শ্রেষ্ঠ গুণ—উপরন্তু ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিলো বলে যে কোনো যুবতী মেয়ের মায়ের মনোহরণ করে বহু মেয়ে নিয়ে খেলবার একটা অনায়াস অবকাশও পেয়েছিলো। আমাদের মাধবী তখন ওর নতুনতম আবিষ্কার। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেখা। কী যে নেশা হলো জানি না, আমি ওকে প্রশ্রয় দিলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এমন হলো যে দেখা না-হলে আমাদের আর দিন কাটতো না। প্রথম প্রথম মাধবীদের ওখানেই চলছিলো, কিন্তু সেটা সুবিধের হলো না, শেষে কোনোদিন গড়ের মাঠে, কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন গঙ্গার ধারে, কখনো বা ট্যাক্সিতে—এই করে দিন কাটতে লাগলো। মাসখানেক পরে ও একদিন বললো, 'বকুল, আমাকে কি তোমার কখনোই খারাপ লোক মনে হয়েছে ?'

নিঃসংশয়ে বললাম, 'না।'

আমাকে ভালো করে জানবার অবকাশ তুমি পাওনি, তাই। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই মনে হয়েছিলো আর সকলের মত এ অবকাশ আর তোমাকে দিতে পারবো না, আমার মধ্যে যা মেকি তা সমস্তই এবার পুড়ে যাবে তোমার উত্তাপে। অনেকে অনেক কিছু বলতে পারে—যদি শোনো মন খারাপ কোরো না। তোমার কাছে যে-রূপ সেই তো আমার আসল।'

কথা বলতে বলতে ও কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলো। আমি বললাম, 'তুমি কি ভাবো আমার মন এতই কাঁচা, লোকের চোখ দিয়ে আমি যাচাই করবো তোমাকে ?'

'হতেও তো পারে ?'

'কখনোই না।'

'আচ্ছা ধরো, কোনো সূত্রে যদি জানতে পারো যে আমি ছদ্মবেশে একটি শয়তান—'

'থামো, থামো—' আমি বলে উঠলাম, 'আর বিনয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া শয়তানকেও তো মানুষ ভালোবেসে ফেলতে পারে। জানো না রবীন্দ্রনাথের কথা—"খোকা বলেই ভালোবাসি ভালো বলেই নয়"।

ও বললো, 'তবু আমি আশ্বাস পাচ্ছিনে, বকুল। বকুল, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ঠকাইনি, আমার সমস্ত প্রাণে মনে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি।' এমন ব্যাকুলতা ছিলো কথাগুলোতে যে আমি বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না। চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর ফিরে এলাম হস্টেলে।

তার দিনকয়েক পরে একটু বিষণ্ণ মুখে বললো, 'বকুল, আমাকে বোধ হয় শিগগিরই বাইরে যেতে হবে।'

'কেন ?'

'বাবার বাত হয়েছে, ডাক্তাররা তাঁকে নিয়ে পুরী যেতে বলেন।'

'ও।'

আমার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে ও সুখী হলো না—একটু অপেক্ষা করে বললে, 'আর কিছু বলছো না যে?'

'কী বলবো?'

'কেন, বলবার কি কিছুই নেই?'

মৃদু হাসলাম, জবাব দিলাম না।

'না, না ও-রকম বিমর্ষ হলে চলবে না।' অধীর আগ্রহে ও আমার হাত ধরে নাড়া দিলো।

আমি বললাম, 'খবরটা কি আমার পক্ষে খুব হর্ষ করার মত?'

'ও, তাই!' একটু থেমে, কিন্তু দুঃখ করবারও বোধ হয় কিছু নেই, কী বলো? তোমাকে তো কম জ্বালাই না আমি। কিছুদিন—'

'নাও, ছেলেমানুষি কোরো না।' প্রায় ধমকে উঠলাম, 'এখন যে আমাদের কত ভাববার দিন এসেছে তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে?'

'ভাবনা আবার কী। বাবাকে বলবো, মত দিলে ভালো, না দিলেও ক্ষতি নেই—তোমার অনুমতি পাওয়া দিয়েই হচ্ছে কথা! কিন্তু বকুল, একটা কথা—'

'বলো—'

'মানে—এই—' অনেক ইতস্তত করে থেমে থেমে ও বললো, 'বলছিলাম কি মাধবীরা কি এ-সব জানে?'

'খুব সম্ভব না। আর জানলেই বা কী।'

'না, না, খবরদার—' অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অশোক বলে উঠলো।

আমার তা ভালো লাগলো না বললাম, 'কেন বলো তো?'

'না, কারণ কিছুই নেই, তবে ওঁরা আমাকে আশা করেছিলেন এই আর কি।'

হঠাৎ আমার মাধবীর কথা মনে হলো, 'বড়লোকের ছেলে বাড়ি গাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল, সে আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে।' প্রতিহিংসার একটা আনন্দ বিদ্যুতের মত খেলে গেলো হৃদয়ের মধ্যে।

বললাম, 'অশোক, তোমাকে বলাই ভালো—দ্যাখো, আমি একান্তই নিঃসম্বল মেয়ে, বাপ-দাদার সাহায্য কী বস্তু তা আমার জানা নেই—মাধবীর ভাষায় নিতান্ত অনাথ, এখনো সময় আছে ভেবে দেখবার—' বলতে বলতে আমি অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার কথায় ওর মন নেই, অন্য দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী চিন্তা করছে।

'কী ভাবছো?'

'উঁ—' হঠাৎ যেন জেগে উঠলো। 'না, বলছিলাম কী—' সেই পূর্ব কথারই জের টেনে বললো, 'পাঁচজনকে জানাবার দরকারই বা কী, আর দেরিই বা মিছিমিছি করছি কেন?'

'দেরি মানে?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি মনে মনে কী যেন ভাবছো।'

'বকুল, আমার যেন মনে হয় পুরী থেকে ফিরে এসে আর তোমাকে পাবো না, তার চেয়ে এসো কালকেই আমরা নোটিশ দিয়ে আসি, তারপর যে করেই হোক, আর পনেরো দিন আমি বাবাকে ঠেকিয়ে রাখবো—একেবারে রেজিস্ট্রি করে শেষে পুরী যাবো।'

'পাগল?' আমি আমলই দিলাম না কথাটায়। 'এ কি সম্ভব নাকি? আমার টাকা কোথায়? তা ছাড়া দুটো বোন মাথার বোঝা। কত দায়িত্ব, কত ভাবনা, হুট করে একটা বিয়ে করলেই হলো নাকি?'

'তোমার আবার বাড়াবাড়ি—' অধীর হয়ে অশোক বললো। 'টাকার জন্য যদি আবার ভাবনাই করবে, তবে এ-অভাগাকে দিয়ে হবে কী ? আর রানী, বাণী ? বেশ তো, তোমার কাছেই থাকবে ওরা।'

'আরে না, না, আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না—আজন্ম সুখে লালিত তুমি, যখন যা ভাবো নিমেষেই তা করতে পারো, কিন্তু আমি—'

অশোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলো।

তার দুদিন পরে ও পুরী চলে গিয়েছিলো। যাবার আগে একটা মাস ওকে নিয়ে আমি এমন মত্ত হয়ে ছিলাম যে, অন্যদিকে মন দেবার আর আমার অবকাশ ছিলো না। মাধবী কলেজে আসতো না, শুনেছিলাম ওর অসুখ। এবার মনে হলো খুব অন্যায় করেছি। সেদিনই বিকেলে টিউশানির পরে ওকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, বাড়ি ফাঁকা—শুনলাম আজ প্রায় পনেরো দিন ওরা কোথায় গেছে, কবে ফিরবে তাও কেউ জানে না। মনে মনে যেন কেমন একটা মুক্তি পেলাম। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিলো ওরা বুঝি সব জেনে ফেলেছে—ওদের দেখা না পেয়ে দুঃখিত হবার অবকাশ আর আমার হলো না।

অশোক গিয়ে আমাকে রোজ একখানা চিঠি লিখতে লাগলো। জীবনে চিঠি লেখা বা পাওয়া কী বস্তু, তা আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আমি পেরে উঠতাম না ওর সঙ্গে। শেষে মাস দেড়েক পরে মনে হতে লাগলো এখনো যদি অশোক ফিরে না আসে আমি বুঝি চলে যাবো ওখানে। দিন আর কাটে না—রাত্রে ঘুমুতে পারিনি। লিখলাম, 'অশোক, তুমি তখন যা বলেছিলে তাতে সম্মত না হয়ে ভুল করেছি, চিরটা দিন কেবল ভেবে ভেবে আমার স্বভাবই গেছে খারাপ হয়ে, সব বিষয়েই আমার ভাবনার বাড়াবাড়ি। তুমি নেই, এখন তো আমার দিন কাটে না। তুমি কি আমাকে আরো কষ্ট দেবে ?'

এর দিন দশেক পরেই ও ফিরে এলো কলকাতায়। দেখা হতেই বললো, 'বকুল, বাবা কিন্তু খুব খুশি হয়েছেন। একদিন তোমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। আর ওঁর ইচ্ছে বিয়েটা হিন্দু মতে হয়।'

মুখে বললাম, 'ভালোই তো।' কিন্তু মনে মনে চিন্তা এলো। আমার বিয়ে আমাকেই যেখানে দিতে হচ্ছে সেখানে রেজিস্ট্রিই উৎকৃষ্ট পন্থা। কোথায় নেবো বাড়ি, কে আসবে কনে সাজাতে, কে করবে সম্প্রদান, কে কিনবে দানসামগ্রী—এ সব বিলাস কি আমার মত নিঃস্ব মেয়ের জন্যে ? হিন্দু মতে বিবাহ ব্যাপারটাই আসলে বড়লোকের জন্য, যাদের টাকা এত বেশি আছে যে খরচ না করলে আর ধরছে না ঘরে, তাদের জন্যে। তা নয় তো এক রাত্তিরের একটা সামান্য আমোদের জন্য হাজারে হাজারে টাকা কী করে মানুষ অকাতরে খরচ করতে পারে ?

অশোক বললে, 'আজকে ধরো আষাঢ় মাসের সাতাশে—শ্রাবণ মাসের আঠারো তারিখেই একটা বিয়ের দিন আছে।'

'ওরে বাবা, একেবারে দেখছি তারিখও মুখস্থ করে এসেছো।'

'তবে কী—তোমার কি এখনো আরো কিছুদিন ভাবতে হবে নাকি ?'

'ভাবনার অবসান তো করেইছিলাম,' হেসে হেসে সত্যি কথাটাই বললাম, 'নতুন করে ভাববার খোরাক তো তুমিই জোগালে।'

'কেন বলো তো ?'

'বাঃ, হিন্দু মতে বিয়ে, সে কি একটা সামান্য কথা ? কোথায় রে বাড়ি, কোথায় রে টাকা—কোনো লাঠি, কোনো ছাতা, বাসন-কোসন—'

'নাও, ভারি তোমার গরব। দৈন্য না দেখিয়ে কাজের কথা শোনো তো। কাল রোববার। সন্ধেবেলা আমি আবার আসবো—তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের বাড়ি। রানী বাণীও যাবে।'

'ওদের আর কেন—ও বেচারারা এখনো জানে দিদি তাদের জন্যেই ব্যবস্থা করছে—'

'আহা, ওরা কি আর কিছু বোঝে ! নেহাত খুকি কিনা !'

'তা মুখোমুখি যখন কিছু বলিনি তখন নেপথ্যে থাকাই ভালো।'

'বেশ, যা ভালো বোঝো কোরো, কিন্তু প্রস্তুত থেকো মোটমাট।'

পরের দিন বেলা প্রায় আটটার সময় ও আমাকে নিয়ে গেলো। গাড়িতে বসে সাংঘাতিক ঝগড়া, কেন আমি সাদা শাড়ি পরে এলাম। আমি ছেলেবেলা থেকে সস্তা দামের মিলের সাদা শাড়ি পরেই অভ্যস্ত—নিজে উপার্জন করবার পরে কখনো কখনো যে শখ না হতো এমন নয়, কিন্তু দুটি ছোটো বোন আছে, কেনবার সমস্ত শখ ওদের দিয়েই মেটাতে হতো। তাই সত্যি বলতে আমার ছিলোই না রঙিন কোনো ভালো শাড়ি। বলতে গিয়ে তাড়া খেলাম এবং গাড়ির মোড় ফিরলো অন্যদিকে। শাড়ির দোকানে এসে গাড়ি থামতেই আমার মুখ লাল হয়ে উঠলো। কারো কাছে কখনো পাইনি, কাজেই কেউ কিছু দিতে চাইলে সেটা মনে হতো দয়া, অনর্থক ঘা লাগলো আত্মসম্মানে। বললাম, 'ছি ছি এটা তোমার বোঝা উচিত অশোক, এখনো আমি তোমার স্ত্রী হইনি, আমার জন্য উপহার কেনা তোমাকে মানায় না।' আমার কথা না শুনে তবু ও নামতেই আমার মুখের ভাব বদলে গেল। বললাম, 'অশোক, আমাকে গরিব পেয়ে অপমান করছো ?'

'অপমান ! তোমাকে !' অশোকের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ দেখালো। নিঃশব্দে উঠে এসে গাড়িতে বসলো, আর দ্বিতীয় কথা আমাদের হলো না গাড়িতে।

ওদের বাড়ি এসে পৌঁছতেই বছর আঠারোর একটি মেয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলো ঘরে। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়—উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। অশোক বললো, 'আমার বাবা, প্রণাম করো।' ভদ্রলোককে আমি জীবনে ভুলবো না। অমন অদ্ভুত স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আমি কখনো কোনো মানুষের শুনিনি—মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'থাক মা !' যে ঘরখানায় গিয়ে বসলাম সেখানা বুঝলাম আমার জন্যেই বিশেষরূপে সাজানো হয়েছে। প্রায় মাটি সমান নিচু বিরাট একটি তক্তপোশে ধবধবে সিল্কের পুরু চাদর পাতা—তার পাশে পাশে চোখ ঝলসানো ব্রোকেডের তাকিয়া—মাঝখানে মস্ত বড় এক রূপোর থালায় ধান-দূর্বা আর ফুল-চন্দন। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। ভদ্রলোক আমাকে সস্নেহে সেই তক্তপোশের উপর নিয়ে বসালেন, বললেন, 'অশোকের মা নেই তা তো জানো, তিনি থাকলে ব্যবস্থা হতো অন্য রকমের—এমনই অদৃষ্ট করে অভাগা এসেছে যে একটা দিদি ছিলো সেটাও সইলো না কপালে—এই দ্যাখো তার স্মৃতি বহন করে বেড়াচ্ছি আজও—' মেয়েটিকে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। ঠিক যেন বাণী। অকৃত্রিম মমতায় তাকে কাছে টেনে নিলাম।

'তোমারই সমস্ত, মা—তুমি হবে আমার ঘরের মূর্তিমতী লক্ষ্মী। তোমাকে দেখার আগে তোমার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম এ কথা—দেখে মনে হচ্ছে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি।'

এতখানি স্নেহভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না—আমার আশা অতদূর যায়নি—সহসা চোখ ভরে জল এলো আমার। মায়ের মৃত্যুর পরে বোধ হয় এই প্রথম চোখে জল। স্পষ্টই মনে হলো এত সুখ আমার জন্যে নয়—সুখী হবার জন্য আমি জন্মাইনি। দাউ দাউ করে উঠলো মনের মধ্যে। অবশেষে এতদিনকার দুঃখের পাষাণ গলে গলে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো। অশোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, আর ওর বাবা হাত বুলুতে লাগলেন মাথায়। একটু শান্ত হলে উনি আমাকে একজোড়া জড়োয়া কঙ্কণ আর একছড়া সোনার হার দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, এবং একখানা মোহর দিলেন হাতে।

ফেরবার পথে অশোক বললো, 'তুমি অত কাঁদলে কেন?'

'কাঁদবো না? তোমার বাবা আমাকে অত আদর করলেন কেন? আদর কি এর আগে কখনো আমি পেয়েছি, সংসারে কি আমার জন্যেও আদর আছে?'

'পাগলি।' অশোক ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের উপর—এই প্রথম ও এই শেষ—ও আমার সঙ্গে একটু অসংযত ব্যবহার করলো, এবং আমিও প্রশ্রয় দিলাম।

হস্টেলের দরজায় নেমে প্রথমেই সেই কঙ্কণ আর হার ছড়া খুলে ভিতরে এলাম—কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু আগুন কি ছাইচাপা থাকে? সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বকুল, এ সব কী শুনি?'

'কী শোনেন?'

'তুমি নাকি একজন যুবকের সঙ্গে প্রণয় করছো? এ রকম অপরিণামদর্শী হলে তার জন্য যথেষ্ট দুঃখভোগ করতে হয় শেষে তা জানো?'

আমাদের হস্টেলের এই কর্ত্রীঠাকুরানীর এ সব বিষয়ে অসাধারণ ঈর্ষার খবর হস্টেলবাসিনী আমরা প্রত্যেক মেয়েই জানতাম। তিনি দেখতে অসাধারণ খারাপ—যৌবনে নাকি এত বেশি খারাপ ছিলেন যে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই ভয় করতো। হৃদয়ের দিক থেকে তিনি তো আর পাঁচজন মানুষের মতই, কাজেই শারীরিক রূপের জন্য পৃথিবী যে বঞ্চনা তাঁকে করেছিলো আসলে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তাঁর মনে। অন্যের প্রেম ইনি সইতে পারতেন না। যাকে চেনেন না, তারও যদি বিয়ের খবর পেতেন, অকারণে রেগে যেতেন, আর সেই রাগের ঝক্কি আমাদের পোয়াতে হতো।

সভয়ে বললাম, 'আমি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে!' বোমা এবার ফাটলো। 'এ হস্টেলে ওসব চলবে না, এত সব অবিবাহিত মেয়ে আছে, কই, কেউ তো তোমার মত এ রকম বিয়ে করতে চাইছে না।'

আমি এই একটু উদ্ধত হয়ে বললাম, 'আর কাউকে দিয়ে আমার কী হবে? বিয়ে তো করছি আমি। আর তা ছাড়া এ-হস্টেলে তো এমন কোনো নিয়ম নেই যে এখানে থাকলে কেউ বিয়ে করতে পারবে না।'

'যাও, যাও, জ্যাঠামি কোরো না।' হাতের বইটা জোরে টেবিলের উপর ফেলে দিলেন। কিন্তু একটু পরে আবার সংযত হয়ে বললেন, 'বকুল, তুমি ভেবে দ্যাখো, কাজটা কিন্তু ভালো করছো না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

এর পর সুর বদলিয়ে তিনি বললেন, 'বকুল, তোমাকে কি আমি ভালবাসি না? আমি কি তোমার চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ নই? আমার কথা শোনো বিয়ে তুমি কোরো

না। পুরুষরা ভারি উচ্ছৃঙ্খল জীব। আজ তোমার চেহারা সুন্দর আছে, তাই—' এবার আসল কথায় উনি এলেন, 'ধরো কাল তোমার বসন্ত হলো, তারপর তোমার মুখ বীভৎস দাগে ছেয়ে গেলো—চুল উঠে টাক পড়ে গেলো—তখন তোমার উপায় ?'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো, বললাম, 'ও সব বলছেন কেন, আপনার অসুবিধে করে আমি হস্টেলে থাকবো না—আমি কালই চলে যাবো।'

'না, না, চটো কেন—আহা চটো কেন।' উনি দাঁত বের করে হঠাৎ হাসতে লাগলেন।

পরের দিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গিয়ে ফোন করলাম অশোককে। দেখা হতেই সব বললাম।

'তবে উপায় ?' অশোকের মুখ শুকিয়ে গেলো।

বললাম, 'ভয় পাচ্ছো কেন ? আমি আপাতত আমার কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠি। এর মধ্যে তুমি আমার জন্যে একটা বাড়ির খোঁজ করো এক মাসের জন্যে—আজকে দ্যাখো উনত্রিশ তারিখ, আর কটা দিন বা আছে, কেটে যাবে।'

'কোন পাড়ায় বাড়ি নেবে ?'

'হস্টেলের কাছেই নেওয়া ভালো—কেননা আমার তো বন্ধুবান্ধবরাই সব—ওদের যেখানে সুবিধে সেখানে থাকাই ভালো।'

ফিরে এসে বানী-বাণীকে জিনিসপত্র গোছাতে বলে যারা বিশেষ বন্ধু তাদের ডেকে বললাম সমস্ত কথা—মুহূর্তে হস্টেলটি সরগরম হয়ে উঠলো—কেউ উলু দিতে লাগলো, কেউ গান ধরলো, কেউ বা তবলা বাজায়—বেলা বারোটার সময় এমন মারাত্মক গণ্ডগোল আরম্ভ হলো যে চেয়ে দেখি আশপাশের বাড়ির জানলায় সব জোড়া জোড়া চোখ। উত্তেজনা থামলে বললাম, 'কিন্তু আমাকে যে এখন হস্টেল ছাড়তে হচ্ছে।'

'কেন ?'

'বোঝই তো।'

পুষ্প আমার সহপাঠিনীও বটে, বন্ধুত্বও তার সঙ্গে বেশি। সে চটে উঠলো, 'ঈশ ! হস্টেল কি সুললিতা ব্যানার্জির একচেটে সম্পত্তি ?'

হঠাৎ শান্তিদি মুঠো পাকিয়ে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করলো—

শোনো মিস্ ব্যানার্জি মা-বাপের মরজি
তাই করি সহ্যি তোমার ও-নাম।
হতো যদি হিড়িম্বা, হস্তিনী, কিংবা
জগজগদম্বা, মিলতো স্বনাম !

ছড়া শুনে হা-হা করে হেসে উঠলো সব একযোগে। আমি বললাম, 'শান্তিদি, কাজের কথা শোনো। ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে এখানে থাকা আমার ভালো মনে হয় না। আজ আমি আমার কাকার বাড়ি চলে যাই, কাল ভোরে তুমি আর পুষ্প হস্টেলে অপেক্ষা কোরো, তিনজন মিলে একটা বাড়ি খুঁজে বার করবো। পুষ্প খুনোখুনি করতে লাগলো, 'খেপেছিস নাকি ? অত মিনিমুখো হয়ে অন্যায় সহ্য করে তুই চলে যাবি ? না, তা হবে না।' অনেক বলে-কয়ে ওকে শান্ত করলাম আর তার ঘণ্টা কয়েক পরে আমার শান্তির আবাস চিরতরে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তিন বছর পরে আবার দেখা কাকার সঙ্গে। বাইরের ঘরে বসেছিলেন, ট্যাক্সি থামতেই হুঁকো হাতে এগিয়ে এলেন, 'এ কী, তোরা যে ?'

হাসিমুখে বললাম, 'এলাম।' বলেই ব্যাগ থেকে দু-খানা দশ টাকার নোট বার করে কাকার হাতে দিয়ে বললাম, 'ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকিয়ে, টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন।'

কাকা ইঙ্গিত বুঝে খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করলেন, 'যা যা, ভিতরে যা। এতদিনে মনে পড়লো!'

তার পরের কয়েকটা দিন অবর্ণনীয়। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি—জিনিসপত্র কেনা—বাড়িঘর ঠিক করা—টাকাটাও আমার, পরিশ্রমটাও আমার, তবু কাকাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে রাখতো হলো। আমার নতুন বাড়ি ঝম্‌ঝম্‌ করতে লাগলো, আর এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় আমি দু হাতে উড়িয়ে দিলাম মনের আনন্দে।

বিয়ের তিনদিন আগে অশোক বললো, 'চলো, তোমাকে নিয়ে আংটি কিনতে যাবো।'

বেরুলাম দু-জনে, এখানে ওখানে ঘুরে কেনা হলো আংটি—গাড়িতে বসে ও আমার আঙুলে পরিয়ে দিলো। হেসে বললাম, 'হীরের আংটি দিয়ে ভালোই করলে, প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করা সহজ হবে।'

ফেরবার পথে হস্টেলে নামলাম। যেতেই শান্তিদি বললে, 'আজ দু দিন ধরে মাধবীর বাড়ি থেকে তোকে এমন জরুরি ডেকে পাঠাচ্ছে কেন রে?'

'মাধবীরা এসেছে?'

'নিশ্চয়ই, নয়তো ডেকে পাঠাবে কেন?'

'তবে তো আজই যাওয়া উচিত আমার।'

পুষ্প বললো, 'আরে বোস, বোস—'

'না ভাই, মরবার সময় নেই আমার।'

গেলাম মাধবীদের বাড়ি। বসবার ঘর পার হয়ে খাবার ঘরে ঢুকতেই মাধবীর সঙ্গে চোখাচোখি।

'কোথায় গিয়েছিলি তোরা?' উৎসাহভরে কাঁধে হাত দিলাম—মাধবী নিস্পন্দ। 'কী হয়েছে তোর?' বলেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওকে আর মাধবী বলে চেনা যায় না। অমন সুন্দর লাবণ্যভরা মুখময় কে যেন দোয়াতের কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা রঙিন খদ্দরের চাদরে সমস্ত দেহ আবৃত করে অতিশয় নিচু সুরে বললো, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, আমার ঘরে এসো।'

ঘরে গিয়ে বসতেই বললো, 'তোমার নাকি বিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'কার সঙ্গে?'

'তুমি কি কিছুই জানো না?'

'জানি না ঠিক, তবে জনরব কানে এসেছে। সত্যিই কি অশোক?'

'হ্যাঁ।'

'অশোক তোমাকে বিয়ে করছে?'

'আপাতত তো তাই ঠিক।'

'অশোক কি কখনো বিয়ে পর্যন্ত এগোয়?'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম, 'এ-সব বলে এখন লাভ কী মাধবী, যা হচ্ছে তা আর ফিরবে না।'

আমার কথার একটু ঝাঁঝ ছিলো। কেননা, অশোক বলেছিলো মাধবী আশা করেছিলো ওকে—বুঝলাম সেই ঈর্ষায় মাধবী আজ এত বিচলিত।

'আলবৎ ফিরবে।'

আমি হঠাৎ চমকে উঠলার ওর গলার জোরে। 'তুমি কি পাগল হলে, মাধবী। এমন করছো কেন ?'

'এমন করছি কেন ?' মাধবী উত্তাল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি ওকে ভালোবাসি, বকুল—বকুল, তুই ওকে ছেড়ে দে। বকুল, তোর কাছে আমি আজন্ম কেনা রইবো—তুই ওকে ছেড়ে দে। তুই ওকে ছেড়ে দে।'

আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না—উঠে পড়ে বললাম, 'মাধবী, আমি আজ যাই।'

হঠাৎ মাধবী দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো, 'বকুল, তুই কথা দিয়ে যা, এ বিয়ে তুই ভেঙে দিবি।'

'মাধবী, তা আর হয় না, তুমি ভালোবাসো একা, আমাদের ভালোবাসা পরস্পরের। তা ছাড়া তোমার সুখী হতে ইচ্ছে করে, আমার করে না ? কী পেয়েছি এ জীবনে—অনাথ বলে তুমিও অবহেলা করেছো, আমি ছাড়বো না—কক্ষনো ছাড়বো না—ওঠো তুমি পা ছেড়ে।' ছিনিয়ে আনলাম পা।

মাধবী চোখ মুছে মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'বকুল, সব সত্যি, কিন্তু আমাকেও তো পথ বলে দেবেন তোর স্বামী। তাঁর সন্তান যে আমি এই চার মাস ধরে এত কষ্টে এত দুঃখে লালন করছি তার কী উপায় হবে ?'

'তার সন্তান !' বজ্রাহতের মত আমি বসে পড়লাম মাটিতে।

'হ্যাঁ, তাঁর সন্তান !'

'অশোকের সন্তান ?'

'হ্যাঁ, অশোকের সন্তান। শুধু আমাকে নয়, বকুল, ফাঁদে ফেলে সে অনেককেই এই উপহার হয়তো দিয়েছে, তার ভালোবাসার ভান আমরা বুঝিনি।'

'এত বড় লম্পট অশোক ! এত বড় লম্পট !'

ঘৃণায় দুঃখে অভিমানে অপমানে জর্জরিত হয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। সমস্ত রাত্রি জেগে চিঠি লিখলাম দুখানা। একখানা অশোককে, একখানা মাধবীকে। পরের দিন ভোর হতেই তা ডাকে ফেলে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। ট্রামে বাসে রিকশাতে সমস্তটা দিন কী করে যে কাটালাম জানি না। এ-লজ্জা আমি রাখবো কোথায় ? কী কৈফিয়ত দেবো সকলকে ? বাড়ি ফিরলাম চারটেতে। ফিরেই শুনলাম অশোক প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে আছে আমার জন্যে। কী করি—ইচ্ছা ছিলো না দেখা করবার, কিন্তু ছোটো বোনদের সামনে 'সীন' করতে পারলাম না।

আমি যেতেই অশোক মাথা নিচু করলো। বললাম, 'আমার চিঠি পাননি ?'

'পেয়েছি।'

'তবে এসেছেন যে ?'

'পাপ করেছি আমি, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কি তুমিও করবে ?'

'আমি করবো কেন ?'

'আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়া মানেই তোমারও প্রায়শ্চিত্ত। বকুল, মাথা ঠাণ্ডা করো—আমাকে ক্ষমা করো।

'অশোকবাবু !' আমার ডাক শুনে অশোক কেঁপে উঠলো। 'যা বলছি শুনুন—আপনি আর আমার বাড়িতে আসবেন না।'

'এই কি শেষ কথা ?'

'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।'

অশোক বেরিয়ে গেলো বিবর্ণ মুখে।

মাধবী বিয়ে করতেও বাধ্য হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। আমি সেই সময়ে ময়মনসিংহে কাজ জোগাড় করে চলে এসেছিলাম।

অশোকের বাবার দেওয়া সেই জড়োয়ার কঙ্কণ আর হার আমি আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলাম মাধবীকে। হীরের আংটিটি পারিনি খুলতে। কত রাত্রে, কত দিনে, কত নিরালা অবকাশে এই আংটিটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তবু খুলিনি। মৃত মানুষের চিহ্ন যেমন তার সন্তান—এই আংটিটাও আমার কাছে তেমনি ছিলো। আজকে দিয়ে এলাম অশোকের সন্তানকে সেটা।

সেই থেকে এই তো দশ বছর কাটলো। মাস্টারি করে করে হাড় পাকা হয়ে গেলো। এমনকি আমাকে দেখলে পর্যন্ত লোকেরা জিগ্যেস করে, 'আপনি বুঝি মাস্টারি করেন ?' তবু কেন পোড়া জায়গায় চাপ দিলে ঘা বেরিয়ে আসে ?

কিন্তু অশোক কেমন আছে এখন ? কে ওর সেবা করে ?...কী নিষ্ঠুর মাধবী !

ভাবছি কাল একবার অশোককে দেখতে যাবো।

গর্ভধারিণী

জায়গাটি সুন্দর। দূরে চোখ পাঠালেই ছোটো-বড় পাহাড়ের চূড়ো আলোছায়া গায়ে মেখে নয়নমোহন। ধু ধু মাঠ, শাল মহুয়ার বন, একটু গেলেই জঙ্গলের মধ্যে দুটি প্রস্রবণ, উদাত্ত নির্মল আকাশ, সামনের বাঁধানো ঘাট, বাড়ির মধ্যে এত বড় কম্পাউন্ড, বাগান, দেয়াল ঘেঁষে—পাইনের সারি, সব মিলিয়ে নিটোল একটি ছবি।

বাংলোটিও ভারি সুন্দর। চারদিকে গোল বাবান্দা ঘিরে রেলিং, বারান্দা পেরিয়ে সামনেই হল ঘর, এ পাশে ওপাশে দুখানা দুখানা চারখানা শোবার ঘর, সংলগ্ন ড্রেসিংরুম আর বাথরুম। হলের সঙ্গে আর্চের ব্যবধানে খাবার ঘর, পিছনে কিচেন, তার পিছনে সারভেন্টস কোয়ার্টার।

গাড়ি ফটকে ঢুকেছে, সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান, সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে, চমৎকার দেখাচ্ছে দূর থেকে, নিরঞ্জনের ভারি ভালো লাগলো। এই ডিহীতে মাত্রই অল্পদিন আগে এসে সে জয়েন করেছে। সে কয়লাখনির উপরতলার ম্যানেজার, শিগ্‌গিরই ডিরেকটার হবে এমন আভাস পাওয়া গেছে। বয়েস চল্লিশের কাছে, দেখতে সুন্দর, স্বভাবও সুন্দর, লোকে তাকে বুদ্ধিমান বলে। তার নিজেরও বিশেষ সন্দেহ নেই তাতে তবে যেটার অভাবে সে এত থেকেও ভালো না লাগা ব্যাধিতে ভোগে সেটা তার অসুখী অপ্রসন্ন স্বভাব। কেন যে কিছু ভালো লাগে না, সবেতেই বিরক্তি আর রাগ তা সে নিজেও বোঝে না সব সময়।

এই স্বভাবের জন্য সুজাতা একেকদিন ভীষণ চটে যায়, ভীষণ বকে, কতদিন কথা বন্ধ করে দেয়। তাতে কী হবে? যার যেমন চরিত্র।

আজকের এই অপ্রত্যাশিত ভালোলাগায় নিজেই তৃপ্তি বোধ করলো। যেন সব মেঘ ধুয়ে গেছে মন থেকে, যেন সব ভারমুক্ত। মন ভালো থাকলে কত ভালো লাগে, অথচ কেন যে ভালো থাকে না! মনের সঙ্গে তো মানুষের দেখা হয় না, কথা বলা যায় না, মনের তো কোন চেহারা নেই, মন আমাদের কল্পিত আত্মার মত, আছে অথচ নেই। এমন নিরাকার হয়ে কী জ্বালান জ্বালায়।

আজ সত্যি খুব ভালো লাগছে। একটা শিস দিল সে। দৌড়ে ছুটে এলো তিনটে কুকুর। হরিগোপাল, সিদ্ধেশ্বরী আর তারাময়ী। এগুলো পোশাকী নাম, ডাকনাম হরি, সিধু আর তারা। হরি ছেলে। বয়েস তিন, জাতিতে উচ্চবর্ণের কুলীন। গারোপাহাড় থেকে এসেছে। অরণ্যের ভেড়া রক্ষকদের বংশধর। সিধু আর তারা অনুগত স্ত্রী, একান্তই বর্ণসঙ্কর। মনিবকে তারা প্রাণতুল্য ভালোবাসে, মনিবেরও তারা প্রাণ। সুজাতা বলে, 'একদিন তোমার চোখ ঠিক অন্ধ হয়ে যাবে। জানো, কুকুরকে চুমু খেলে লোক অন্ধ হয়?'

নিরঞ্জন বলে, 'ভালোই হয় অন্ধ হলে, এই জঘন্য পৃথিবীটাকে আর দেখতে হয় না, তা হলে!'

সুজাতার কাছে এই পৃথিবীটা খুব সুন্দর, খুব মনোরম। মহারাষ্ট্রের মেয়ে, অনেক বয়স অব্দি কলকাতায় থেকেছে, সেখান থেকে বি এ পাস করেছে, আবার পিতা যেখানে বদলি হয়ে গেছেন চলে গেছে সেখানে। ভালো বাংলা জানে, কথা বলতে একটুও আটকায় না, মাছ-মাংসও খায়, মধ্যপ্রদেশে কোথায় কোন কলেজে পড়াতো, নিরঞ্জনের সঙ্গে সেখানেই আলাপ, অল্পদিনের আলাপেই প্রেম, তারপরেই বিবাহ। সব মসৃণ। বয়েস হয়েছিলো দুজনেরই, সুজাতার তিরিশ , নিরঞ্জনের প্রায় পঁয়ত্রিশ। এখন সুজাতার পঁয়ত্রিশ, নিরঞ্জনের প্রায় চল্লিশ। মাত্রই পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন। সব নতুন। নতুনের পালিশই আলাদা। একটি দেড় বছরের গাবলুগাবলু বাচ্চা আছে, তার মোহও নতুন স্বামীর মোহের মতই ঘোর লাগা।

নিরঞ্জনের এই জবাবে সে ভুরু কুঁচকোয়, মহারাষ্ট্রিয়ান চেহারায় ঢেউ তুলে বলে, 'পৃথিবীটা খুব বিচ্ছিরি, না ? পৃথিবীটা না হামি ?' এইখানে আবেগে আমিটা তার হামি হয়ে যায়, সিঁদুর পরা ধবধবে কপালটা যেন আগুনের শিখা।

সেদিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন হাসে, 'তুমি আছ বলেই তো এত দিন চোখ দুটো বিশ্রাম পেয়েছে। তোমার দিকে তাকিয়ে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়।'

'আহাহা—।'

নিরঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুকুরদের আদর করতে করতে দেখলো আয়া ধনপতিয়া এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, 'মেমসাব কিধার ?'

'পাত্তা নেই সাব, গিরধার বলতা কৌন এক আদমী খুন হো গিয়া, ঐ দেখনেকো গিয়া।'

'সেকি ! আবার কে খুন হলো ?' চিন্তিত হলেন নিরঞ্জন, অবশ্য এইসব কোলিয়ারি অঞ্চলে খুন জখম যে খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা তা নয়, কিন্তু তাতে সুজাতার যাবার দরকার কি ? সে কেন গেলো ? কখনো তো যায় না। এরপরেই শুনলো পুলিশের লোক এসে নিয়ে গেছে জিপে চড়িয়ে। উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে তক্ষুনি আবার গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছিলো, সুজাতা এলো। পুলিশের জিপেই এলো, হাসতে হাসতে নামলো, 'আমার সহপাঠী সুভদ্র সেন, পুলিশের মস্ত লোক, তা-ও আবার গোয়েন্দা বিভাগের। খুনের তদন্তে এসেছে।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'কোথায় খুন হলো আবার। এখানে এইসব কুলি কামিনদের ব্যাপার—'

বসবার ঘরে এসে বসলো তারা। সুভদ্র সেন রুমাল বার করে মুখ মুছে বললো, 'এটা ঠিক কুলি কামিনদের ব্যাপার নয়, এক উটকো লোক এসে আত্মগোপন করে নাম ভাঁড়িয়ে ছিলো এ অঞ্চলে—'

'কে ? নাম কী বলুন তো ?'

'আসলে বাঙালি, কিন্তু যেহেতু এটা বিহার, দিব্যি বিহারি নাম নিয়েছে। রামকিষাণ তেওয়ারী, বড় বড় চুল, বুক পর্যন্ত দাড়ি, সব ফলস—'

'বলছেন কী ?'

'একটা ঘোর ক্রিমিন্যাল। সারাটা জীবন কেবল পাপ করে বেড়ালো। এর খবর আমরা

অনেক আগেই পেয়েছিলাম, ধরতে পারছিলাম না, যখন ধরা পড়লো তখন আমাদের চেয়ে অনেক বড় দরবারেই তার ডাক পড়ে গেছে।'

'ঘটনাটা বলুন তো।'

সুজাতা বললো, 'চলো চা দিই, খাবার টেবিলে বসেই শোনা যাবে।'

বসবার জায়গা থেকে খাবার জায়গায় এলো ওরা। পটভর্তি চা এলো, প্লেটভর্তি খাবার, তারপর নিহত মানুষটির বিষয়ে সুভদ্র যা বললো, তা হচ্ছে এই, লোকটি পাপিষ্ঠ। নিজের পরিচয় গোপন করে যে মহিলাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এখানে ছিলো সে ওর স্ত্রী নয়, স্ত্রীলোক। সেই স্ত্রীলোকটাই খুন করে পালিয়েছে। কী সর্বনাশ! প্রথম জীবনে একটি অতি সুন্দরী অতি গুণবতী মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিলো। মেয়েটি তার দাদার কাছে থাকতো, কলেজে পড়তো, বিয়ের জন্য তার বাবার দশহাজার টাকা ইনসিওর করা ছিলো। বোধ হয় সেই লোভেই অথবা প্রেমেও পড়তে পারে জানি না, যে ভাবে পারে সে ভাবেই বিয়ে করলো। মেয়েটির দাদার কাছেই শুনেছি, শেষে নাকি লোকটা বিষ খেয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয় বলেই মেয়েটি বাধ্য হয়ে বিয়ে করে।

'মেয়েটি বুঝি প্রেমে পড়েনি?'

পড়েছিলো নিশ্চয়ই নইলে বিষ খাওয়াখাওয়ি পর্যন্ত আর এগোয় কী করে। কিন্তু দাদার ইচ্ছে ছিলো না। লোকটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। নিজের বন্ধুর সঙ্গেই বরাবর ভেবে রেখেছিলেন, সে ছেলে ছিলো সব দিক থেকেই যোগ্য। যাকে বলে একেবারে উপযুক্ত পাত্র। বরং তাদের পক্ষে চাঁদে হাত দেবার মতই উপযুক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, সেই উপযুক্ততা নিয়ে সে-ই ছিলো প্রার্থী। বিলেত থেকে এসে বন্ধুর বোনকে দেখে সে পাগল। মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস করে আই-এ পড়ছিলো, কথা ছিলো পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে। তার মধ্যেই এইসব বিপর্যয়। ডিটেলস বলে লাভ নেই, মোট কথা শেষ পর্যন্ত দাদার মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে করে মেয়েটি। বেশ একটা মন কষাকষির ব্যাপারই হয়েছিলো। তবে দশহাজার টাকা আত্মসাৎ করার পরেই লোকটা স্ত্রীকে ছাড়েনি, স্ত্রীর প্রতি সত্যি সত্যি একটা ভালোবাসা ছিলো প্রথমে। স্ত্রীরও জেদ ছিলো স্বামীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু তা পারেনি। নতুন বৌয়ের মোহ কাটতে সামান্য সময় লাগলেও তা চিরস্থায়ী হলো না। মাঝখান থেকে তিনটি সন্তান হয়ে গেল, শেষ শিশুটির জন্ম দিয়ে মহিলা সম্ভবত কিছুকাল অসুস্থ ছিলেন, সেই সময়েই বাড়ির একটি দাসীর সঙ্গে মানে, বুঝতেই তো পারছেন।

'বাঃ, একেবারে গুণের নিধি।'

একেবারে। ভদ্রলোকের পেশা ছিল ওকালতি। বিয়ের পরে জোচ্চুরি ছেড়ে নিজের পৈতৃক শহরে এসে ওকালতিতেই বসেছিলো। রোজগারপাতি খুব ভালো না হলেও মন্দ ছিলো না। ঐ দাসীর সঙ্গে লিপ্ত থাকতে থাকতেই আবার এক অল্পবয়সী বিধবা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। উকিল তো, মহিলা বিপন্ন হয়ে একদিন ওর কাছে এসেছিলো। অকালমৃত স্বামী যথেষ্ট বিষয় আশয় রেখে গেছে, ঠকাবার লোকও জুটেছে অনেক। সুতরাং উকিল। লোকটির চেহারা সুন্দর ছিলো, মন ভোলাবার কৌশল জানা ছিলো, কয়েক দিনের মধ্যেই উপকারী বন্ধু হয়ে শুধু যে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করলো তাই নয়, মহিলার উপবাসী বুভুক্ষু যৌবনকেও বেশ ভালোভাবেই আপ্যায়িত করলো। এবং এই পথে এগিয়েই সম্পত্তিটি হস্তগত করলো।

'সাংঘাতিক তো।'

কিন্তু স্ত্রী অন্তরায়। বলাই বাহুল্য ঝগড়াঝাটি, খিটিমিটি, স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা সব চলতে লাগলো সেই সঙ্গে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দাদার সেই বন্ধু গিয়ে উপস্থিত। ঐ শহরে তার পিসির বাড়ি, আরো দু-চারবার গেছে কিন্তু দেখা করেনি, এবার করলো। মেয়েটির দাদাই দেখা করে যেতে বলে দিয়েছিলো বিশেষভাবে। দাদাকে মেয়েটি সব কথাই গোপন করতো। তবু লোক পরম্পরায় নানা গুজব কানে যেতো তার। বোন তাকে কোনোদিন নিজের বাড়িতে ডাকেনি, আট বছরের বিবাহিত জীবনে নিজেও বেশি আসেনি, এ নিয়ে ভিতরে ভিতরে কিছুটা রাগ অভিমান থেকেই যাচ্ছিলো কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও ছিলো।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্যই এই অনুরোধটি বন্ধুকে রাখতে বলেছিলো।

'বন্ধুটি তখনো বিয়ে করেনি?'

না। কিন্তু বন্ধু এসে একটি ভীষণ ঘটনার মুখোমুখি পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে হত্যা করতে গিয়ে লোকটা হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে, পুলিশে প্রতিবেশীতে বাড়ি ছাওয়া। গলা টিপে ধরেছিলো, গোঁ গোঁ আওয়াজ পেয়ে ভৃত্য ছুটে আসে, দরজা বন্ধ ছিলো, জোরে জোরে ঘা দিতেই ছিটকিনি হড়কে খুলে যায়, দেখা যায় বুকের উপর হাঁটু চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে।

'বলছেন কী? ফাঁসিকাঠে ঝোলালেন না?'

'ঝোলানো গেল না। স্ত্রী আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। ঐ সেই বন্ধু ভদ্রলোকই সব করলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সেবা করা ওষুধ পথ্য—শেষ পর্যন্ত কী হলো জানেন?'

'ভালো হয়ে মামলাতে সাক্ষী দিলেন স্বামী তাকে কক্ষনোই হত্যা করার চেষ্টা করেননি লোকেরা ভুল বুঝেছে। এই বলে নানারকম যুক্তি দিয়ে খালাস করে দিলেন স্বামীকে।'

'অদ্ভুত।'

'তারপর অবিশ্যি আর স্বামীর ঘর করেননি। কোর্ট থেকে এসেই বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় চলে যান। কাউকেই কিছু বলে যাননি।'

'ঐ ভদ্রলোক? সেই বন্ধু?'

'আমাদের ধারণা বন্ধুকে নির্ভর করেই গিয়েছিলেন। দাদার কাছে যে যাননি তা তো জানি।'

'এ যে প্রায় গল্প কথা?'

'গল্পের চেয়ে বড়। লোকটার দ্বিতীয় খুন সেই জমিদার গিন্নি।'

'সে কী! আর সেই দাসীটা?'

'মূল গল্পই সেটা। এঁরা সব ভদ্রমহিলা, এদের সঙ্গে পেরেছিল। দাসীর সঙ্গে পারেনি। সে ওকে টিট রেখেছে ব্ল্যাকমেইলের ভয় দেখিয়ে। পুরো একটা বছর গরু খোঁজা খুঁজে এতদিনে—'

'লোকটার আসল নাম কী?'

'সুখরঞ্জন রায়।'

'ক্-কী!'

গল্প শেষ করলেন ভদ্রলোক, তারপর উঠলেন। কথা থাকলো যাবার আগে আর একবার আসবেন দেখা করতে।

বাচ্চার খাওয়া-দাওয়া ঘুম সাংসারিক কর্তব্য ইত্যাদি নিয়ে সুজাতা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। নিরঞ্জন আলো নিবিয়ে চুপচাপ বসলো এসে বারান্দায়।

নিরঞ্জনের মা নার্স ছিলেন, তারা তিন ভাইবোন মায়ের সেই স্বল্প উপার্জনেই বড় হয়ে উঠেছে। সন্তানদের মানুষ করে তোলার প্রতি তাঁর যত্ন ছিলো অপরিসীম। কলকাতার দক্ষিণতম অংশে ব্রহ্মপুর নামে একটা গ্রামে থাকতো, ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটি সুন্দর ছিলো, বাবার মৃত্যুর পরে তাদের নিয়ে নিঃসম্বল মা এখানে এসেই উঠেছিলেন, বাড়িটি নিশীথ মামার।

নিশীথ মিত্র, মাকে যিনি সব বিষয়েই সর্বক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণই করতেন, পিতৃহারা হয়েও যাঁর জন্য তারা ভাইবোনেরা কখনো পিতৃহীনের বেদনা অনুভব করতে পারেনি।

দিদি সবচেয়ে বড়, শোনা যায় এখানে যখন আসে তখন তার ছ বছর বয়েস ছিলো। তারপরে দাদা সুরঞ্জন, তার বয়েস ছিলো চার, আর সে নিজে তো একান্তই ছোটো। বাবা বিষয়ে বলা যায় তিন ভাইবোনেরই কোনো স্মৃতি নেই, যা একটু দিদিরই ছিলো। দিদি বলতো, বাবা খুব সুন্দর ছিলো, এ ছাড়া আর সবই ধু ধু। মা এ বিষয়ে বড় একটা মুখ খুলতেন না, জিজ্ঞেস করলেও ভালো মত জবাব দিতেন না। কিন্তু তার খুব জানতে ইচ্ছে করতো। বাবা নামক সংজ্ঞাটা তাকে যথেষ্ট আলোড়িত করতো।

মায়ের চেহারা ছিলো বিষাদের প্রতিমূর্তি। দেখতে সুন্দর ছিলেন। কী সুন্দর মোমের মত মসৃণ রং, কী লম্বা চুল, টানা টানা চোখ বেদনার উৎস। মাকে এত ভালো লাগতো নিরঞ্জনের। নিশীথ মামাকেও খুব ভালো লাগতো। নিশীথ মামার মুখেই হাসি সর্বদা অমলিন, নিশীথ মামা সর্বদাই তাদের প্রতি যথেচ্ছ প্রশ্রয়ে প্রস্তুত। দিদির পনেরো বছর বয়সে দিদি যখন টাইফয়েডে মারা গেল, মায়ের শোক আর নিশীথ মামার শোক অভিন্ন ছিলো। দিদি ক্লাস টেনে পড়তো, মায়ের মতই সুন্দর ছিলো, খুব ভালো একটা বিয়ে ঠিক করেছিলেন তিনি, এই সময়েই সংসার থেকে সব বন্ধন তার ছিঁড়ে গেল। আর এই সময়েই সে আর তার দাদা জেনেছিলো যে বাবা মারা যায়নি, নিরুদ্দেশ।

মাকে দুঃখ দেবার জন্য তাঁর ভাগ্যের একটা বড়রকমের ষড়যন্ত্র ছিলো। দিদির শোকই তাঁর শেষ শোক নয়, আই-এ পড়তে পড়তে তার দাদাও মারা গেল। সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। দেখতে দেখতে ভরাপুরা বাড়িটা খাঁ খাঁ হয়ে গেল। দিদির শোকে বালক নিরঞ্জন আর দাদার শোকে কিশোর নিরঞ্জন এত জোরে জোরে দুটো ধাক্কা খেলো যে এক লাফে অনেক বছর পেরিয়ে এলো। সে গম্ভীর হয়ে গেল। চিন্তাশীল হলো এবং বিষণ্ণ হলো। আর একটা নতুন ভাবনার পোকা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

তার বাবা কেন নিরুদ্দেশ হবেন? কোথায় গেলেন? কী তার কারণ?

মার চাপা স্বভাবের জন্য তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা সম্ভব ছিলো না। নিশীথমামাও অন্যান্য বিষয়ে খোলা মেজাজের মানুষ কিন্তু এ বিষয়ে নয়। সুতরাং পোকাটা তাকে ক্রমাগতই উত্যক্ত করতে লাগলো। এক চিন্তা সব সময়েই অন্য চিন্তার সঙ্গ খোঁজে। সেই চিন্তা হলো, এই নিশীথমামা ভদ্রলোকটিই বা তাঁর জীবনমন এই পরিবারে উৎসর্গ করেছেন কেন, কী

তার কারণ ? ভদ্রলোকটি অবিবাহিত এবং মস্ত কোনো ফার্মের হর্তাকর্তা বিধাতা। এবং রক্তের সম্পর্কের মামা নন। এ ছাড়া আর কোন পরিচয়ই নিরঞ্জন জানে না।

একদিন সে মাকে বললো, 'তুমি এ কথা বলো কেন যে বাবা মারা গেছেন ?'

মা কাজ করতে করতে শান্ত স্বরে বললেন, 'বলিনি তো।'

সে বললো, 'আমরা তাই জানি।'

মা বললেন, 'তোমাদের পক্ষে হয়তো সেটাই সত্য।'

'কক্ষনো না।' সে রেগে গেল, 'মৃত্যু আর নিরুদ্দেশ কি এক ?'

কাজ থামিয়ে মা তাকালেন, তাকিয়ে রইলেন, বললেন, 'না।'

'তবে ?' তবে কেন আমাদের এরকম একটা ভুলের মধ্যে রেখে দিয়েছিলে ?'

'কোনোদিন যাকে পাওয়া যাবে না তার আর এক নাম মৃত্যু।' মায়ের গলা ঠাণ্ডা কঠিন।

সে মাথা ঝাঁকালো, 'জীবিত মানুষকে মৃত বলাও মিথ্যে, কোনোদিন তাকে পাওয়া যাবে না বলাও ঠিক তাই।'

এ কথার কোনো জবাব দিলেন না মা। যা করছিলেন নিঃশব্দে তাই করতে লাগলেন।

মৃত্যুর ছায়া বাড়িটা থেকে কোনোরকমেই মুছে যাচ্ছিলো না। নিরঞ্জনের একাকিত্ব নিরঞ্জনকে সব সময়েই গ্রাস করে থাকতো। মা তো বলতে গেলে থাকেনই না, সকাল আটটায় যান, রাত আটটায় ফেরেন। যতটুকু থাকেন শোকের পাথারে ডুবে থাকেন। মাঝে মাঝে নাইট ডিউটি থাকে তখন নিশীথমামা এসে বাড়ি পাহারা দেন, তাকে পাহারা দেন। ছোট্ট থেকে এই নিশীথমামার বুকের তলায় শুয়ে সে অভ্যস্ত, এই আশ্রয়ই তাদের আশ্রয়, তাদের নিরাপদে রাখার সব দায়িত্বই ইনি বহন করেন, খাওয়া পরা এবং লেখাপড়া সবেরই তিনি প্রতিপালক, যাকে ভালোবাসতে—বাসতেই এত বড় হয়েছে, এখন তাকে কেমন অবিশ্বাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, রাত বিনিদ্র হয়, পাহারাদারটিকে বলতে ইচ্ছে করে তুমিই অনর্থের মূল।

লেখাপড়ায় তারা তিন ভাইবোনই ভালো ছিলো, দুজন তো চলে গেল, টিম টিম করছে সে একা, সেজন্য নিশীথমামার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠেছিলো। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বোঝা যাচ্ছিলো না কার পরীক্ষা। আসছেন, যাচ্ছেন, খাবার আনছেন, মাস্টার আসছেন তাকে বোঝাচ্ছেন, মাকে বোঝাচ্ছেন, একেবারে পাগল। সুধা, তুমি ভেবো না সুধা, তুমি ভেবো না এই শুধু মুখের বুলি। সুধা, সুধা, সুধা—সুধা তার সত্যিই সুধা। সুধাকে সুখী করাই তার একমাত্র মন্ত্র জীবনের। নিশ্চয় সুধার জন্যই আজো তিনি সংসার পাততে পারলেন না। নিরঞ্জনের অন্তর্দাহ হয়। বাবার নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এই লোকটিই যে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আর মা এমন পাণ্ডববর্জিত হয়ে এই অজানা জায়গায় এসে বিধবা সেজে আছেন কেন তারও একটা হদিস পাওয়া যায়। অনেক অন্যায় কথা মনে হয় তার।

আই এস-সি পাস করবার পরে নিশীথমামা তাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করে দিলেন। নিশীথমামার অর্থাভাব ছিলো না ; কিন্তু তাদের ছিলো। মা যদ্দূর মনে হয় এঁর কাছ থেকে অন্য সব সাহায্য নিলেও আর্থিক সাহায্য নিতে পরান্মুখ ছিলেন। নিশীথমামার বাড়িতে ভাড়া না দিয়ে থাকা ছাড়া সংসারের আর সব খরচ মা-ই বহন করতেন। এ নিয়ে মার সঙ্গে অনেক রাগারাগি করতে দেখেছে সে। মা শোনেননি। কিন্তু তাতে কী। উপহারে

উপহারেই সব পুষিয়ে দিতেন। বছরে উপলক্ষ তো বড় কম হয় না। পুজো, ষষ্ঠী, জন্মদিন, পয়লা বৈশাখ—সব তারিখেই সব আসছে। মা আর কী করবেন।

পরীক্ষায় তার সব কৃতিত্বই এই মানুষটির। ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছিলো, আই এস-সি-তেও প্রথম দশজনের একজন। অবশ্য এ বিষয়ে তার নিজেরও যথেষ্ট জোর ছিলো। সে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার অস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিলো এই জেহাদ। নিশীথমামার অক্লান্ত মনোযোগ আর তার চেষ্টা দুটো মিলে যেন ভাগ্য আর পুরুষকার। যদিও কৈশোর পেরোতে পেরোতে যে রকম একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো লোকটির প্রতি তাতে তার এই সাহায্য তাকে একবিন্দুও সুখী করেনি, স্বস্তি দেয়নি। মায়ের জন্য এঁর এত টান তাকে রক্তাক্ত করেছে, নিজের পলাতক পিতার জন্য হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছে হৃদয়। তবু একান্ত স্বার্থপরের মতই মেনে নিয়েছে সব উপহার। কেবল মনে হয়েছে, এই সিঁড়িতে পা রেখেই উঠতে হবে তাকে।

নিশীথমামা খোলা গলাতেই বলতেন, 'সুধার জন্য আমি কী না করতে পারি।'

একদিন সে ঘপ করে বলেছিলো, 'তা হলে তাঁর স্বামীকে খুঁজে এনে দিন না'।

জোরে জোরে মাথা নাড়লো, 'না, সেটা পারি না।'

তা যে পারেন না তা কি আর জানে না নিরঞ্জন ? জানে। পারলে আর এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে বাসা বেঁধে থাকবেন কী করে ? ছি। আসলে মা হচ্ছে ওঁর প্রেয়সী। তবে মায়ের প্রেমিক উনি কি না সেটা অবিশ্যি ধরা যেতো না। মা অসাধারণ ধীর স্থির শান্ত সংযত। যুবতী মেয়ের নার্সের জীবন খুব মসৃণ ছিলো না সে সময়ে। মাকে অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে। নীরবেই সহ্য করেছেন। মুখ্যত ঐ নিশীথ মিত্র নামক ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতেন বলেই হয়তো সেটা সম্ভব হয়েছে। সেই হিসেবে এর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই তাদের জীবনে আশীর্বাদ। কিন্তু এই কিন্তুটিই সারা অন্তর অন্ধকারে ছেয়ে দিত। কখনো কখনো এমনও মনে হতো, মাকে উনি ভুলিয়ে ভালিয়ে বার করে আনেননি তো ?

জলপানি পেয়েছিলো বলেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়া সহজ এবং সম্ভব দুই-ই হলো। নইলে সেই খরচ মা দিতে পারতেন না, নিশীথমামার হাত থেকেও নিতে চাইতেন না। পরীক্ষার শেষে সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলো, মাকে বলেছিলো অমুককে আমি বিয়ে করতে চাই। মা বলেছিলেন, 'বিয়ে !'

সে বললো, 'এক্ষুনি নয়। তোমাদের উপর চাপাবো না, তবে চাকরি একটা জুটবে বলেই আশা করছি দু-চার মাসের মধ্যে, তখন।'

মা বললেন, 'বেশ তো।' তারপরেই বললেন, 'মামাকে বলেছ ?'

ভুরু কুঁচকে গেল তার, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, 'তাকে বলবার কী আছে ? সে আমার কে ?'

মা অবাক নয়নে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তিনিই তো সব।'

নিরঞ্জন 'সে' বলেছিলো, মা 'তিনি' বললেন। এটা ভাষার সংশোধন। নিরঞ্জন তৎক্ষণাৎ বললো, 'সে সব বলেই সম্ভবত আমরা আমাদের বাবাকে সব করতে পারিনি।'

মা বললেন, 'কৃতজ্ঞ না হও, কৃতঘ্ন হয়ো না।' এই বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

মার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য, তর্ক করবার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, মা সুযোগ দিলেন না। তবু সে পিছে পিছে গিয়েছিলো, মা বেরিয়ে গেলেন।

এর কয়েকদিন পরেই একটা চরম ঘটনা ঘটে গেল। অসময়ে বাড়ি ফিরে সে মাকে আর নিশীথমামাকে নিভৃত কথা বলতে শুনে কান পাতলো।

নিশীথমামা ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলেছিলেন, 'আর কদ্দিন তুমি এভাবে আত্মগোপন করে থাকবে বলতে পারো ? কেন ? কার জন্য ? কিসের আশায় ?'

মার মৃদুস্বর ভেসে এলো, 'আশা।'

'কীভাবে আমি তোমাকে সেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলাম—সুধা, তুমি আমার—'

তবে এই লোকটা তার বাবাকে বঞ্চিত করে ঠিকই বার করে এনেছিলো তার মাকে ? ঝাঁৎ করে সমস্ত শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এলো নিরঞ্জনের। তার কান পুড়ে গেল। তার এতোদিনের এত সন্দেহ এত জ্বালা যন্ত্রণা অশান্তি সব একসঙ্গে আগুনের শিখা হয়ে দপ করে জ্বলে উঠলো। লাফিয়ে ঘরে ঢুকলো সে, আক্রোশে অন্ধ হয়ে নিশীথ মিত্রেরই আদরে যত্নে লালিত পালিত সুস্থ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিশীথ মিত্রেরই সার্টের কলার এমন জোরে চেপে ধরলো যে তার চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইলো। মা 'এ কি ! এ কি !' বলে বিহ্বল গলায় চিৎকার করে ছুটে এলেন। তার চেয়েও প্রবল শক্তিতে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'যত ভালোভাবেই মানুষ করো নিশীথ, সুখরঞ্জন রায়ের রক্ত যাবে কোথায় !'

'আমার বাবার নাম তুমি উচ্চারণ করবে না, তোমাকে আমি মা বলে মানি না। তোমাদের দুজনকেই আমি ঘৃণা করি।'

নিশীথ মিত্র উঠে দাঁড়ালেন, 'কী পাগলামি করছো। শোনো, তোমাকে সমস্ত ঘটনাটা জানানোই উচিত ছিলো। তোমার মায়ের সব বিষয়েই এত গোপনতা যে—' তিনি সস্নেহে হাত ধরেছিলেন, মনের উত্তাপটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। নিরঞ্জন এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে এক দলা থুতু ছিটিয়ে ঝড়ের বেয়ে বেরিয়ে এলো, দেখলো মা মূর্ছাহতের মত পড়ে গেলেন মেঝেতে। 'কী হলো কী হলো' বলে নিশীথমামা ঝুঁকে পড়লেন, সে বাইরে থেকে দরজাটা ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। বার করে আনা স্ত্রীলোক নিয়ে এবার নিশীথ মিত্র যত খুশি প্রেম করুক।

তারপর থেকে এই এতগুলো বছর কেটে গেছে। দেশে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ পিতাকে খুঁজেছে বৈকি। প্রত্যক্ষভাবেও খুঁজেছে, পরোক্ষেও খুঁজেছে। অন্যমনস্ক উদাসীন দেখলেই সুজাতা জিজ্ঞাসা করে, 'মাঝে মাঝে তোমার কী হয় বলো তো ? যেন সংসার থেকে সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কি ভাবো।'

সুজাতাকে বলতে পারে না, তার মনপ্রাণ জুড়ে নেপথ্য সঙ্গীত হয়ে কত দুঃখের আগুন তুষ হয়ে জ্বলছে। মাকে ক্ষমা করতে পারুক না পারুক, ভালোবাসা যে মরে না। নিশীথমামাকে ঘৃণা করতে চাইলেও বারে বারে ঐ একই ভালোবাসার জোয়ার ধুয়ে দিয়ে যায় সব। যত বেদনা পিতার জন্য, ততধিক বেদনা ঐ অপরাধী মানুষ দুটির জন্যে। এ বিষয়ে সে যে কত অসহায় কেমন করে জানাবে সুজাতাকে ? সুজাতা জানে তার পিতামাতা দুই-ই মৃত। জগতে একা মানুষকেই সুজাতা মাল্যদান করেছে।

আস্তে আস্তে কখন যেন নিবে এসেছিলো আগুন, কখন যেন হতাশার অন্ধকার ছিঁড়ে আলোর উদ্ভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, বিয়ে করেছে, সন্তান জন্মেছে। আর সুখ ? অবচেতনের গভীরে যা থাকে থাক, চেতন মন তার এক ধরনের তৃপ্তিতে প্রায় ভরে উঠেছিলো। আর তারপরে কিনা এই ?

নিরঞ্জন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেলো না। ভেবে পেলো না এখন সে কোথায় যাবে, কী করবে। গভীর যন্ত্রণায় দৈহিকভাবে কেঁপে উঠলো। বুকের উপর দিয়ে একটা কান্নার ঢেউ প্রচণ্ড হয়ে গড়িয়ে ভেঙেছিল পাঁজরা। পরাজয় আর অপমানের তীব্র কশাঘাতে কে যেন তাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে দিল চেয়ার থেকে। সে উঠলো, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আচ্ছন্নের মত পার হয়ে গেল কম্পাউন্ড। বাড়িটাকে পিছনে ফেলে হাঁটতে লাগলো। কোনদিকে ? পুবে না পশ্চিমে ? উত্তরে না দক্ষিণে ? ডাইনে না বাঁয়ে ? এদের লাশকাটা ঘরটা কোথায় ?

তারার আলোয় পথ দেখতে দেখতে অস্ফূটে উচ্চারণ করলো, 'হায়রে আমার হতভাগ্য গর্ভধারিণী।'

অন্ধকারে

বীরেশ্বরকে আমি চিনতুম ; বীরেশ্বরকে আমি ভালবাসতুম। বীরেশ্বর আমার সহপাঠী ছিলো।

একদিন দুদিন নয়, এক আধ বছর নয়, সেই প্রেপারেটোরি থেকে এম এ পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছিলুম। যদিও বিষয় আমাদের আলাদা ছিলো। বীরেশ্বর রাজনীতির ক্লাস করতো, আমি সাহিত্যের। আমি বীরেশ্বরকে বলতুম, 'রাজনীতি পড়ো কেন ? সাহিত্য না পড়লে শিক্ষিত হবে না!'

বীরেশ্বর বলতো, 'সাহিত্য পড়ো কেন ? রাজনীতি না পড়লে কুয়োর ব্যাং কুয়োতেই থাকবে।'

দুজনেই তারপরে যার যার বিষয় নিয়ে খুব তর্ক করতুম। তর্কে না পারলে বীরেশ্বর ভীষণ রেগে যেতো। রণে ভঙ্গ দিয়ে বলতো, 'যাও যাও মেয়ে হয়ে জন্মেছ, মেয়ে হয়েই থাক, দয়া করে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এসো না।'

আমিও ছাড়তুম না, বলতুম 'পাল্লা দেবার কী আছে ? এমন কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি যে ছেলেদের বোকামির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে পারে। সবাই জানে ছেলেরা গোঁয়ার, বেহেড আর অসহিষ্ণু। গায়ে জোর থাকলে যা হয় আর কি। জানো তো পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভীমের গায়েই সবচেয়ে বেশি জোর ছিলো, কিন্তু—'

রাগে গরগর করতে করতে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুপদাপ স্থান ত্যাগ করতো বীরেশ্বর। আমি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলতুম, 'দুয়ো, দুয়ো।'

বি এ পর্যন্ত এই ধরনের ভাব ছিলো। তারপরেই ধীরে ধীরে বদল হয়ে গেল সব। আমাদের মনের ভাবও বদলালো, স্বভাবও বদলালো। সতেরো বছরের আমি কুড়ি বছরে পা দিয়ে অনেক শিষ্ট হয়ে গেলাম আর বীরেশ্বর রাজনীতির পাল্লায় গা ভাসিয়ে ভারি উদ্দাম হয়ে উঠলো। এবং আমরা বুঝতে পারলুম আমাদের মধ্যে শুধু নিছক সহপাঠীর বা সমবয়সীর বন্ধুত্বর ভালোবাসাই নয়, তার উর্ধ্বেও আরো কিছু হয়েছে যার নাম প্রেম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু আমরা সেটা স্বীকার করতাম না, স্বীকার করতে লজ্জা করতো। তবুও কোনো কোনো সময়ে চোখে চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ দু'জনেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম। কিন্তু এসব অনুভূতি আমাদের অধিক দূর নিয়ে যেতে পারতো না। আমরা নিজেরাই এই বাজে পচা সেন্টিমেন্টাল অবস্থাটা কাটিয়ে নড়ে চড়ে সহজ হয়ে বলতাম, 'দূর ছাই, এমন বৃষ্টি নেমেছে যে, কিচ্ছু ভাল্লাগছে না। চলো ঈর্ষিতা আর নবেন্দুকে ডেকে এনে ভিজি খানিকক্ষণ।' অথবা 'বাপরে বাপ কী গরম, আজ ক্লাসফ্লাস করতে পারবো না, পালাবো।'

তারপর একদিন বীরেশ্বর হঠাৎ পড়া ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল। ওর এই ব্যবহারে আমি কষ্ট পেয়েছিলুম, রাগ করেছিলুম ক্রুদ্ধচিত্তে ভেবেছিলুম, এই ছন্নছাড়া, নিষ্ঠুর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেটির সঙ্গে আমি কখনো কোনো সংশ্রব রাখবো না।

মাস ছয়েকের মধ্যে পরীক্ষা আসন্ন হলো। আমি বীরেশ্বরের অবিমৃষ্যকারিতা ভুলে পড়াশুনোয় ডুব দিলুম। তবু মাঝে মাঝে ওর কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে যেতো, ভাবতুম ছেলেটা কী? অন্তত পরীক্ষাটা দিতেও তো আসতে পারে? ওর দলের ছেলেরা বলতো, 'পরীক্ষায় আর ওর বিশ্বাস নেই।' এ কথায় আমার ভুরু কুঁচকে যেতো, বলতুম, 'মানে?'

তারা বলতো, 'মানে নেই কিছু। গাধার মত খেটেপিটে পরীক্ষা দিয়ে হবেটা কী? দেশ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।'

'তা দেশ কি একটা অস্থাবর জিনিস নাকি যে নড়েচড়ে বেড়াবে?'

ওরা বলতো, 'দেশ মানে তো আর মাটির সমুদ্র নয়। প্রাণের মিছিল। প্রাণ কই?'

রেগে গিয়ে বলতুম, 'ও বীরেশ্বর তা হলে প্রাণভ্রমরকেই খুঁজতে বেরিয়েছে? তোমরাই বা বিড়বিড় করছো কেন? তোমরাও যাও না সেই অন্বেষণে যোগ দিতে।'

'যাবো।' তারা কেমন একরকম হাসতো আর বলতো, 'অন্বেষণের নিশানা কি শুধু একরকম? তা নয়। এখানেই আমাদের কাজ।'

তখন আমি জানতুম না কী কাজ। পরে বোঝা গেল। পরীক্ষার সময় তারা পরীক্ষা ভণ্ডুল করলো চেয়ার টেবিল ভেঙে, উপাচার্যকে শাসিয়ে, অধ্যাপকদের অপমান করে। আর এইসব করার পরে হঠাৎ তারা অনুভব করলো, দল বেঁধে সাহস করে চলতে পারলে এ জগতে যা খুশি তাই করা যায়।

আমরা যারা তাদের দেশোদ্ধারের এই অভিনব পদ্ধতির সঙ্গে ছিলুম না, তারা বললুম, 'খুব অন্যায়। কেন তোমরা পরীক্ষাটা নষ্ট করলে? কী তোমাদের লাভ হলো? চেয়ারটেবিল ভাঙা বা গুরুজনদের অসম্মান করার মধ্যেই বা কী এমন বাহাদুরি? অসভ্য? এর নাম রীতিমত ছোটলোকোমি।'

একটি ছেলে, রামেন্দু তার নাম, সায়েন্স পড়তো, খুব সদ্দারি করছিলো দলের মধ্যে। মনে হচ্ছিলো এইসব কাণ্ডকারখানার সেই নেতা। সরোষে বললো, 'ভদ্রমহিলা শুনুন, ভদ্রলোক হয়ে তো বহু বছর কাটানো গেল, এবার না হয় একটু ছোটলোক হয়েই দেখা যাক না, বিষ্ঠাসংকুল ভরাপুরা নর্দমার স্থির জলে কিঞ্চিৎ কম্পন তোলা যায় কি না।'

আমার বন্ধু মাধুরী উত্তেজিত গলায় বললো, 'তা বটে, কম্পন তোমরা না তুললে আর কে তুলবে? নর্দমায় ঢিল ছুঁড়ে, ময়লা ছিটকিয়ে সব কিছু অপবিত্র করাই তো তোমাদের ধর্ম। যাও যাও বেশি ওস্তাদি কোরো না।'

'যা বোঝো না তা নিয়ে তোমরাও বেশি কথা বলতে এসো না।'

দলবল নিয়ে লালমুখে রামেন্দু চলে যেতো তর্ক ছেড়ে। অর্থাৎ তখনো পর্যন্ত আমরা পরস্পরকে পরস্পর এভাবে আক্রমণ করার মত বন্ধুত্ব অনুভব করতুম। অবশ্য পরস্পর কথাটা ভুল হলো, কেননা বন্ধুত্বর ভাবটা বোধহয় আমাদের দিকেই ছিলো, ওদের নয়। ওরা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিলো। ওরা কেমন ষড়যন্ত্রীর মত নিজেদের মধ্যে নিজেরা গুটিয়ে থাকতো, মন খুলে কারো সঙ্গে মিশতো না, আগের মত রাজনীতির তর্ক জুড়ে গলা ফাটাতো না।

পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যাবার অব্যবহিত পরেই আবার হঠাৎ একদিন ফিরে এলো বীরেশ্বর। দেখা হয়ে গেল করিডরে। 'আরে তুমি!' খুশি হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। রাগ অভিমান কিচ্ছু মনে রইলো না।

বীরেশ্বর তার ঘন চুল আঙুল চালিয়ে বললো, 'তা হলে চিনতে পেরেছ ?'

'আহা। কেবল বাজে কথা ? কোথায় ডুবে ছিলে ? একটা খবর দেওয়াও বুঝি কর্তব্য বলে মনে হয়নি ?'

বলতে বলতে হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, আমার গলা কেঁপে যাচ্ছে, আমার চোয়াল ব্যথা করছে, আমি বীরেশ্বরকে ভীষণভাবে ভালোবাসছি।

বীরেশ্বর তাকিয়ে থাকলো। সামান্য পরে নিচুগলায় বললো, 'রাগ কোরো না। অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা করো।'

আমরা কফি হাউসে গেলুম। লক্ষ করলুম, বীরেশ্বর অনেক রোগা হয়েছে, তার উচ্চশক্তির চশমার কাচের ফাঁকে চোখের তারা আরো বেশি চকচক করছে, এবং সে খুব অন্যমনস্ক।

কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, 'শুনলাম, রামেন্দুদের সঙ্গে খুব ঝগড়া করো ?'

চুপ করে থেকে বললাম, 'করি না, করতাম।'

'কর না করতে ? তার মানে এখন ওদের কার্যকলাপ আর তেমন অসংগত বলে মনে হয় না, তাই কি ?'

'না। এখন আমি ওদের ভয় পাই।'

'কেন ?'

'মনে হয় ওদের উপর শয়তান ভর করছে, ওদের মাপমত পছন্দমত চলন বলন না হলেই ওরা ঘাড় মটকে দেবে।'

বীরেশ্বর হাসলো, 'মন্দ বলোনি কথাটা, হাই তুললো, যে ঘাড় শুধুই একটা মাংসের স্তূপ সে ঘাড় মটকে দেওয়াই তো ভালো। জগৎ থেকে কিছু আবর্জনা দূর হয়।'

আমি তাকিয়ে থাকলাম। আমার মুখে কথা সরলো না।

বীরেশ্বর বললো, 'অন্ধ তো আর নও ! দেখছো তো বিশ্বসংসারে বন্দুকের নল আজ ওদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে ?'

ওদের বলতে বীরেশ্বর কাদের বলছে তা আমি বন্দুকের নল শুনেই বুঝতে পারলাম। আমার কফি খেতে ভালো লাগছিলো না, আমি বীরেশ্বরের চোখে-মুখেও ষড়যন্ত্র দেখছিলাম। কোনোদিন খুনী দেখিনি, তবু বীরেশ্বরকে আমার খুনী বলে মনে হলো। আমি সহসা ওর হাত চেপে ধরে বললাম, 'এ পথ ছাড়ো। এ পথে আলো নেই।'

বীরেশ্বর হেসে হেসে বললো, 'আলো নেই, আলো আনবো। আর ঐ যে ঘাড়ের কথা বললে না। কারো কারো ঘাড়ে বড় বেশি চর্বি জমে গেছে, অনেক চর্বি পাওয়া যাবে সেখান থেকে। সেই চর্বিতেই আমরা আলো জ্বালবো।'

আমার বুকের ভিতর ধ্বক্ করে উঠলো।

'এসব তুমি কী বলছো, বীরেশ্বর ?' আমার ক্ষীণগলা প্রায় শোনা গেল না।

বীরেশ্বর আমার হাত ধরলো বললো, 'বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে দেখতেই জঙ্গল ছেড়ে চলে এলাম লোকালয়ে।'

'বীরেশ্বর।'

'বলো।'

'তুমি অবোধের মত আগুনে ঝাঁপ দিও না।'

'তুমি নির্বোধের মতো কথা বোলো না।'

'আমি তোমার মঙ্গল চাই।'

'আমি তোমাকে চাই।'

'আমার আপত্তি নেই। তুমি আমাদের বাড়ি চলো, আমিই আমার মা-বাবাকে বলবো।'

'কী বলবে?'

'আমাদের বিয়ের কথা।'

'বিয়ে!'

'হ্যাঁ। আমি এই মুহূর্তেই মনস্থির করে কথা দিচ্ছি তোমাকে কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে আর তুমি এই সংঘাতিক খেলায় মেতে থাকবে না।'

বীরেশ্বরকে ফেরাবার জন্যে আমি প্রায় মরিয়া হয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন। বীরেশ্বরের চোখে প্রথমে একটি গাঢ় স্নেহ নামলো, তারপরেই জ্বলে উঠে বললো, 'প্রথম কথা আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না। প্রধান কথা আমার কোনো কাজের কোনো সমালোচনা আমি বরদাস্ত করি না।'

জ্বলে আমিও উঠলাম, 'তা হলে তুমি আমাকে কীভাবে চেয়েছিলে? স্ত্রীলোক সঙ্গী নিয়ে খুনজখমের দল পাকাতে?'

বীরেশ্বর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'না। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে একপথে চলতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠলো সে।

এরপরে বীরেশ্বর আবার উধাও হলো। পিছিয়ে পিছিয়ে আবার আমাদের পরীক্ষার তারিখ এগিয়ে এলো। আর ঐটুকু সময়ের মধ্যে কলকাতা শহর এমন অবস্থায় পৌঁছলো যেখানে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা নামক কোনো শব্দের কোনো অস্তিত্ব রইলো না।

আমার বাবা তাঁর এক জীবনে অনেক খেটে অনেক কষ্টে অনেক অনাহারে অনিদ্রা জয় করে অথবা অগ্রাহ্য করে একটি ছোটো কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, তার দৌলতে সন্তোষপুরে শস্তায় জমি কিনে ছোটো একটি বাড়ি তুলেছিলেন, একটি পুরোনো গাড়িও কিনেছিলেন। তাঁর সেই আজীবনের পরিশ্রমে গড়া কারখানাটা কারা পুড়িয়ে দিল একদিন, ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাড়িটাকে অকেজো করে দিল। পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়ির দেয়ালকে মসীলিপ্ত করলো, প্রত্যেকটা বাড়িকে সন্ত্রস্ত করে তুললো, খুনও হলো কিছু লোক।

এ নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ করার উপায় ছিলো না সরকারি দপ্তরে, সেই সাহসই কারো ছিলো না। কেননা পাড়ার সকলেই জানতো তার ফলশ্রুতি হবে মৃত্যুকে ডেকে আনা। মৃত্যু কে চায়? নিজের জীবনের চেয়ে কী বেশি প্রিয়? বেশি মূল্যবান? অথচ সেই সব ছেলেদের আমরা চিনতাম জানতাম। দলের মধ্যে এমন অনেক মুখ আমি ঝলসে উঠতে দেখেছি যারা এককালে আমারই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। আমার সহপাঠী ছিলো। কোনো এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে ফিরতে গলির মুখে বীরেশ্বরকেও আমি দেখেছিলাম, তার হাতে শাণিত ছোরা চিক চিক করছিলো। আমি থেমে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'বীরেশ্বর তুমি?'

বীরেশ্বর উগ্র চোখে তাকিয়ে বলেছিলো, 'হ্যাঁ আমি। তা কী হয়েছে?'

'কতদিন দেখিনি। কেমন আছ?' আমার গলা নিজে থেকেই ভিজে এসেছিলো।

'তুমি কেমন আছ?' বীরেশ্বরের গলাও ভিজে গেল মুহূর্তে। চোখের ইশারায় সে,

যে তিন চারটি ছেলে তাকে ঘিরে ফিস ফিস করে কথা বলছিলো তাদের চলে যেতে বললো। ছোরাটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললো বুকের মধ্যে। আস্তে ডাকলো, 'রাধা।'

আমার অনুরাধা নামের অনুটা মাঝে মাঝেই এমনি বাদ দিত বীরেশ্বর। বীরেশ্বরের গাঢ় গলায় এই ডাক শুনে আমি চঞ্চল হলাম। বললাম, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলে? যদিও আমি মনে মনে ঠিকই বুঝতে পারছিলাম সে কী করছে। তবু না বোঝার ভান করে সরল চোখে তাকালাম।

বীরেশ্বর বললো, 'যা আমার কাজ।'

আমি নিশ্বাস চেপে বললাম, 'কবে এসেছ কলকাতায়? না কি বরাবরই আছ, শুধু আমি জানি না।'

চুপ করে থেকে বীরেশ্বর বললো, 'ভয় ডর মায়া মমতা এসব বৃত্তির ছোটো খাটো টুকরো এখনো যে বিষাক্ত ঘায়ের মত আমার বুকের মধ্যে কোথায় কোথায় আটকে আছে, সে কথা তোমাকে দেখলেই কেবল বুঝতে পারি। তোমার চেয়ে বড় শত্রু আর আমার জীবনে কে আছে?'

'তা হলে তোমার ঐ ছোরাটা দিয়ে আমাকেই আজ বিদ্ধ করো না। অন্য একটা লোক বেঁচে যাবে।'

বীরেশ্বর থতমত খেয়ে গিয়ে বললো, 'এসব বাজে ফাজলামি আমি ভালোবাসি না।'

'বীরেশ্বর।'

'বলো।'

'তুমি কলেজে সব কিছুতেই পয়লা নম্বর ছিলে। এমন নিচু স্তরে তোমাকে কোন দুর্বুদ্ধি টেনে নামালো?'

'আর যেই হোক, তুমি যে নও তা তো বোঝাই যাচ্ছে। যাও, এবার নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। বড়লোক বাপের বাড়ি গিয়ে খাটে পালঙ্কে বিশ্রাম করো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না।' রাগে গর গর করে উঠে সেখানেই সে তেজী ঘোড়ার মত পা দাপড়ালো।

বললাম, 'বাপ আর বড়লোক নেই, তোমরা তো অন্যের পরিশ্রমের ঘাম শুষেই দেশোদ্ধার করছো, তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেললেও বলবো, তোমরা ঘৃণ্য ঘৃণ্য ঘৃণ্য।'

আমি রেগে হন হন করে এগিয়ে গেলাম।

কিছুকালের মধ্যেই বীরেশ্বরের নাম দেখলাম সকলের মুখে মুখে ফিরছে। শোনা যাচ্ছে, সাংঘাতিক সব অপকর্মের সেই আসল সারথি, পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের পাড়ায় আর তখন টেকা যাচ্ছিলো না। ধন মান প্রাণ নিয়ে সকলেই রুদ্ধশ্বাস। ব্যবসায় সর্বস্ব হারিয়ে আমার হতোদ্যম ভগ্নস্বাস্থ্য বাবাও একদিন বললেন, 'থাক বাড়িঘর পড়ে, চলো আমরাও কোথাও পালিয়ে যাই।'

আমার মা-বাবার সন্তান সংখ্যা খুব কম। আমি আর আমার দিদি। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। জামাইবাবু পুনাতে কাজ করেন। আর আমি এম এ পরীক্ষার পিছু হটা দেখতে দেখতে এক ইস্কুল মাস্টারিতে নাম লিখিয়েছি। সুতরাং সংসার ছোটো। মাও বললেন, 'তাই ভালো। তিনজন তো মানুষ, সস্তায় দুখানা ঘর ভাড়া নিলেই আমাদের চলে যাবে।'

বাবা হঠাৎ বললেন, 'জানিস অনু, কাল আমি বীরেশ্বরকে দেখলাম। কী ছেলে কী হয়ে গেল। তোর সঙ্গে কত আসতো, কী মিষ্টি কথা, কী মিষ্টি ব্যবহার—'

'কোথায় দেখলে ? কোথায় ?' আমি আগ্রহে অধীর হয়ে উঠলাম।

'পরেশ সেনের বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়েছিল।' বললো, 'ওর বাবা এ পাড়াতেই থাকেন। তাই মাঝে মাঝে আসে।'

'ওর বাবা ? তাই নাকি ?'

'চিনিস ?'

'নিশ্চয়ই। বি এ ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে একবার কত ঘটা-পটা করে বীরেশ্বরের জন্মদিন হলো, আমরা বন্ধুরা গেলাম। ওরা তখন আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতো। ওর বাবা মস্ত চাকরি করতেন, একটা গাড়ি ছিলো। আমাদের সকলকে বীরেশ্বর গাড়ি চালিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো সেদিন যার যার বাড়িতে।'

'তা হলে এই মড়াপোড়া সন্তোষপুরে এসে বাড়ি নিলেন কেন ভদ্রলোক ?'

'বোধহয় ভাড়া বাড়ি নয়, নিজেদেরই বাড়ি। আমাদের মতই শস্তায় জমি কিনেছিলেন অনেক আগে।'

'অবশ্য ওঁর আর ভয় কী ? ওঁর ছেলেই তো নেতা।' বাবার মুখে বিরক্তির রেখা স্পষ্ট হলো।

দু-একদিনের মধ্যে আমার সঙ্গেও দেখা হলো বীরেশ্বরের। তেমনি বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে, ঠিক সেই জায়গাটিতেই। সেদিন বীরেশ্বরই এগিয়ে এলো, 'এই যে, কী খবর ?'

'তোমার কী খবর ?'

মনে পড়লো এর আগের দিন ওকে ঘৃণা করে আমি চলে গিয়েছিলাম। সেই ঘৃণার বদলে ওর অমন নিভাঁজ শান্ত ভঙ্গি দেখে আমি আর রাগ করতে পারলাম না। তাছাড়া, ও যে বীরেশ্বর একথা আমি ভুলি কী করে ? আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি আমার কুমারী হৃদয়ে এই ভয়ংকর বীরেশ্বর কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, ওর জন্য নিঃশব্দে আমি কত কষ্ট পাচ্ছি।

চুপ করে থেকে বললাম, 'বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলো সোমবার ?'

'সোমবার ?' এক পলক ভেবে বললো, 'হ্যাঁ। সোমবার আমি এসেছিলাম।'

'এসেছিলাম কেন ? থাকোনি ? তোমার বাবা-মা তো এ পাড়াতেই আছেন বলেছো।'

'বাবা-মার সঙ্গে আমার কী ?'

'তুমি তাঁদের ছেলে।'

'সেজন্য কী করতে হবে ?'

'সেটাই তোমার বাড়ি। তাঁরাই তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে এবং পড়িয়ে এতটা বড় করে তুলেছেন।'

'না করে আর উদ্ধার কী ? আমি তো আর জোর করে তাঁদের ছেলে হয়ে জন্মাইনি ? তাঁদের গরজেই আমার জন্ম। আমার আগেও আমার মা আটবার গর্ভবতী হয়েছিলেন। তিনটি মরে বেঁচেছে। আর বাকি ছটির মধ্যে এক দিদি বিধবা হয়ে আবার ফেরত এসেছেন বাপের বাড়িতে, অন্য দুজন আরামের তেলে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, দাদাদের একজন জেলে, আরেকজন পিতৃভক্ত, আর এই হতভাগা আমি—'

'মানুষের বুকে ছুরি বসাচ্ছি—' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলুম।

অন্ধকারে ওর চোখ শ্বাপদের মত জ্বলে উঠেছিলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। যা পাপ, যা পচা গলা দুর্গন্ধের ডিপো, তা এমনি করেই সাবাড় করা উচিত।'

আমিও দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব পুলিশে।'

'পারো তো দিও।'

'পারবো, পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।' আমার কান্না এসে গিয়েছিলো গলায়, আর সেজন্য নিজেকে আমার দু হাতে চড়াতে ইচ্ছে করলো। আশ্চর্য! তবু এই বীরেশ্বরকে আমি ভালো না বেসে পারি না কেন?

বীরেশ্বর একটু হাসলো, ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চুলের ভিতরে আঙুল ডুবিয়ে বললো, 'আমার দেশের কাছে আমার কেউ কিছু না। বাপ মা ভাই বোন আত্মীয় পরিজন, সব, সব কুয়াশা, শুধু তুমি, একটি বিন্দু সিন্ধু হয়ে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হতে দিচ্ছ না।'

বললাম, 'তোমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, সে কথা কি জানো?'

'জানি।'

'কোন্ সাহসে ঘুরে বেড়াও?'

'সাহসের অভাব কবে দেখেছ? ঠিক জেনো, আমার একটি চুলের ডগাও ওরা ছুঁতে পারবে না কখনো।'

'নিশ্চয়ই পারবে। মিলিটারি নামছে, খবর রাখো না?'

'সব আমি একদিন নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

'বীরেশ্বর!'

'বলো।'

'এ রাস্তা তুমি ছেড়ে দাও। তুমি জানো না, তুমি কী করছো। একটা উন্মত্ত নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটছে তোমার। বীরেশ্বর, তুমি ফেরো, তুমি ফেরো—' আমি ঢোঁক গিললাম।

বীরেশ্বর আনমনা হয়ে বললো, 'অসম্ভব।'

'তোমাদের বাড়ির ঠিকানা কী আমাকে বলো।'

'কী দরকার?'

'আমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করবো।'

'তোমার কি ধারণা, আমি আমার মা-বাবাকে গ্রাহ্য করি?'

'বলো না ঠিকানাটা কী?'

'তার চেয়ে বাড়ি যাও। আমার সঙ্গে কথা বলছো দেখতে পেলে টিকটিকিরা তোমার নামেও হুলিয়া বার করবে। তা ছাড়া শুয়োরের বাচ্চা তো একটা নয়, অনেক। সব কটা হারামজাদাই তো গদির লোভে পিছন ঘষটাচ্ছে।'

'এক সময়ে তো পড়াশুনো করতে, গৃহস্থ ছিলে, ভদ্র ছিলে, দয়া করে মুখ খারাপ কোরো না। তোমার বাবার নাম আমার মনে আছে, ঠিকানা না দিলেও পাড়া খুঁজে আমি তাঁর বাড়ি বার করতে পারবো। আচ্ছা চলি।'

হাঁটতে শুরু করেছিলাম, দ্রুত এগিয়ে এসে বীরেশ্বর বললো, 'একটা কথা শুনবে রাধা?'

'কী ?'

'আমি এখুনি আমার আস্তানায় ফিরে যাচ্ছি, সত্যি বলতে তোমার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি জানি স্কুল থেকে এ পথেই তুমি বাড়ি ফেরো। এই খামটা একটু রাখতে পারবে তোমার কাছে ?' সে হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি সভয়ে সরে গিয়ে বললাম, 'না বাপু, তোমাদের ওসব কাগজপাতিকে আমি ভয় পাই।'

'প্লিজ লক্ষ্মীটি !' বীরেশ্বর কাকুতি করলো, 'এটা আর কারো কাছে রাখার সাহস নেই আমার। কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে ছাড়া। শোনো, আমার আজ রাত্রে এ পাড়ায় থাকার কথা ছিলো, কিন্তু খবর পেয়েছি মধ্যরাত্রে এখানে তল্লাশি হবে। বুঝতেই পারছো কেন আমাকে পালাতে হচ্ছে ? কাল ভোর পাঁচটায় একটি লোক এসে নিয়ে যাবে তোমার কাছ থেকে। কথা ছিলো আমিই তাকে সকালে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো, কিন্তু—'

'তার মানে তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও ?'

'বিপদের কিছু নেই, রাধা। শুধু একটা ছোট্ট ম্যাপ আছে, আমার ঠিকানা। তেমন বুঝলে তুমি এটা ছিঁড়ে ফেলো।'

'তোমার ঠিকানা ? তা হলে তোমার একটা ঠিকানা আছে ?'

'ঠিকানা নেই, বলতে পারো নিশানা। কোন্ দেশের কোন্ জঙ্গলের কোন অংশে আছি তারই চিহ্ন এঁকে দিয়েছি, এই নিশানা ধরে লোকটি যাবে আমার ওখানে। ও গেলে আমি সরবো।'

'ঠিক জায়গাই বেছে নিয়েছ।' অতি দুঃখে আমি হাসলাম, 'যেমন জন্তু-জানোয়ারের মত স্বভাব হয়েছে বাসস্থানও ঠিক তারই উপযোগী। আমি যদি পুলিশকে জানিয়ে দি ?'

'তা তুমি পারবে না।'

'মানুষ কী পারে আর কী পারে না তা কেউ বলতে পারে ? আমিই কি কখনো কল্পনা করেছি যে তুমি এমন মনুষ্যবধের হোতা হবে ? না না, বীরেশ্বর আমি তোমার কোনো কাজেরই সহায় হবো না। না, না। অসম্ভব। অসম্ভব। রোগীকে ভালোবাসি বলে তার রোগকে ভালোবাসতে পারবো না।'

'রাধা !'

'না।'

'রাধা।'

'না।'

'আমার রাধা। আমার একমাত্র আলো—' বীরেশ্বরের হিংস্র চোখে নিবিড় প্রেম ছায়া হয়ে নেমে এলো। আমি অভিভূত হলাম। আমার চোখ জলে ভরে গেল। আমি খামটা হাতে নিয়ে বললুম, 'কিন্তু আর কোনোদিন আমাকে কিছু অনুরোধ কোরো না।'

বীরেশ্বর বললো, 'না।'

দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এলুম আমি। এসেই সর্বপ্রথম খামটা জল দিয়ে খুলে ঠিকানাটা কী তা জানতে চেষ্টা করলুম। বীরেশ্বরের গতিবিধি রহস্যাবৃত ছিলো। লোকেরা ওকে মরীচিকার মত হঠাৎ হঠাৎ এখানে ওখানে দেখতে পেতো। কিন্তু কেউ জানতো না ও কোথায় থাকে। আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি প্রয়োজন হয় আমি যাবো ওর বাসস্থানে,

আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবো এই সর্বনাশা পথ থেকে। ওর জান্তব হৃদয়ে আমার জন্য এখনো যে এককোঁটা মনুষ্যত্ববোধ অবশিষ্ট আছে সেটাকে আমি কাজে লাগাবো।

ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। সাংকেতিক ভাষায় স্থান নির্দেশ আছে। আমি চেষ্টা করে জায়গাটা আবিস্কার করে ফেললাম। আমি বুঝতে পারলাম, কোন্ পথে কীভাবে সেখানে পৌঁছোনো যায়। বীরেশ্বরের জন্য আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিলো। ভালোবাসার ভারে সমস্ত মন টন টন করছিলো। আমি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, এত ভালো আমি ওকে কবে বাসলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, ও যত দোষই করুক, আমি ওকে ক্ষমা করবো। হোক খুনী, হোক ডাকাত, আমি রক্ষা করবো ওকে, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবো ওর সুস্থ চৈতন্যে।

এরই মধ্যে একটা ভীষণ ভয় নেমে এলো পাড়ার মধ্যে। অদূরে দু-চারটে বোমা অথবা গুলির আওয়াজ কানে এলো। লোকজনেরা ছোটাছুটি করে যে যার ঘরে গিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে দিল। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, ভাবলাম, বীরেশ্বরের অনুমানই ঠিক, পুলিশই এসেছে পাড়া তল্লাশিতে। আমার ভয় করছিলো, মনে হচ্ছিলো বীরেশ্বর বুঝি এখনো পালাতে পারেনি। আমি মনে-প্রাণে ভগবানকে ডেকে বলছিলাম, 'হে প্রভু, তুমি ওকে রক্ষা করো।'

খানিক বাদেই গোলমাল থেমে গেল। না, পুলিশ আসেনি। অন্য কোথায় কী হলো কে জানে। দলে দলে সংঘর্ষ তো লেগেই আছে। এ সব এ পাড়ায় জল-ভাত। কেউ গ্রাহ্য করে না। সুতরাং রাত বাড়লে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে কারোরই কোনো অসুবিধে হলো না। কিন্তু শেষ রাত্রের দিকে আমার ঘুম পাতলা হয়ে এলো। আমার মনে ছিলো ভোর পাঁচটায় লোক আসবে ঠিকানা নিতে। তা ছাড়া ঐ কোলাহলের মধ্যে বীরেশ্বরের কোনো বিপদ লুকোনো ছিলো কি না সেই সংশয়ও আমাকে ভালো করে ঘুমুতে দেয়নি।

আমি আমার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আলো জ্বাললাম না, পাছে কারো ঘুম ভেঙে যায়। ভোর ভোর গন্ধে এখন ভরে গেছে ঘর, হাওয়া শীতল শান্ত। খুব ভালো লাগছিলো। মনে করতে পারছিলাম না আর কবে এমন সুন্দর সকাল আমি দেখেছি।

মুখ-হাত ধুয়ে এসে বাইরের দরজার কাছে অপেক্ষা করছিলাম, লোকটি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটাতেই এলো। লোকটির চেহারা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার মাথা মুখ চাদরে ঢাকা ছিলো। সে তার পরিচয় দিল, আমিও খামটা তার হাতে দিলুম। চলে যাচ্ছিলো, উদ্বেগ সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা, কাল রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ পাড়ায় একটা গোলমাল হয়েছে, আপনি কি জানেন, ব্যাপারটা আসলে কী?'

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখলো, তারপর জলদগম্ভীর স্বরে বললো, 'একটা টিকটিকিকে জ্যান্ত পোড়ানো হয়েছে।'

'কী!'

লোকটি দাঁড়ালো না, চলে গেল হন হন করে।

ফিরে এসে বিছানায় শুয়েছিলুম আবার, কিন্তু শুতে আর ভালো লাগলো না। একেবারেই উঠে পড়ে মুখ চোখ ধুয়ে রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম।

বাড়িটি একতলা, বারান্দায় দাঁড়ালে পথচারীদের হাতের নাগালে পাওয়া যায়, কথা বলা যায়। এবং বলাই বাহুল্য সকালের প্রথম আগন্তুক সাধারণত ঠিকে ঝি-রাই হয়ে

থাকে। কিন্তু তার বদলে আমি আমাদের একজন প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী বিশ্বাস মাসিমাকে আলুথালু বেশে ছুটে আসতে দেখলুম।

স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে মাসিমা।'

মাসিমা কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছে বললেন, 'খবর শুনেছ তো?'

'না। কী?'

'পরেশ সেনকে কাল লাইটপোস্টের সঙ্গে বেঁধে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে।'

'সে কী!' আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম।

'কী হবে অনু বলো তো? এর পরে কোন্ দিন কার পালা আসে কে জানে। পরেশবাবুরা আর আমরা হলাম এ পাড়ার প্রথম বাসিন্দা। কত ভাব, কত ভালোবাসা। যেন এক বাড়ি এক আত্মা। আর জানো তো কী চমৎকার মানুষ—' মাসিমার গলায় হেঁচকি উঠলো। আমিও প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, 'এই সর্বনাশ কারা করলো মাসিমা?'

আর কারা। মাসিমা কপালে করাঘাত করেন, 'যারা করে। বীরেশ্বর রায়ের চেলারা। শুনলাম সে নাকি নিজে দাঁড়িয়ে পেট্রোল ঢালিয়েছে।'

'বীরেশ্বর!'

'বোমা, পাইপগান, ছোরা, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল নিয়ে প্রথমে কয়েকটা ছেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে টেনে আনে ভদ্রলোককে, তারপর—তারপরে—' মাসিমার গলায় আর আওয়াজ ফোটে না।

আমি ভাবতে থাকি, আশেপাশের লোকজনেরা তখন কী করছিলো। বাড়ি তো ওখানে একটা নয়। সবাই-ই কি ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসেছিলো? জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এলে তো আগে গাঁয়ের লোকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। এরা কি বাঘের চেয়েও ভয়াবহ?

মাসিমা আস্তে আস্তে বললেন, 'অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে উনি কাল নাকি থানায় গিয়ে পুলিশকে এর একটা বিহিত করতে বলে এসেছিলেন। কথা ছিলো রাত্রে সৈন্য ফিরিয়ে তল্লাশি হবে। তা তো হলোই না, মাঝখান থেকে কীভাবে প্রাণটা গেল।'

আমার হাতটা বারান্দার রেলিংয়ে বসে গিয়েছিলো। মনে পড়ছিলো দুদিন আগেই বাবা বীরেশ্বরকে পরেশ সেনের বারান্দায় দেখেছিলেন। কী করতে গিয়েছিলো সে? কী বলতে গিয়েছিলো? আর তারপরেই কেন পরেশ সেন খবর দিলেন পুলিশে?

কখন চলে গেলেন মাসিমা। এক সময়ে আমিও আমাকে আমার শোবার ঘরের আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে বাসি চুল সাব্যস্ত করতে দেখলাম, ব্যাগ নিতে দেখলাম, তারপর শাড়ি বদলে স্যান্ডেল পায়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে দেখলাম পথে। পথ তখনো নির্জন, তখনো ভোরের গন্ধ মেখে পবিত্র। তখনো আমার মা বাবা ঘুম ভেঙে ওঠেননি। আমি স্বপ্নে পাওয়া মোহাচ্ছন্ন লোকের মত যেন ঘোরের মধ্যে গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে পৌঁছুলাম, এসেই ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম একটা। আমার আর তর সইছিলো না, আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম এই দুরূহ কর্তব্যবোধ এবং বিবেকের তাড়না দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই বাতাসের মত উড়ে চলে গিয়েছিলাম গন্তব্যে। ঠিকানাটা বুঝিয়ে বুক থেকে সমস্ত বাতাস খসিয়ে দিয়েছিলুম।

তারপর কী করে যে ফিরে এলাম বাড়িতে আমি জানি না। আমার একান্ত গোপন যন্ত্রণা আমাকে বিবশ করে ফেলেছিলো। মাথার মধ্যে হাজার বৃশ্চিক গভীরভাবে দংশন

করছিলো। আমার পৃথিবী থেকে সব আলো নিবে গিয়েছিলো। আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলুম না। আমার মা আমার গায়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'ঈশ্! কী জ্বর! কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে। কোথায় গিয়েছিলি ভোর না হতে? কোথা থেকে এমন গা-ভরা জ্বর নিয়ে এলি?'

বাবা দৌড়ে ডাক্তার আনতে গিয়েছিলেন, আর আমার চেতনা জুড়ে পরেশ সেনের আত্মা একটা প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষায় কেঁদে কেঁদে ফিরছিলো। আমি বলছিলাম, 'আপনি শান্ত হোন, আপনাকে উপলক্ষ করে সকলের শান্তির জন্য এই তো খানিক আগে আমি আমার হৃৎপিণ্ড খসিয়ে দিয়ে এসেছি। কাল সকালের খবর কাগজেই দেখতে পাবেন সব।'

কিন্তু অতক্ষণও অপেক্ষা করতে হলো না। টেলিগ্রামটা রাত্রিবেলাই বেরিয়ে গিয়েছিলো। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অন্তিম শয়নে শুয়েছিলো বীরেশ্বর। ছবিটা খুব স্পষ্ট আর পরিষ্কার উঠেছিলো বলে চিনতে একটুও কষ্ট হচ্ছিলো না। তেমনি ঘন চুল, চুলের ঢেউ, সুন্দর কপাল, তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ়বদ্ধ চিবুক।

আমি অন্ধকার চোখে তাকিয়েছিলাম। বাবা পড়তে পড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছিলেন, 'আহা বনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলো ছেলেটা। এই সময়েই সন্ধান পেয়ে পুলিশ ওকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু তা বলে নিরস্ত্র ছিলো না। এই যে লিখেছে দ্যাখ, তালিতাপ্পি দেওয়া বিচিত্র রংয়ের ছেঁড়া ফতুয়ার মস্ত গোপন পকেটে বোমা এবং পিস্তল ছিলো। চমকে ঘুম ভেঙে উঠেই সে একহাতে বোমা এবং একহাতে পিস্তল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। দু'একজনকে জখমও করে, কিন্তু পালাবার সুযোগ পায়নি। তার আগেই পুলিশের গুলি লেগে পড়ে যায় মাটিতে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। তার মুখে শেষ কথা ছিলো, 'জানি কে তোমাদের সন্ধান দিয়েছে। তাকে বোলো, সে ঠিক কাজই করেছে। আমি সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এ জীবন বহন করার মত শক্তি আমার নিজে থেকেই ফুরিয়ে এসেছিলো।'

বাবা পড়া শেষ করে উঠলেন; নিঃশব্দে চলে গেলেন অন্য ঘরে। মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন জানালায়। আমি পাশ ফিরলুম।

সেই সময়ে অবাধ্যভাবে আমার শরীরটা ঝেঁকে ঝেঁকে উঠছিলো, আমি শব্দহীন চিৎকারে বলছিলাম, 'জীবন আমার কাছেও কম বোঝা নয় বীরেশ্বর, আমাকে তুমি ডেকে নাও। আমি আর পারছি না, পারছি না। তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করার শক্তি আমার আর অবশিষ্ট নেই। যদি আত্মহত্যা মহাপাপ হয় সে পাপও আমি করতে রাজি আছি তোমার জন্য। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর তোমাকে ক্ষমা করুন ঈশ্বর।'